ইসলামি সভ্যতায়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস

ড. রাগিব সারজানি



ড. রাগিব সারজানি

ইসলামি সভ্যতায়
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস

অনুবাদ
আশিকুর রহমান
আবদুল্লাহিল বাকি

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব : মো : রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - wafilife.com
ISBN : 978-984-96318-4-2
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
Facebook : fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৫৬০/= টাকা মাত্র

Islami Shovvotay Chikitsha Bigganer Itihash
By Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস

মূল	:	ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ	:	আশিকুর রহমান, আবদুল্লাহিল বাকি
সম্পাদনা	:	আশিকুর রহমান
ভাষা সম্পাদনা	:	মাহমুদুল্লাহ মুহিব
বানান সমন্বয়	:	মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা	:	নুরউদ্দীন আহমাদ, মো. আখতারুজ্জামান
চিত্রবিন্যাস	:	উজ্জ্বল আহমেদ, মো. আখতারুজ্জামান
প্রচ্ছদ	:	উজ্জ্বল আহমেদ
প্রকাশক	:	রাকিবুল হাসান খান

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا﴾

আমি নাজিল করেছি এমন কুরআন, যা মুমিনদের পক্ষে শেফা ও রহমত। তবে জালেমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না। [সুরা বনি ইসরাইল : ৮২]

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্র সূচি

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর গুণগান গাই, তাঁর দয়ায় বেঁচে থাকি। বিশ্বজগতের রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ষিত হোক অবারিত শান্তি ও রহমত।

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। জগতের প্রথম যুগের মানুষেরা যখন থেকে রোগ-ব্যাধি মোকাবিলার সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন থেকেই হয়তো চিকিৎসার সূত্রপাত। ইতিহাসবিদ আল-কিফতি *তারিখুল হুকামা* গ্রন্থে লেখেন, 'ইদরিস আ. জগতের প্রথম চিকিৎসক।'[১] স্থানকালপাত্রভেদে এই বিদ্যা স্থবির হয়ে থাকেনি। জীবনের প্রয়োজনে এই শাস্ত্র আপন গতিতে এগিয়ে চলে। বিজ্ঞদের সংস্পর্শে তা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে।

মূলত আব্বাসি খেলাফত আমলেই ইসলামি সভ্যতার চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। রাজধানী বাগদাদ-সহ বড় বড় নগর ও বন্দরে হাসপাতাল গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। এমনকি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়। হাসপাতালগুলোতে দক্ষ চিকিৎসক ও যুগের বিচারে সর্বাধুনিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসা ও হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় মুসলিমগণ এমন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন, যাতে মুসলিম সভ্যতা-পূর্ব চিকিৎসাব্যবস্থা ম্লান হয়ে যায়।

রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাতেই মুসলিমদের জ্ঞান-গবেষণা ও উদ্ভাবন সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা এটিকে একটি মৌলিক পরীক্ষামূলক ভিত্তি দান করেছেন। তারাই প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানকে দর্শন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে উপনীত করেন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের মৌলিক কোনো অবদান নেই, কিংবা মুসলিমরা ছিল ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী। অথচ তারাই বিজ্ঞানের কারিগর, তাদের

---

১. *তারিখুল হুকামা*, পৃ. ৬

আলোতেই বিশ্ব আলোকিত। চতুর্দশ শতকে মুসলিমদের অপ্রত্যাশিত অধঃপতনে জ্ঞানজগতের বাগডোর হাত বদল হয়ে যায়। মুসলিমদের আবিষ্কার, থিওরি চুরি হয়ে যায়, কিতাবাদি নষ্ট করে দেওয়া হয়। তাদেরকে কেবল জীবন রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত করে জ্ঞানরাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হত্যাও করা হয় বেশুমার।

"আমরা জ্বেলেছি জ্ঞান-আলো, কত জাতি উজ্জ্বল হলো
শিক্ষক কেন শিষ্য হলো, এ ঘর কেন আঁধার বলো?
ভুলেছি অতীত, কেটেছি শিকড়, আছে কি ভবিষ্যৎ?"

ড. রাগিব সারজানি ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে প্রাক-ইসলামি যুগের প্রসিদ্ধ কিছু চিকিৎসাব্যবস্থা আলোচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরেছেন। মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অবদান উল্লেখ করেছেন। তার আলোচনার সিংহভাগজুড়ে রয়েছে আব্বাসি খেলাফত আমলে চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান। তাই এই গ্রন্থকে ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল গ্রন্থ বলা যায় না। বরং এটি ইতিহাসের কালো আস্তরে ঢেকে যাওয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান উন্মোচনের কার্যকরী ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। তবে এই গ্রন্থ বর্তমান মুসলিম প্রজন্মকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবে এবং পূর্বপুরুষদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ লালনে উজ্জীবিত করবে। নিঃসন্দেহে গ্রন্থটি পাঠে তারা গর্বিত হবে। গবেষণা ও অধ্যয়নে তারা পূর্বসূরিদের মতোই অনুপ্রাণিত হবে।

বলতে দ্বিধা নেই, গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার পেছনে দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে। গ্রন্থটির বৈষয়িক গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে আমরা একে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা করেছি। তবুও এতে ভুলভ্রান্তি ও অসৌন্দর্য থেকে যেতে পারে। আমরা চেষ্টা করব পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিতে।

গ্রন্থটি পাঠে তরুণদের অন্তরে মুসলিমদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হলে শ্রম সার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আশিকুর রহমান
২৩-০৫-২২ খ্রি.

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমরা তাঁর গুণগান গাই, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। তাঁর নিকট সরল পথের সন্ধান আর গুনাহ থেকে পবিত্রতা প্রার্থনা করি। অন্তরের অনিষ্ট আর মন্দ আমল থেকে আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েতের আলো দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

একসময় ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য, গৌরব ও উৎকর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্বে। এই আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার ছায়ায় মানবসমাজ অনেক শতাব্দী সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তায় নিঃশঙ্ক জীবনযাপন করেছে। যদি বলি ইসলামি সভ্যতায় মানুষ, প্রাণী এমনকি উদ্ভিদও তার অস্তিত্বের মূল্য অনুধাবন করেছে তাহলে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ মুসলিমরা বিশ্বাস করে, প্রকৃতির কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এই শাশ্বত সত্য মাথায় রেখে তারা আল্লাহর কিতাবে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং সকলপ্রকার রোগ-বালাই থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে আবিষ্কার করেছেন সর্বাধুনিক প্রতিষেধক।

ইসলামি সভ্যতায়[১] মুসলিমদের কোনো আবিষ্কার বা অর্জন, নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম বা গোত্রবিশেষের মাঝে কুক্ষিগত করে রাখা হয়নি। বরং জাতি ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই মুসলিমদের আবিষ্কার থেকে উপকৃত হয়েছে। এটা ইসলামের সর্বজনীনতার এক প্রকৃষ্ট দলিল। আমরা এ গ্রন্থে এর সপক্ষে বহু প্রমাণ উল্লেখ করেছি।

সম্ভবত মুসলিম সভ্যতার অগ্রগতির সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠেছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে। কারণ তারা মানবজাতির প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান

১. ইসলামি সভ্যতা বলতে মুসলিমদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শাসনের স্বর্ণযুগ বোঝানো হচ্ছে।

রক্ষা করেছেন অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে। যারা ইসলামি সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তারা একদিকে যেমন অনুবাদ করে গিয়েছেন গ্রিক, পারসিক, চৈনিক আর হিন্দুস্তানি প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান, আরেকদিকে এগুলোর অযাচিত অংশগুলোর সমালোচনাও করেছেন। সম্পাদনা ও পরিমার্জনেও এগিয়ে ছিলেন তারা। ফলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা অন্ধ-অনুসরণে পর্যবসিত হয়নি। সাহিত্য, বিজ্ঞান আর শিল্পের পরতে পরতে ছিল মুসলিমদের সৃজনশীলতার ছাপ। এভাবেই তারা মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের সূচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাসের পাথরে খোদাই করা এই গভীর পদচ্ছাপ মোছা যাবে না কখনোই।

মুসলিম সভ্যতার এই সৃজনশীলতা আর অগ্রগতির দরুন গোটা পৃথিবীর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল ইউরোপের রাজরাজড়াদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। খ্রিষ্টান রাজন্যবর্গ পাশ্চাত্য থেকে প্রায়ই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত। কখনো শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করতে, কখনো আবার ভালো চিকিৎসা নিতে। এজন্য ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon)[৩] আকাঙ্ক্ষা করেছেন, যদি মুসলিমরা ফ্রান্সের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারত, তাহলে কতই-না ভালো হতো! প্যারিস নগরী হয়ে উঠত মুসলিম আন্দালুসিয়ার কর্ডোভা।[৪] ইসলামি সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ বোঝাতে গিয়ে তিনি এও বলেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতি আরব মুসলিমদের অবদান ছাড়া আর কিছুই নয়।[৫]

ইহুদি গবেষক ফ্রাঞ্জ রোজেনথালও (Franz Rosenthal)[৬] এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষে অবাক হয়ে নিজের অভিব্যক্তি

---

৩. **গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon)** : একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ। ১৮৪১ সালের ৭ মে ফ্রান্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজ, মেডিসিন এবং পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। তার অনেক মৌলিক গবেষণামূলক কাজের মধ্যে একটি হলো, আরব সভ্যতা নিয়ে তার লেখা বই *La Civilisation des Arabes* (ফরাসি ভাষায় লিখিত)। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৪ সালে। এর ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৯৭৪ সালে *The World of Islamic Civilization* নামে। বইটির আরবি অনুবাদ হয়েছে *হাযারাতুল আরব* নামে। আধুনিক যুগে লেখা ইসলামি আরব সভ্যতা সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দরুন বইটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

৪. হাযারাতুল আরব, পৃ. ১৩, ৩১৭

৫. হাযারাতুল আরব, পৃ. ৫৬৬

৬. **ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল (Franz Rosenthal 1914-2003)** : হল্যান্ডের একজন দার্শনিক।

প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই সভ্যতার ক্রমশ অগ্রগতির দিকটা খুবই উদ্দীপক একটি বিষয়। ইতিহাসে স্বতন্ত্রভাবে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার দাবি রাখে। কারণ যে অভাবনীয় দ্রুততায় এই সভ্যতার বিনির্মাণ হয়েছে, তা আমাদের হতবাক করে দেয়। সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এমন বিস্ময়কর ঘটনা পাওয়া দুষ্কর। এই সভ্যতা নিয়ে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মনে সর্বদাই জেগেছে নানা বিস্ময়। এজন্যই এই সভ্যতাকে আমি 'অলৌকিক সভ্যতা' বলে অভিহিত করতে চাই। কেননা এই সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে পরম রূপ এত দ্রুত লাভ করেছে যে, বলা যায়, এই সভ্যতার পথচলা শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছে গিয়েছে সর্বোচ্চ শিখরে।[৭]

ইসলামি সভ্যতা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন করেছে, তার বিশাল একটি অংশ জুড়ে ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান। এই চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়েই কিছু কথা বলতে চাই *কিসসাতুল উলুমিত তিব্বিয়া ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়া* (ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস) নামক এ গ্রন্থে। চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের সুস্থতার সাথে সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞান। এর সাথে আরও রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ফার্মাকোলজি, পরজীবীবিজ্ঞান এবং জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা প্রভৃতি। এসব বিজ্ঞানও বেড়ে উঠেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাত ধরে; মানব, প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য একটা সুন্দর পরিবেশ আর সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা পথিকৃৎ ছিলেন তাদের কথাও এখানে মর্যাদার সাথে তুলে আনা হয়েছে। তাদের আবিষ্কার আর সৃজনশীলতা মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ। বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও তাদের কাছে ঋণী। মেধা আর অতুলনীয় প্রতিভার পাশাপাশি তাদের মাঝে ছিল অত্যন্ত বিনয়-নম্রতা আর ইলমের আমানতদারির মহৎ গুণ। তারা গ্রিক কিংবা অন্যান্য সভ্যতা থেকে যা শিখেছেন, তা কখনোই নিজেদের নামে চালিয়ে দেননি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান ছিল এই ধারা।

এই গ্রন্থে আমি ইসলামি সভ্যতার ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে পাশ্চাত্যের গবেষক এবং বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষ্যও এনেছি। বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন তুলে ধরেছি। ফলে মানবসভ্যতায় মুসলিমজাতির অবদান জানতে যারা আগ্রহী, তাদের জন্য এটি হবে এক আলোকমশাল।

---

৭. হিরা পত্রিকা (বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা), সংখ্যা : ৯, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭

পরিশেষে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের হারানো সম্মান এবং মর্যাদা আবার ফিরিয়ে দেন। মুসলিমরাও যেন সব রকমের চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে যেন তারা সোনালি অতীতের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে যার উপমা মেলা ভার। আল্লাহর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। তিনিই সকল কিছুর অভিভাবক।

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমজাতিকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন।

—ড. রাগিব সারজানি

কায়রো, মিশর

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান

মুসলিমজাতি স্বর্ণযুগে যেসব জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখেছে, তন্মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান অন্যতম। মুসলিমদের পূর্বে চিকিৎসাশাস্ত্র সামগ্রিকভাবে অতটা ব্যাপক, ব্যতিক্রম এবং বাস্তবমুখী অগ্রগতি অর্জন করেনি। কোনো পাঠক কিংবা গবেষক চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে গভীর পাঠে নিমগ্ন হলে তার ধারণা হতে পারে যে, মুসলিমদের পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেন কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তিই ছিল না।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান কেবল রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং মুসলিমগণ মৌলিক পরীক্ষণমূলক (Experimental) পদ্ধতি আবিষ্কারেও অবদান রেখেছেন। তারা রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, চিকিৎসার উপাদান ও সরঞ্জাম তৈরি এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানবিক ও আদর্শিক গুণ বজায় রেখেছেন। প্রায় সকল স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের চেষ্টা-পরিশ্রম। ওষুধ আবিষ্কার থেকে শুরু করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদে তারা নতুন থেকে নতুনতম, সহজ থেকে সহজতম পথে যাত্রা করেছিলেন।

ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতির দরুন অসংখ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও গবেষক জন্ম নিয়েছেন, যারা প্রাচীন সভ্যতার চিকিৎসাপদ্ধতি ভিন্নপথে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মুসলিমদের সেই ধারার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা এই নিখাদ সত্যটি খুঁজে পাব।

এই অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে কয়েকটি পরিচ্ছেদে। এসব পরিচ্ছেদে যেসব আলোচনা আসবে সেগুলো হলো—

- ইসলাম আগমনের পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞান
- চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশে ইসলাম
- চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান
- ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম আগমনের পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞান

এটা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে, চিকিৎসা এবং ওষুধ মানুষের শারীরিক ব্যথা ও যন্ত্রণার সাথেই জড়িত। কারণ যন্ত্রণা অনুভব করার পরই মানুষ সেই যন্ত্রণার প্রতিষেধক সন্ধান করে। তারপর চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্তি সম্ভব হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, মানুষ যতটা প্রাচীন, চিকিৎসাশাস্ত্র ততটাই আদিম। সূচনা থেকেই আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও উন্নতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রোগের ওষুধ খুঁজে পেয়েছে। তবে এটা সত্যি, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের তুলনায় তা ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। তখনকার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের সাথে সংগতি রেখেই এগোচ্ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। এটাকে সাধারণত প্রাগৈতিহাসিক চিকিৎসা (Prehistoric medicine) বা আদিম চিকিৎসা (Primitive Medicine) বলা হয়। এজন্যই ইবনে খালদুন (৮০৮ খ্রি.) বলেছেন, ...আদিম সমাজে যারা নাগরিক জীবনযাপন করত তারা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছিল। প্রজন্মপরম্পরায় এই চিকিৎসার রীতিনীতিগুলো তারা রপ্ত করত। সেগুলোর কিছু হয়তো সঠিক ছিল; কিন্তু সেই চিকিৎসাপদ্ধতির সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা ছিল না।[৮]

সামনে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে ইসলাম-পূর্ব যুগের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরব। সেগুলো হলো—

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা
- চীনা সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা
- প্রাচীন ভারতবর্ষে চিকিৎসাব্যবস্থা

৮. *আল-ইবার ফি দিওয়ানিল মুবতাদায়ি ওয়াল-খবর*, ১/ ৬৫০

- গ্রিক সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা
- রোমান সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা
- ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের চিকিৎসাব্যবস্থা

❀❀❀

প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা

প্রাচীনতম জাতি ও সভ্যতাগুলোর মাঝে মিশরীয় সভ্যতা চিকিৎসাব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়, অঙ্গ কর্তন, অপারেশন, লাশের মমিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তারা চূড়ান্ত যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। অনেক মমিতে বিভিন্ন অঙ্গের অস্ত্রপচারের চিহ্ন রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরে পাওয়া যায় তাদের আবিষ্কৃত প্যাপিরাস[৯], যাতে লেখা আছে তাদের চিকিৎসাগত বহু পরীক্ষানিরীক্ষার কথা। এমনকি তারা আমেনহোতেপকে বানিয়ে নিয়েছিল চিকিৎসা ও আরোগ্যের উপাস্য।[১০]

মহাকবি হোমার তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *অডিসিতে* মিশরীয় চিকিৎসকদের দক্ষতা তুলে ধরতে ভুলেননি। তিনি সেখানে বেশ কয়েক বার বলেছেন, তারা বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। প্রতিটি রোগের জন্য ছিল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। কথিত আছে, পারস্যের সম্রাট সাইরাস চক্ষুচিকিৎসক চেয়ে মিশরে দূত পাঠিয়েছিলেন। তার পৌত্র দারা মিশরীয় চিকিৎসকদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতায় অভিভূত ছিলেন। এমনকি গ্রিকরাও জানত মিশরের চিকিৎসাদেবতা আমেনহোতেপের নাম। ভেষজ ওষুধবিজ্ঞান ও শল্যচিকিৎসার উপকরণ (Surgical instrument) সম্পর্কিত অনেক বিদ্যা গ্রিকরা হুবহু বর্ণনা করেছে মিশরীয়দের থেকে।[১১]

তবে লক্ষণীয় যে, মিশরীয়দের চিকিৎসাব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল উপাসনালয়ের সাথে। বিভিন্ন রোগের আরোগ্যের ক্ষেত্রে তাদের ছিল অনেক উপাস্য। চিকিৎসকদের সাহায্যকারী মনে করা হতো উপাস্য থোথকে।

---

৯. প্যাপিরাস : প্রাচীন মিশরে নীলনদের তীরে নলখাগড়াজাতীয় গাছ পাওয়া যেত। সেই গাছ কেটে তা থেকে প্রাপ্ত খোল পাথর চাপা দিয়ে সোজা করে রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করা হতো। তারপর আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে রোল আকারে সংরক্ষণ করা হতো। এভাবে তৈরি প্রাচীন লেখার উপযোগী উপাদানকে প্যাপিরাস বলা হয়। বর্ণমালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশরীয়দের যেমন বিশেষ অবদান ছিল, তেমনই তারা আবিষ্কার করেছিলেন লেখার উপযোগী এই চমৎকার উপাদানটি।

১০. তাতাওউরুল *ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৭০

১১. *ফি তারিখিত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮

দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের আশায় আরাধনা করা হতো আইসিস দেবীর। একসময় পুরো রোমান সাম্রাজ্যের মানুষ রোগ নিরাময়ের আশায় আইসিস দেবীর উপাসনা করত। আইসিস দেবীর প্রতিকৃতি ছিল সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা নারীর মতো। কিছু প্রতিকৃতিতে দেখা যায় পুত্র হোরাস রয়েছে তার কোলে।[১২]

চিকিৎসাক্ষেত্রে জ্যোতিষীদের ভূমিকাও কম ছিল না। তারা অসুস্থদের সেবা করত। বিনিময়ে মন্দিরের আয় থেকে তাদের বেতন দেওয়া হতো। প্রাচীন মিশরীয়রা ধারণা করত, রোগ-বালাই মূলত মানুষের শরীরে বাসা বাঁধা মন্দ আত্মার কুফল। এজন্য জ্যোতিষীদের চিকিৎসাপদ্ধতিতে দেখা যায়, প্রথমে তারা মন্দ আত্মার প্রকৃতি, তাৎপর্য ও গুণাবলি বোঝার চেষ্টা করে। তারপর সে অনুযায়ী তাবিজ-কবজ, পানিপড়া, কখনো আবার জাদু-টোনার পাশাপাশি স্তব ও মন্ত্রোচ্চারণ, নৈবেদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে মন্দ আত্মা তাড়ানোর চেষ্টা করে। বিভিন্ন মৃত পশুর হাড্ডি, চামড়া অথবা ঘাস-লতাপাতার মাধ্যমে তারা মন্দ আত্মার শক্তিকে প্রাথমিকভাবে নিঃশেষ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।[১৩]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসায় প্রথমে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা ছিল জ্যোতিষীদের মাধ্যমে। এরপরে উপাসনালয়ের ধর্মীয় ব্যক্তিদের বাইরে একদল চিকিৎসকের দেখা পাওয়া যায়। তাদের মধ্য থেকে আবার দুটি দল বের হয়। একদল চিকিৎসা করত জাদু-টোনা ও মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে। অপরদল চিকিৎসা করত ভেষজ ওষুধ ও শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে। তাদের মাঝে বিভিন্ন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের দেখা মেলে।[১৪]

মমি তৈরির ক্ষেত্রে মিশরীয়রা যে চূড়ান্ত যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিল, সেটা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা, দাঁতের চিকিৎসা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বুক কেটে অপারেশন করা, পাকস্থলীর রোগ, ডায়রিয়া, মূত্রনালির রোগ-সহ বিভিন্ন রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত।[১৫]

১২. *ফি তারিখিত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮
১৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬
১৪. *ফি তারিখিত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮
১৫. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় চিকিৎসকগণ তাদের জ্ঞান-গবেষণা ও অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেন প্যাপিরাস কাগজে। বিভিন্ন ধরনের প্যাপিরাস কাগজ সেখানে প্রচলিত ছিল। যেমন কুইন প্যাপিরাস। এখানে সাধারণত নারীদের রোগ ও নিরাময়ের বর্ণনা ছিল। আরেকটি রয়েছে এডুইন স্মিথ প্যাপিরাস[১৬]। এর মধ্যে লেখা ছিল অস্ত্রপচারের নিয়মকানুন। আরও ছিল এবারস প্যাপিরাস। এটি অভ্যন্তরীণ রোগ, মন্দ আত্মার প্রকৃতি, ভেষজ ওষুধ ইত্যাদি সম্পর্কে লিখিত। মিশরের এই তিন ধরনের গ্রন্থ থেকে বোঝা যায়, তারা আসলে চিকিৎসাশাস্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করে ফেলেছিল।

১. নারী সম্পর্কিত রোগের চিকিৎসা
২. অঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত চিকিৎসা
৩. অভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা

এই বিভক্তিগুলো বর্তমান যুগেও দেখা যায়।[১৭]

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় জ্ঞানতত্ত্ব ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অধীনেই চিকিৎসার চর্চা ও বিকাশ ঘটেছে। এগিয়ে গিয়েছে তারা ধীরে ধীরে। কিন্তু ইন্দ্রজাল, জাদু-টোনা, মন্ত্রতন্ত্র তাদের চিকিৎসাক্ষেত্রে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেখানে জ্যোতিষীদেরও বেশ প্রভাব লক্ষ করা যায়। ফলে তারা পিছিয়েই ছিল।

❁ ❁ ❁

১৬. **এডুইন স্মিথ প্যাপিরাস** : এটি একটি প্রাচীন মিশরীয় মেডিক্যাল পাঠ্যবই। ট্রমার ওপরে রচিত প্রাচীনতম সার্জিক্যাল নিবন্ধ এটি। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে এডুইন স্মিথ এই প্যাপিরাস ক্রয় করেছিলেন। তার নামানুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছে। এই নথিটি সামরিক শল্যচিকিৎসার সারগ্রন্থ হতে পারে। এতে আঘাত, অস্থি ভঙ্গ, ক্ষত, স্থানচ্যুতি এবং টিউমারসংক্রান্ত ৪৮টি কেস স্টাডি বর্ণনা করা হয়েছে।—অনুবাদক
১৭. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাব্যবস্থার মতো ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাব্যবস্থায় একাকার হয়ে গিয়েছিল জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্র। কারণ তারা বিশ্বাস করত, রোগ মূলত রোগীর পূর্বের কোনো পাপের ঐশী শাস্তি। এজন্যই দেখা যায়, জ্যোতিষী বা জাদুকররা চিকিৎসায় কোনো ভুল করলে তারা কোনো পদক্ষেপই নিত না। অন্যদিকে শল্যচিকিৎসক যদি প্রতিষেধক বা অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ভুল করত, তাহলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো তাকে। কারণ সে নিজের অভিজ্ঞতা ও শক্তির ওপর নির্ভর করে চিকিৎসাকার্য পরিচালনা করত; জ্যোতিষীদের মতো জাদু অথবা ঐশীবিদ্যার আশ্রয় নিত না। হাম্মুরাবির সংবিধানে লিখিত রয়েছে, যদি চিকিৎসক অঙ্গচ্ছেদ বা অপারেশন করতে গিয়ে ভুল করে ফেলে তাহলে তার হাত কেটে ফেলা হবে। যদি তার পাওনা থেকে বেশি মূল্য নেয় তাহলে তাকে কারাগারে বন্দি করা হবে। হাম্মুরাবির সংবিধানে চিকিৎসকের পারিশ্রমিক এবং চিকিৎসাসেবার মূল্য নির্ধারিত ছিল। এ সংবিধানমতে শিশুকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অবহেলা করলে দুধমাতাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো ।[১৮]

সভ্যতার আঁতুড়ঘর মেসোপটেমীয় সভ্যতায় চিকিৎসার তিনটি পদ্ধতি ছিল—[১৯]

১. প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা (Preventive healthcare) : এই ব্যবস্থায় স্বাভাবিক প্রেসক্রিপশন ও নির্দেশনার মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হতো।

২. শারীরিক চিকিৎসাপদ্ধতি (Physical medicine) : প্রাণী, উদ্ভিদ এবং আকরিক থেকে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে এই চিকিৎসাপদ্ধতি পরিচালিত হতো।

---

১৮. *ফি তারিখিত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪

১৯. *তারিখুল উলুমি ইনদাল আরব*, পৃ. ৪৮

৩. মনোরোগবিদ্যা (Psychiatry) : এ ক্ষেত্রে তারা সাধারণত জাদু ও বশীকরণবিদ্যা প্রয়োগ করত।

স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করত না। তবে অঙ্গব্যবচ্ছেদ ও অস্ত্রপচারের ক্ষেত্রে অজ্ঞান করার জন্য হাশিশ ও আফিম ব্যবহারের প্রচলন ছিল। চিকিৎসকরা যদি রোগীর চিকিৎসা প্রদানে ব্যর্থ হতো, তাহলে রোগীর অভিভাবকরা রোগীকে উন্মুক্ত স্থানে রেখে দিত। তারা আশা করত, হয়তো কেউ তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে রোগের প্রকৃতি বুঝতে পেরে এর চিকিৎসা বলে দিতে পারবে।[২০]

সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যাবিলনীয়দের চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল মূলত জ্যোতিষশাস্ত্র ও জাদু-টোনানির্ভর। রোগের ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক ধারণা ছিল, উপাস্যদের ক্রোধের কারণে অথবা কালো জাদুর প্রতিক্রিয়ায় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

❁❁❁

---

২০. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২০ ও *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

চীনা সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা

চীনের প্রাচীন চিকিৎসাব্যবস্থার আলোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঈসা আ.-এর জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে। ওয়াই পোয়াং-কে প্রাচীন চীনা সভ্যতায় প্রসিদ্ধ একজন চিকিৎসক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চীনাদের মধ্যে প্রথম উদ্ভিদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন শেন নং। তিনি পরিচিত ছিলেন সম্রাট ফুয়ু নামে। তিনি বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের প্রভাব নিজের ওপর পরীক্ষা করে দেখতেন। প্রাচীন চীনে চিকিৎসার প্রচলিত পদ্ধতি ছিল গাছ-লতাপাতার ওষুধ, গরম শিক দ্বারা দহন (Moxibustion) এবং আকুপাংচার[২১]। এজন্যই তারা শারীরবৃত্তি ও দেহের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।[২২]

দেহের অভ্যন্তরীণ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রাচীন চীনের চিকিৎসকগণ অনেক এগিয়ে ছিলেন। তারা শল্যচিকিৎসার বিভিন্ন কায়দা-কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। আহমাদ শওকত তাশি *তারিখুত তিব ওয়া আদাবুহু ওয়া আলামুহু* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে ইগনিপাংচার (Ignipuncture) নামে যে চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেটাই মূলত প্রাচীন চীনের চিকিৎসাপদ্ধতি। গরম সুঁই চামড়ায় প্রবেশ করানোর মাধ্যমে এই চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এজন্যই শারীরবিদ্যা সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিতভাবে

---

২১. **আকুপাংচার :** ফিজিয়োলজির তথ্য অনুযায়ী মানুষের শরীরের মধ্যেই সমস্ত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। সেখানে গোলযোগ হলেই আমরা আক্রান্ত হই বিভিন্ন রোগে। অ্যালোপ্যাথি বা মডার্ন মেডিসিনের ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর শরীরের ঘাটতিগুলো অনুসন্ধান করে ওষুধ প্রয়োগ করে ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করেন। আকুপাংচারের কাজটাও তাই। পার্থক্য একটাই, এখানে ওষুধ খেতে হয় না। নার্ভ স্টিমুলেট করে শরীরের ভেতরে থাকা কেমিক্যালগুলোর পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঠিকমতো কাজ করানোই আকুপাংচারের কাজ। বহু গবেষণার পর আকুপাংচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আকুপাংচারকে স্বীকৃতি দেয়।

২২. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৫, ২৬

জানতে হতো। তারা বিশ্বাস করত, মানবদেহ বহু আন্তঃসম্পর্কীয় তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত।[২৩]

প্রাচীন চীনাদের সম্পর্কে আরও বলা হয়, তারা স্পন্দনের (Pulse) মাধ্যমেও রোগ নির্ণয় করতে পারত। তারা বিশ্বাস করত তাপ, ঠান্ডা, শুষ্ক এবং আর্দ্রতা রোগ সৃষ্টির কারণ। এজন্য তাদের ধারণা ছিল, বক্ষব্যাধি ও ফুসফুসের রোগ সাধারণত শীতকালে হয়। জ্বর হয় শরৎকালে। সর্দি-কাশি ও মানসিক রোগ হয় বসন্তকাল। আর চর্মরোগ প্রকাশ পায় গ্রীষ্মকালে।[২৪]

স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, প্রাচীন চীনের চিকিৎসাব্যবস্থা অন্যান্য জাতির চিকিৎসাব্যবস্থা থেকে অনেকটা ভিন্নরকম ছিল। তারা কোনো ধরনের জাদু-টোনা, মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করত না চিকিৎসার ক্ষেত্রে। বরং আকুপাংচারে তাদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সিংহভাগ রোগের চিকিৎসা তারা এ পদ্ধতিতেই করত।

❁❁❁

২৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৩
২৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতবর্ষে চিকিৎসাব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল রূপকথা ও জাদুবিদ্যা। তবে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা (অ্যানাটমি) সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অন্যদের থেকে যথেষ্ট বেশি ছিল। অস্ত্রোপচারে তারা ছিল প্রসিদ্ধ । তাদের ধারণা ছিল সকল রোগ-ব্যাধি জন্ম নেয় মানুষের পাপ অথবা দেহরসের গরমিলের কারণে।

প্রাচীন ইতিহাসে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ভারতীয়রা স্মল পক্স বা গুটিবসন্ত প্রতিরোধ করার জন্য একধরনের টিকা ব্যবহার করত। এ ছাড়াও প্লাস্টিক সার্জারি, স্কিন গ্রাফটিং[২৫], পেট কেটে শিশু ডেলিভারি (সিজার), হার্নিয়া[২৬] চিকিৎসা, মূত্রনালি ও মূত্রাশয় থেকে পাথর বের করা, চোখের ছানি কাটা, অঙ্গ কেটে ফেলা, শরীরের টক্সিন বা বিষ বের করা ও প্রতিষেধক প্রদানে তাদের ভূমিকা লক্ষণীয়। সার্জারির ক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ করতে তারা ব্যবহার করত উষ্ণ তেল ও চাপ। এই কাজে তারা গরম লোহাও ব্যবহার করত। শল্যচিকিৎসার জন্য তারা প্রায় শতাধিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। চিকিৎসাক্ষেত্রে এত উন্নতির পরও জাদু-টোনা ও রূপকথার বলয় থেকে তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি মুক্ত ছিল না।[২৭]

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত প্রথম গ্রন্থ ছিল *অথর্ববেদ*। এটি হিন্দুধর্মের একটি পবিত্র গ্রন্থ। অথর্ববেদে বিভিন্ন রোগের নাম ও লক্ষণ লেখা রয়েছে। আরও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার সাথে যুক্ত মন্ত্র ও শ্লোক। প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল জাদুবিদ্যার হাত ধরে। সে সময়ের চিকিৎসকরা এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করত। রোগীকে সুস্থ করার জন্য তারা মানবদেহের কঙ্কাল, মাথার খুলি, হাড়-সহ বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করত।

---

২৫. অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খুঁতযুক্ত ত্বক অপসারণ করে নিখুঁত ত্বক প্রতিস্থাপন করা।

২৬. **হার্নিয়া :** একটি অন্ত্রের রোগ। হার্নিয়া হলে উদরস্থ খাদ্যনালি পেটের দুর্বল অংশ দিয়ে ফোলা আকারে বেরিয়ে আসে। তখন কুঁচকি ও অণ্ডথলি অস্বাভাবিক ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা হয়।

২৭. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৬

তাদের ধারণা ছিল মন্ত্রপাঠে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কার্যকরী হয়ে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে পার্থিব উপকরণে তাদের আস্থা বাড়তে থাকে। তবুও চিকিৎসাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য তারা তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করত। বর্তমানে যেমন আমরা প্রচলিত চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীকে বিভিন্নভাবে সাহস জুগিয়ে মনোবল বাড়িয়ে তুলি, তেমনই তারা তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করে রোগীর মনোবল বাড়িয়ে তুলত।

অথর্ববেদের শেষে পরবর্তী সময়ে আরেকটি গ্রন্থ যুক্ত করা হয়েছিল। সেটার নাম ছিল আয়ুর্বেদ; যার অর্থ 'দীর্ঘ জীবনের জন্য জ্ঞান'। এই শাস্ত্রমতে, রোগ সাধারণত তৈরি হয় বায়ু, জল, কফ ও রক্ত এই চারটি উপাদানের কোনো একটিতে গরমিলের ফলে। আর আরোগ্যের উপায় হলো ঘাস, লতাপাতা ও মন্ত্রতন্ত্র।

ভারতের বর্তমান কবিরাজি চিকিৎসায় প্রাচীন সেই চিকিৎসার বিস্তর প্রভাব রয়েছে। *ঋগ্‌বেদ* গ্রন্থে প্রায় হাজার প্রকারের ভেষজ ওষুধের নাম রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সকল রোগের মহৌষধ হলো পানি।[২৮]

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে দুটি নাম খুবই পরিচিত। একটি হলো সুশ্রুত; তিনি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের চিকিৎসক। আরেকজন ছিলেন খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর চিকিৎসক চরক। সুশ্রুত ছিলেন বারাণসী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর সুশ্রুত-সংহিতা নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সেখানে ছিল বিভিন্ন রোগের বর্ণনা ও আরোগ্যের নিয়মকানুন। তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন ধন্বন্তরির নিকট থেকে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিমতে ধন্বন্তরি ছিলেন দেবতাদের চিকিৎসক।

সুশ্রুতের এই বইটিতে শল্যচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, স্বাস্থ্যকর খাবার, স্নান, ওষুধ, শিশুদের খাওয়ানো, যত্ন এবং চিকিৎসা শিক্ষার ওপর ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চরক সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন চরক-সংহিতা। এর অর্থ 'বিশ্বকোষ'। চরক-সংহিতা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যার মৌলিক গ্রন্থ। বর্তমানেও ভারতবর্ষে গ্রন্থটি বেশ প্রসিদ্ধ। এতে বিভিন্ন রোগের কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসাগুলো সংকলন করেন চরক। গ্রন্থটিতে ১২০টি অধ্যায় রয়েছে, যা আটটি অংশে বিভক্ত।

---

২৮. *কিসসাতুল হাযারা*, ২/ ২৪২

চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে চরক তার সংহিতায় যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তা অনেকটাই গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিল রাখে। তিনি সেখানে বলেছিলেন, মানুষের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে কখনোই নিজের স্বার্থের লোভ-লালসা রাখবে না। টাকাপয়সা উপার্জনের প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে। শুধু একটি উদ্দেশ্যে চিকিৎসাকার্য চালিয়ে যাবে। তা হলো, ব্যথিত মানবতার দেহ থেকে ব্যথা প্রশমিত করা।[২৯]

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাব্যবস্থায় অলীক কল্পনা ও রূপকথা ছিল বটে, কিন্তু সেটার তুলনায় মৌলিক চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র অপ্রতুল ছিল না। প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে তন্ত্রমন্ত্রও যথেষ্ট কম ছিল প্রাচীন ভারতে। এ ছাড়া তারা যেসব অস্ত্রোপচার নিয়ে লেখালেখি করেছে, সেগুলো থেকে চিকিৎসাক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এজন্যই আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মনসুরের (১৩৬-১৫৮ হি.) শাসনামলে আরব-মুসলিমরা হিন্দুস্তানের চিকিৎসাবিদ্যার মৌলিক গ্রন্থগুলো অনুবাদে মনোনিবেশ করে।[৩০]

❁❁❁

২৯. *কিসসাতুল হাযারা*, ২/২৪২

৩০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২৭

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

গ্রিক সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা

কোনো সন্দেহ নেই, প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রিক চিকিৎসাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রিক চিকিৎসকগণ তাদের পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলি সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতির জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করেছে। তবে সেখানেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অর্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য এনেছে। কারণ গ্রিক চিকিৎসকদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাধারা অনেক বেশি সৃজনশীল ও যৌক্তিক ছিল। এটাকে পুঁজি করে তারা গড়ে তুলেছে স্বতন্ত্র চিকিৎসাধারা, যার সাথে পূর্ববর্তীদের ছিল বিশাল ব্যবধান। গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের জন্য এক হিপোক্রেটিসই (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ থেকে ৩৫৭) যথেষ্ট; যিনি মানবসভ্যতার চিকিৎসাসম্রাট হিসাবে বিবেচিত।[৩১]

গ্রিক চিকিৎসায় দুটি ধারা ছিল। জাদু-টোনা ও জ্যোতিষবিদ্যার মাধ্যমে প্রচলিত ছিল একধরনের চিকিৎসা। এই ধারার চিকিৎসকরা উত্তরাধিকারসূত্রে এই পেশা লাভ করত। তারা কখনো সাধারণ মানুষকে এই পেশায় নিযুক্ত করত না। তারা রোগের জন্য শয়তান ও অসুরদের অপশক্তিকে দায়ী করত। আর আরোগ্যের কৃতিত্ব দিত দেবতাদের। প্রাকৃতিক ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসার আরেকটি ধারা ছিল। এখানে অদৃশ্য জগতের কোনো কারসাজি ছিল না। এই ধারার চিকিৎসকগণ বর্ণনামূলকভাবে রোগ নির্ণয় করতেন। এটা ছিল দার্শনিকদের চিকিৎসার ধারা। তবে এই দুই ধারার কেউই নিজেদের চিকিৎসাকে শাস্ত্রীয় রূপ দিতে পারেনি। প্রথম চিকিৎসার শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছিলেন দার্শনিক হিপোক্রেটিস। এজন্যই তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক বলা হয়।[৩২]

ইতালির প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক অ্যালডো মেলি (১৮৭৯-১৯৫০ খ্রি.) *আরব বিজ্ঞান : বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তনে এর ভূমিকা* গ্রন্থে লিখেছেন, সে সময়ের

---

৩১. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৭

৩২. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৭০

গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা সত্যিই বিস্ময় জাগায়। পূর্ববর্তীদের থেকে তারা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিল। তারা পূর্ববর্তীদের মতো কেবল রোগ নির্ণয়ের কিছু মৌলিক নীতি, রোগের উপসর্গ আর সার্জারিভিত্তিক মতামতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের বিশেষ কিছু মৌলিক উদ্ভাবন ছিল। যেমন অ্যানাটমি এবং ফিজিয়োলজির উদ্ভাবন, যা ছিল সঠিক চিকিৎসাচিন্তার ভিত্তি।[৩৩]

মুহাম্মাদ যুহাইর আল-বাবা *ফার্মেসি আইন ও নীতিশাস্ত্র* গ্রন্থে লিখেছেন, হিপোক্রেটিস-সহ গ্রিসের বড় বড় চিকিৎসকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটা রোগ আর রোগী নিয়ে অনবরত গবেষণা ও অভিজ্ঞতার নাম। রোগ যেসব কারণে মানুষের দেহে আশ্রয় নেয়, সেগুলোর মৌলিক দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন হিপোক্রেটিস। **এক.** দূরবর্তী কারণ, **দুই.** নিকটবর্তী কারণ। খাদ্য ও আবহাওয়ার গোলযোগ রোগের দূরবর্তী কারণ। আর রোগের নিকটবর্তী কারণ হলো, দেহের চারটি মৌলিক উপাদানের কোনো একটির ঘাটতি বা প্রাধান্য লাভ করা। চারটি উপাদান হলো, রক্ত (বাতাস), কফ (পানি), হলুদ পিত্ত (অগ্নি), কালো পিত্ত (মাটি)। এজন্য তারা এভাবে রোগের চিকিৎসা করতেন যেন দেহের মৌলিক উপাদানগুলোর ভারসাম্য বজায় থাকে আর ক্ষতিকর অংশ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।[৩৪]

কতিপয় ঐতিহাসিক মনে করেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম মূলত গ্রিক সভ্যতায়। কারণ বর্তমানের চিকিৎসাব্যবস্থায় লাঠি আর সাপের যে সম্মিলিত প্রতীক ব্যবহার করা হয়, তার নাম রড অফ এস্কেলপিয়াস। এটা মূলত গ্রিকের রোগ আরোগ্যদাতা দেবতা অ্যাস্কেলপিয়াসের প্রতীক। বিশ্বব্যাপী বড় বড় মেডিক্যাল ও স্বাস্থ্য সংস্থায় এই প্রতীক দেখা যায়। যেমন মেডিক্যাল প্রোটেকশন সোসাইটি, স্টার অফ লাইফের জরুরি চিকিৎসাসেবা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতীক। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিকরা বলেন, গ্রিকদের থেকে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় চিকিৎসা গুণে-মানে আরও উন্নত ছিল। খোদ গ্রিকরাই মিশর সম্পর্কে বলত, মিশর হলো জ্ঞানবিজ্ঞানের মৌলিক উৎস। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রসরতা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে গ্রিকরা। এটা সুস্পষ্ট

---

৩৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৮
৩৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৯

বিষয়। কারণ গ্রিসের বৃহৎ দ্বীপ ক্রিটে এসে মিলিত হয়েছিল ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশ। সেটা ছিল গ্রিক সভ্যতার জন্মভূমি।

গ্রিক সভ্যতার দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিপাতে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যা দীর্ঘকাল জাদু-টোনা আর নির্মম অভিজ্ঞতার অধীন ছিল। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। এসব ভিত্তিহীন নিয়মকানুন গ্রিসের আশেপাশের জনগণের কাছেও পরিচিত ছিল। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রিসের একদল লোকের হাতে কুক্ষিগত ছিল অনেক কাল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এভাবেই চলতে থাকে। যেন তারাই ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের একক স্বত্বাধিকারী। জনগণ তাদেরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছে। অধিষ্ঠিত করেছে বীরের মর্যাদায়। চিকিৎসার মতো একটা মানবিক বিদ্যা আটকে যায় মন্দিরের প্রকোষ্ঠে। অবশেষে হিপোক্রেটিস এসে মুক্তি দেন চিকিৎসাবিদ্যাকে। তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দাঁড় করান এই শাস্ত্রের। এখান থেকেই তাদের মাঝে মুক্ত চিকিৎসা গবেষণার সূচনা হয়।[৩৫]

মুসলিমরা হিপোক্রেটিস-সহ অন্যান্য বিখ্যাত গ্রিক চিকিৎসকের বিভিন্ন বই অনুবাদ শুরু করেন। তারা হিপোক্রেটিসের গবেষণাকর্ম আরও উন্নত করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে বিকশিত করে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এভাবেই এই জীবন্ত শাস্ত্র সুউচ্চ শিখরে উন্নীত হয়।

❁ ❁ ❁

---

৩৫. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৭-২৮; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩০

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রোমান সভ্যতায় চিকিৎসাব্যবস্থা

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ সালের দিকে রোমানদের হাতে গ্রিসের পতন ঘটে। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেয় রোমানরা। সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও বইপত্র তাদের হাতে চলে যায়। বৈষয়িকভাবে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেও জ্ঞানবিজ্ঞান, চিকিৎসাচর্চায় গ্রিকদের সমকক্ষ হতে পারেনি রোমানরা। শাসনের দীর্ঘ ছয় শতাব্দীব্যাপী তাদের এমন কোনো চিকিৎসক ছিল না, যে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করে মানুষের চিকিৎসা করবে। বরং বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করে আর জাদু-টোনার ভিত্তিতে তারা চিকিৎসা করত।[৩৬]

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধের পরিবর্তে রোমানরা সাধারণত খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম, শরীরচর্চা, গরম পানি ইত্যাদি ব্যবহারে প্রসিদ্ধ ছিল। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অস্ত্রোপচার করত না তারা। যেমন ক্যান্সারাস টিউমার, পচনশীল ঘা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অঙ্গচ্ছেদ করত। মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের সংগীত, বাদ্যযন্ত্র ও খেলাধুলার মাধ্যমে চিকিৎসার প্রশংসা কুড়িয়েছিল।[৩৭]

রোমান যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন ক্লডিয়াস গ্যালেন (১৩০-২০০ খ্রি.), মুসলিম বিশ্বে তিনি জালিনুস নামে পরিচিত। তিনি গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন। রোমান যুগ তিনি পেয়েছিলেন। জ্ঞান ও খ্যাতিতে হিপোক্রেটিসের পরেই চলে আসে তার নাম। গ্যালেন হিপোক্রেটিসের রচনা সংরক্ষণ করেছিলেন। অনুবাদের স্বর্ণযুগে[৩৮] তার রচনাবলিও মুসলিমরা

---

৩৬. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৩৫-৩৬; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫

৩৭. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫; *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৩৬

৩৮. উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে ও আব্বাসি শাসনামলের প্রথমভাগে মুসলিমগণ গ্রিকদের জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যাপকভাবে আরবিতে অনুবাদ করে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। এই যুগটি গ্রিক-আরবি অনুবাদের স্বর্ণযুগ।

অনুবাদ করেছে। ইবনে খালদুন তার সম্পর্কে লিখেছেন, জালিনুস হলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকপাল। তার রচনাবলি অনূদিত হয়েছে এবং সেগুলো চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। পরবর্তী যুগের চিকিৎসকগণ তার গ্রন্থ অনুযায়ী চিকিৎসা করেছেন।[৩৯]

ইবনে আবি উসাইবিয়া বলেছেন, জালিনুসের মাধ্যমেই জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিস্তার ঘটে। যাদেরকে সমগ্র মানবসভ্যতার চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মনে করা হয়, তাদের মধ্যে জালিনুস অষ্টম ব্যক্তি। পরবর্তী সময়ে কেউ চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার সমমর্যাদায় পৌঁছা তো দূরের কথা, ধারেকাছেও যেতে পারেনি। চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে গ্যালেন দেখতে পেলেন সংশয়বাদী সফিস্ট চিকিৎসকদের বহু ভ্রান্ত কথায় চিকিৎসাশাস্ত্র পরিপূর্ণ। এভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলধারার সৌন্দর্য মুছে যাচ্ছিল। গ্যালেনকে বিষয়টা ভাবিয়ে তোলে। তিনি সফিস্টদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করে হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাদর্শনকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন। হিপোক্রেটিস ও তার অনুসারী চিকিৎসকদের সমর্থন দেন। তিনি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি চিকিৎসাশিল্পের অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচন করেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলেন। এ বিষয়ে সঠিক তথ্যটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। জালিনুসের পরে তার সমপর্যায়ের কাউকে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে যারা এসেছেন তারা তার শিষ্য পর্যায়ের ছিলেন।[৪০]

❁❁❁

[৩৯]. *আল-মুকাদ্দিমা লি-ইবনি খালদুন*, ১/ ৪৯৩

[৪০]. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/ ৩০৭

সপ্তম অনুচ্ছেদ

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের চিকিৎসাব্যবস্থা

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে চিকিৎসার দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত. আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গগুলো কেটে ফেলা, মধু পান করা, ভেষজ ওষুধ, গণক-ওঝাদের মন্ত্র-তাবিজের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধারায় চিকিৎসা করা হতো। ইয়ামামার ওঝা রাবাহ ইবনে আজালা সম্পর্কে জাহেলি যুগের কবি উরওয়া ইবনে খুযাম বলেছেন, ইয়ামামা আর হাজরের দুজন ওঝাকে কথা দিলাম, তারা আমাকে সুস্থ করতে পারলে তাদের হুকুমের গোলাম হয়ে যাব। তারা বলল, সকল রোগ থেকে তোমাকে আমরা সুস্থ করে তুলব। তারা সেবকদের সাথে মিলে আমার শুশ্রূষা করতে শুরু করল। সব ধরনের ঝাড়ফুঁক করল এবং তাদের জানা সব ওষুধ আমাকে খাওয়াল। কিন্তু আমাকে সুস্থ করতে পারল না।

দ্বিতীয়ত. আরেক ধরনের চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও প্রবাদ-প্রবচন দিয়ে বিভিন্ন সদুপদেশ প্রদানের মাধ্যমে। যেমন উদর সকল রোগের ঘর, স্বল্পাহার শ্রেষ্ঠ ওষুধ, শুকনো গোশত মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি।[৪১]

এ ছাড়া ইসলাম-পূর্ব যুগে সাধারণ ওষুধ ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন পানীয় রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। যেমন পেটের অধিকাংশ রোগের ক্ষেত্রে মধু ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়া ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও করত তারা। যেমন হিজামা (Cupping therapy), আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়া (Moxibustion), অঙ্গব্যবচ্ছেদ (Amputation), রক্তপাত (Bloodletting) ইত্যাদি। আরব দেশে জন্মানো কিছু ভেষজ ঘাস-পাতার সন্ধানও তারা লাভ করেছিল। অভিজ্ঞতালব্ধ চিকিৎসা, প্রতিষেধক ওষুধ, ব্যান্ডেজিং চিকিৎসা, খাবারের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদির কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছাড়া তাদের মাঝে আর কিছুই ছিল না। চিকিৎসার কোনো শাস্ত্রীয় রূপ তাদের কাছে ছিল না। কবিদের কাব্যে এবং হাকিমদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত

---

৪১. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৭৩; *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৪৭-৪৮

চিকিৎসাবিষয়ক কিছু জ্ঞানই ছিল তাদের একমাত্র পুঁজি। আমরা বলতে পারি প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের চিকিৎসা জনমুখে চর্চিত ও প্রচলিত গৎবাঁধা কিছু নিয়মকানুন ছাড়া আর কিছু ছিল না।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই হাতুড়ে চিকিৎসাই চলছিল। মাঝেমধ্যে এর সাথে যোগ হতো জনসাধারণের কিছু অভিজ্ঞতা।[৪২]

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, আরবে ইসলাম-পূর্ব যুগের চিকিৎসা সম্পর্কে কোনো ইতিবাচক মন্তব্য করা সম্ভব না। জাদু, জিন, জ্যোতিষবিদ্যার পাশাপাশি কিছু সদুপদেশের ওপর ছিল তাদের চিকিৎসার ভিত্তি। তারা শয়তানকে রোগের কারণ মনে করত। রোগ নিরাময়ে তারা মন্ত্র ও তাবিজ-কবজ ব্যবহার করত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন নষ্ট অঙ্গ উপড়ে ফেলত। চিকিৎসায় তারা ব্যবহার করত মাদকদ্রব্য। ইসলামি যুগে আরবে চিকিৎসার কুসংস্কারপূর্ণ এই ধারা আমরা দেখতে পাইনি। সেটা ছিল চিকিৎসার নতুন ধারা।

❋❋❋

---

৪২. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশে ইসলাম

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে আরবে দুই ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। একটি ছিল তান্ত্রিকদের পদ্ধতি। আরেকটি ছিল চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত তুলনামূলক অভিজ্ঞদের চিকিৎসাপদ্ধতি। তান্ত্রিকরা মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে রোগ, রোগের কারণ ও প্রতিষেধক সম্পর্কে জানিয়ে দিত। তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক ও জাদু-টোনার মাধ্যমেও চিকিৎসা করত তারা। আরবের গোত্রকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক গোত্রে একজন করে তান্ত্রিক থাকত। অসুস্থ হলে কিংবা কোনো বালা-মুসিবতে পড়লে সেই তান্ত্রিকের কাছ থেকেই গোত্রের লোকেরা পরামর্শ ও সমাধান নিত। গণক ও জ্যোতিষীর মতো বিশেষভাবে তাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। অন্যদিকে ছিল অভিজ্ঞতানির্ভর চিকিৎসাপদ্ধতি। এটা অনেকটা গৌণ ছিল। এই পদ্ধতিতে বস্তুগত উপাদানের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা প্রদান করা হতো। এই চিকিৎসার কিছু ধরন হলো, হিজামা (Cupping therapy), কাই (Moxibustion), অঙ্গব্যবচ্ছেদ (Amputation), রক্তপাত (Bloodletting), খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, বিভিন্ন ভেষজ ওষুধ ইত্যাদি।[৪৩]

ইসলাম এসে এই দুই ধারার মধ্যেই সংস্কার সাধন করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সুগঠিত করেছে, পরিমার্জিত ও উন্নত করেছে। নিষিদ্ধ করেছে গণনা, জাদু-টোনা এবং তন্ত্রমন্ত্র পাঠ। এসব থেকে মানুষকে সতর্ক করেছে। এসবে নিয়োজিত লোকদের কাফের হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। চিকিৎসায় নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছে ইসলাম। পক্ষান্তরে ওষুধ ও প্রতিষেধক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে; বরং এ ক্ষেত্রে মানুষকে উৎসাহিত করেছে। অভিজ্ঞতা ও গবেষণানির্ভর চিকিৎসাচর্চার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এর মাধ্যমে ইসলাম চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এটাই আমরা দেখতে চেষ্টা করব এই তিনটি অনুচ্ছেদে—

- চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা
- চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও মুসলিম সমাজ
- চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় ইসলামের অনবদ্য পদ্ধতি

---

৪৩. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৪৭-৪৮

প্রথম অনুচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলামি সভ্যতার একটি মূলনীতি হলো মানবদেহ ও আত্মার পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণ করা। শরীরের যত্ন নেওয়া এবং শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখার বিষয়টি ইসলাম মানুষের সুখশান্তির জন্য আবশ্যক হিসাবে গণ্য করেছে।

মানুষকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো জাগতিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া নবী-রাসুলগণের দায়িত্ব না। জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করাও তাদের দায়িত্ব না। বরং বিষয়টি মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-গবেষণার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা ও সচেতনতার জন্য উৎসাহমূলক অনেক কথাই বলেছেন। যেন মুসলিমগণ এই শাস্ত্রের পূর্ববর্তী গবেষক ও অভিজ্ঞজন থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, জাগতিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগতিক বিদ্যাসমূহকে আল্লাহপ্রদত্ত মানবিক ও নৈতিক দিকনির্দেশনার অন্তর্গত করে দিয়েছেন। যেন এসব জ্ঞানবিজ্ঞান মানবতার কাজে আসে, মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

তোমরা নিজেদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।[৪৪]

চিকিৎসা ও পরীক্ষানিরীক্ষানির্ভর গবেষণামূলক চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চায় সর্বোৎকৃষ্ট হাদিস সম্ভবত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

৪৪. *সহিহ মুসলিম*, ১৪১

«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

প্রত্যেক রোগেরই ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে মহান ও মহামহিম আল্লাহর হুকুমে রোগ নিরাময় হয়।[৪৫]

উসামা ইবনে শারিক রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ»

তোমরা রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা রাখেননি। তবে বার্ধক্য এমন একটি রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই।[৪৬]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ»

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের জন্যই প্রতিষেধক তৈরি করেছেন। যার সৌভাগ্য হয় সে জানতে পারে। যার সৌভাগ্য হয় না সে জানতে পারে না।[৪৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসার আদেশের পাশাপাশি চিকিৎসায় দক্ষ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন। যায়দ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তির শরীর জখম হয়ে গিয়েছিল। রক্ত জমে গিয়েছিল সেই জখমে। লোকটি আনমার গোত্রের দুজন ব্যক্তিকে তার চিকিৎসার জন্য ডাকলেন। তারা এসে রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখল। তাদের লক্ষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

৪৫. *সহিহ মুসলিম*, ৬৯

৪৬. *সুনানু আবি দাউদ*, ৩৮৫৫; *সুনানুত তিরমিজি*, ২০৩৮; *সহিহু সুনানি ইবনি মাজাহ*, ৩৪৩৬; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৮৪৭৭; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬০৬১

৪৭. *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৬০৬২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৪২৬৭; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৭৪২৭

সাল্লাম বললেন, তোমাদের দুজনের মাঝে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোনো উপকার আছে কি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الأَدْوَاءَ»

> যে মহান সত্তা রোগের অস্তিত্ব দিয়েছেন, তিনিই সকল রোগের জন্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা রেখেছেন।[৪৮] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা।

অভিজ্ঞ চিকিৎসককে ইসলাম অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেছে। যারা চিকিৎসায় অনভিজ্ঞ হয়েও মানুষকে চিকিৎসার নামে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়, তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি এসেছে। অদক্ষ চিকিৎসক রোগীর কোনো ক্ষতি করে ফেললে, সেটার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। পক্ষান্তরে দক্ষ চিকিৎসককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُوَ ضَامِنٌ»

> চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া যে ব্যক্তি চিকিৎসা প্রদান করবে, ক্ষতির দায় তাকেই নিতে হবে।[৪৯]

খন্দক যুদ্ধে সাদ ইবনে মুআজ রা.[৫০]-এর গায়ে একটা তির বিদ্ধ হয়। তখন তার চিকিৎসার জন্য আল্লাহর রাসুল সম্মানিত নারী সাহাবি রুফাইদা রা.[৫১]-

---

৪৮. *আল-মুয়াত্তা*, ১৬৮৯; *আল-মুজামুল কাবির লিত তবারানি*, ৭৩৯৫; *আল-মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবা*, ২৩৪২০

৪৯. *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৫৮৬; *সুনানুন নাসায়ি*, ৪৮৩০; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৩৪৬৬; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৭৪৮৪

৫০. **সাদ ইবনে মুআজ ইবনে আবদিল আশহাল রা.** : প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। খন্দক যুদ্ধে তিনি তিরের আঘাত পান। এরপর মাসখানেক জীবিত ছিলেন। তিরের জখম থেকে অনবরত রক্তক্ষরণে তার ইন্তেকাল হয়। *আল-ইসাবা*, ৩২০০; *উসদুল গাবা*, ২/২৩৯

৫১. **রুফাইদা আল-আসলামিয়া** : প্রথম মহিলা মুসলিম সেবিকা হিসাবে স্বীকৃত একজন ইসলামি চিকিৎসক এবং সমাজকর্মী। রুফাইদা আহতদের সেবায় মসজিদে একটি তাঁবু করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে সাদ ইবনে মুআজ বনু মখজুম গোত্রের আবু উসামা জাশমি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি

কে নিয়োজিত করেন।[৫২] কারণ তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় বেশ দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন। তখনকার পরিবেশে পুরুষের চিকিৎসায় নারী নিয়োজিত হওয়ার প্রথা ছিল না। কিন্তু রুফাইদা রা.-এর চিকিৎসাগত জ্ঞান ও দক্ষতার কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ মহান মর্যাদা দিয়েছিলেন।

আরবের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক সাকিফ গোত্রের হারেস ইবনে কালাদার[৫৩] কাছে চিকিৎসার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে পাঠিয়েছিলেন। অথচ তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবুও পেশাগত দক্ষতার কারণে তার কাছে একজন মুসলিমের চিকিৎসার অনুমতি নবীজি দিয়েছিলেন।[৫৪]

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধু, খেজুর ও বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের কথা বলে গিয়েছেন। সেগুলোকে আমরা 'তিব্বে নববি' নামে আখ্যায়িত করে থাকি।

❀❀❀

বর্শা দ্বারা আহত হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে দ্রুত রুফাইদার তাঁবুতে নিয়ে যাও। খাইবার যুদ্ধে আহত মুসলিম মুজাহিদদের সুস্থ করতে তিনি মাতৃত্বের মমতাময়ী হাত বাড়িয়ে দেন। তার এই অবিস্মরণীয় ত্যাগ এবং সেবা-শুশ্রূষার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষ মুজাহিদদের সাথে তাকেও গনিমতের সম্পদের অংশ দেন। *উসদুল গাবা*, ৬/১১৪; *আল-ইসাবা*, ১১১৬৯

৫২. *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক*, ২/১০০; *উয়ুনুল আসার*, ২/১০৩; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া লি ইবনি হিশাম*, ৪/১৯৮

৫৩. **হারিস ইবনে কালাদা** : তায়েফের অধিবাসী। সাকাফি বংশের। তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ কবি। জাহেলি যুগে জন্মগ্রহণ করেন। নবীজি ও খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামল পেয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেন মুআবিয়া রা.-এর সময়ে।

৫৪. *সুনানু আবি দাউদ*, ৩৮৭৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও মুসলিম সমাজ

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, নববি চিকিৎসাপদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও বরকত রেখেছেন। এরপরও তারা নববি চিকিৎসাপদ্ধতির সীমানায় থেমে থাকেননি। তারা প্রথম থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, চিকিৎসা-সহ অন্যান্য বস্তুগত জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শিতার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা। একইসাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞান-গবেষণা সম্পর্কে জানাও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। এটি ইসলামের নির্দেশনারই বাস্তবায়ন। কারণ ইসলাম সবসময় মানবতার জন্য কল্যাণকর সবকিছুর সমৃদ্ধি কামনা করে। জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা পছন্দ করে। ইসলাম বলে, জ্ঞান হলো মুমিনের হারানো সম্পদ; যেখানেই পাবে মুমিন তা উঠিয়ে নেবে।

এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিমগণ বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে থাকেন। অন্যদিকে ইসলামি জগতে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচার-প্রসারের জন্য খলিফাগণ রোমান চিকিৎসকদের আমন্ত্রণ জানান। মুসলিম চিকিৎসকগণ তাদের বইপত্রের অনুবাদে হাত দেন। উমাইয়া শাসনামলে চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাবলির অনুবাদের ধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

উমাইয়া খেলাফত ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। রোম-পারস্য রাজনৈতিকভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। ফলে তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের উত্তরাধিকার গ্রহণ করে মুসলিমগণ। এভাবেই মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা হয়। অনূদিত হতে থাকে গ্রিস, পারস্য, রোম, ভারত ও পূর্ববর্তী সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞান। তাদের সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডার আরবি ভাষায় চলে আসে। এই অনুবাদ আন্দোলন ছিল সভ্যতাগত দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সামনে খুলে যায় এক বদ্ধ জানালা। আরব ও মুসলিম আলেমগণ প্রথমবারের মতো বাইরের জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারেন।

মুসলিমরা যেসব অনুবাদ করেছেন, সেসবের মধ্যে পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান (Experimental science) অগ্রাধিকার পেয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান। এর আগে মুসলিমদের চিকিৎসাপদ্ধতি আবর্তিত হয়েছে নববি চিকিৎসা, হিজামা (Cupping therapy), কাই (Moxibustion), অঙ্গব্যবচ্ছেদ (Amputation), রক্তপাত (Bloodletting), খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, ভেষজ ওষুধ ইত্যাদির মাধ্যমে। পরবর্তীকালে মুসলিমগণ আলেকজান্দ্রিয়া ও জুনদিশাপুর[৫৫] মেডিক্যাল কলেজের মাধ্যমে গ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে থাকেন। পাশাপাশি আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন তাদের গ্রন্থাবলি।[৫৬]

এই ধারায়ই আরবের বিখ্যাত ইহুদি চিকিৎসক মাসারজাওয়াই (Masarjawaih) খলিফা মারওয়ান ইবনুল হাকামের (মৃত্যু ৬৪/৬৫ হি.) নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ান পুরোহিত আহরুনের লেখা চিকিৎসা বিশ্বকোষ *কুন্নাশ* গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করেন।[৫৭]

আব্বাসি খেলাফতের শুরুর দিকে মুসলিমদের নিজস্ব চিকিৎসাধারা গড়ে ওঠে। তারা কেবল অনূদিত গ্রন্থ থেকে আহরিত জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকেন না। শাস্ত্র হিসাবে পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, যদি আরব সভ্যতায় মুসলিমগণ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞানবিজ্ঞান অনুবাদের উদ্যোগ না নিতেন, তাহলে সেগুলো মানুষের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যেত। হারিয়ে যেত অজ্ঞাত অন্ধকারে। মুসলিম খলিফাগণ উদ্যোগ নিয়ে সেগুলো বের করে এনেছেন গুহা, সিন্দুক আর গির্জার তালাবদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে।[৫৮]

আব্বাসি যুগে মুসলিমগণ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিটি শাখায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। পর্যালোচনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অন্যান্য জাতির চিকিৎসাগত ত্রুটি বের করে সংশোধন করে দেন। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন, গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের বিশ্বাস ছিল, মানবদেহের রক্ত

---

৫৫. **জুনদিশাপুর** : সাসানিদ সাম্রাজ্যের অন্যতম একটি বৌদ্ধিক কেন্দ্র। এখানে ছিল একটি মেডিক্যাল হাসপাতাল, পাঠাগার এবং উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র। দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের খুজেস্তান প্রদেশে এটি অবস্থিত। বর্তমানে সেখানে ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই।

৫৬. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮

৫৭. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/১৬৩; *তারিখুল হুকামা লি কিফতি*, পৃ. ৮০

৫৮. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৭৫

সংবহনতন্ত্র হৃৎপিণ্ডের দুই নিলয়ের অন্তর্বর্তী সেপটাম মাংসপেশির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য ছিদ্রপথে রক্তের এক ক্ষুদ্র অংশ ডান নিলয় (Right Ventricle) থেকে বাম নিলয়ে (Left Ventricle) প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে ইবনে নাফিস এসে তার এই ভুল শুধরে দেন।[৫৯] তিনি পালমোনারি সার্কুলেশনের ধারণা আবিষ্কার করেন। মানবদেহের ভেতর রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিত তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। এর আগে রক্ত চলাচল সম্পর্কে কারও সঠিক ধারণা ছিল না। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত শিরাপথে হৃৎপিণ্ডে আসে এবং হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়, এটা প্রথম তিনিই বলেছিলেন।

এভাবেই মুসলিমদের মাঝে চিকিৎসাগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্থাপিত হয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল। মুসলিমদের মাঝে জন্ম নেয় চিকিৎসার বড় বড় নক্ষত্র, যাদের জুড়ি মেলা ভার। দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে তাদের নাম। সামনে এ নিয়ে আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

মুসলিমদের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, ইসলামি সভ্যতার কল্যাণে চিকিৎসাশাস্ত্র নতুন দিকে মোড় নেয়। পূর্ববর্তীদের থেকে ব্যতিক্রম ও বাস্তবধর্মী পথ চলা আরম্ভ করে। ইসলাম একদিকে যেমন জ্যোতিষবিদ্যা এবং তন্ত্রমন্ত্রের মতো অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে, অপরদিকে পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতানির্ভর চিকিৎসাবিদ্যা চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশে উদ্‌বুদ্ধ করে।

❋❋❋

৫৯. সেপটাম মাংসপেশি ভেদ করে শিরা থেকে ধমনিতে রক্তপ্রবাহের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ সেপটাম হৃৎপিণ্ডস্থ দুই নিলয়ের মধ্যে এক কঠিন ও অভেদ্য প্রাচীর বিশেষ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় ইসলামের অনবদ্য পদ্ধতি

চিকিৎসাবিদ্যায় ইসলামি সভ্যতার যে সাফল্য আমরা লক্ষ করি, তা কাকতালীয়ভাবে চলে আসেনি। গবেষণার সুউচ্চ শিখরে পৌঁছতে তাদের অবলম্বন করতে হয়েছে সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত পদ্ধতি, যা চিকিৎসাশাস্ত্রে এনে দিয়েছে অসামান্য সাফল্য। এ মহান সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। মৌলিক তিনটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : অন্যের প্রতি উদারতা

ইসলামি সভ্যতা বস্তুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য সভ্যতা ও জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি সর্বদাই উদার। মুসলিমরা যেমন অন্যান্য সভ্যতা থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করেছেন, তেমনইভাবে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের জ্ঞানবিজ্ঞান বিতরণও করেছেন।

মুসলিম আলেম ও জ্ঞানীগণ বস্তুগত জ্ঞানবিজ্ঞানকে সমগ্র মানবতার মৌরসি সম্পদ মনে করতেন। জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই বিজ্ঞানের অঙ্গনে সমান। চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই ধারার বাইরে ছিল না। বলা যায়, মুসলিমদের নিকট চিকিৎসাবিজ্ঞান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞান। তারা এ বিজ্ঞানকে সংকলন করেছেন, বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং অভূতপূর্ব অনেক বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। কারণ বস্তুগত বিদ্যার মধ্যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হলো চিকিৎসা। তাই অনেক মুসলিম পণ্ডিত চিকিৎসাবিদ্যাকে ধর্মীয় বিদ্যার পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা চিকিৎসার কল্যাণে মানুষ সুস্থ থাকে। আর সুস্থ থাকলেই মানুষ দৈনন্দিন জাগতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।

এজন্যই আমরা দেখি, মুসলিমজাতি জাগতিক বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে প্রথম অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন। পূর্ববর্তী বিভিন্ন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের গ্রন্থাবলি অনুবাদ করেন। প্রথম প্রয়াস ছিল খালেদ ইবনে ইয়াজিদ উমাবি (৮৫ হি.)-এর হাতে। তার আগ্রহের বিষয় ছিল চিকিৎসা ও রসায়ন। সেই আগ্রহ থেকে তিনি গ্রিক গ্রন্থাবলি অনুবাদ করতে শুরু করেন,

বিশেষত যে গ্রন্থগুলো মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল।[৬০]

আব্বাসি খেলাফতকালে জাগতিক বিদ্যার গ্রন্থাবলির অনুবাদকর্ম লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পায়; বিশেষত খলিফা হারুনুর রশিদ ও তার পুত্র মামুনুর রশিদের আমলে। বিভিন্ন সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর মুসলিম চিকিৎসকগণ উন্মুখ হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দৃশ্যমান হয়নি। অনূদিত হতে থাকে গ্রিক, ফারসি, হিন্দি, রোমান ও সুরিয়ানি ভাষার গ্রন্থাবলি। এগুলোর মধ্য দিয়ে মুসলিমরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অভিজ্ঞতা জানতে পারেন। বিশেষত প্রাচীন গ্রিসের অমূল্য অভিজ্ঞতাসমূহ।[৬১]

মুসলিমরা অন্যদের জ্ঞানবিজ্ঞান উদারভাবে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়—

এক. মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বদা চূড়ান্ত আমানতদারি এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছেন। যার থেকে শিখেছেন, তাকেই তার কৃতিত্ব দিয়েছেন। অন্যান্য সভ্যতা থেকে যেসব বিষয় গ্রহণ করেছেন, সেগুলো কখনো জালিয়াতি করে নিজেদের নামে চালিয়ে দেননি। এজন্যই মুসলিম চিকিৎসকদের গ্রন্থাবলি পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের নাম ও উদ্ধৃতিতে ভরপুর। মুসলিমরা সর্বদাই তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছেন।

ইসলামি সভ্যতার বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসক আবু বকর রাযির *আল-হাবি ফিত-তিব* (চিকিৎসার ইতিহাসে বিশালতম এক গ্রন্থ) গ্রন্থে একটু নজর দেওয়া যাক। তিনি সেখানে বলেন, ...আমি এই গ্রন্থে হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, আরমাসুস প্রমুখ প্রাচীন চিকিৎসাবিদদের গ্রন্থাবলি থেকে বিভিন্ন বাক্য ও উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি। এ ছাড়া তাদের পরে যারা এসেছেন, যেমন অ্যাজিনার পল, আহরুন, হুনাইন ইবনে ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ প্রমুখের থেকেও গ্রহণ করেছি।[৬২]

এই মর্যাদাকর জ্ঞানগত বিশ্বস্ততা ছিল কার্যতপক্ষেই মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী তাদের পূর্বপুরুষদের লিখিত

---

৬০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯/৬০
৬১. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি মুস্তফা সিবাই*, পৃ. ১২২
৬২. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৭০

জ্ঞানভান্ডার সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমরা সেসব অনুসন্ধান করে জনসম্মুখে নিয়ে এসেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে ইচ্ছা করলে খুব সহজেই মুসলিমরা সেসব জ্ঞানবিজ্ঞান নিজেদের নামে চালিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সুউচ্চ আদর্শ ও উদার মানসিকতা তাদের এ থেকে বিরত রেখেছে।

দুই. মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ অনুবাদের সীমায় এসে থেমে যাননি। তারা যা গ্রহণ ও সঞ্চয় করেছেন, তা ধীরে ধীরে পূর্ণতা ও উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছেন। সেখান থেকে তারা নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছেন এবং সংকলন করেছেন। পূর্ববর্তীদের গবেষণাগুলো পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেছেন। সেখান থেকে নতুন সমাধান বের করেছেন। ফলে জ্ঞান সঞ্চয়ে তাদের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা জ্ঞানবিজ্ঞানে সৃজনশীলতার ছোঁয়া দিয়েছেন। পূর্ববর্তীদের মতবাদের সমালোচনায় তারা দ্বিধান্বিত হননি। এসব নিয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম চিকিৎসকগণ প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন জ্ঞানী, দার্শনিক ও গভীর চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। যার ফলে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী তারা বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তিন. মুসলিম চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যাকে নিজেদের মাঝে কুক্ষিগত করে রাখেননি। এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির সময়ও তারা এমন শঠতার আশ্রয় নেননি। বরং জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন অন্যান্য ধর্ম ও জাতির লোকদের জন্যও। যেন তারাও চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতিতে অংশ নিতে পারে।

ইসলামি সভ্যতায় এজন্যই আমরা মুসলিমদের পাশাপাশি বেশ কিছু ইহুদি ও খ্রিষ্টান নামের দেখা পাই। যেমন কিসতা ইবনে লুকা বালাবাক্কি, আবু নসর মাসিহি, হিবাতুল্লাহ ইবনে জামে ইসরাইলি প্রমুখ। ইসলামি সভ্যতায় এমন কিছু খ্রিষ্টান-পরিবার ছিল, যারা বংশানুক্রমে চিকিৎসার চর্চা ও পেশার সাথে যুক্ত ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতিও ছিল। যেমন বখতেশু পরিবার, যারা প্রায় তিন শতাব্দী চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিল। আব্বাসি-খেলাফতের খলিফাদের নিকটও তাদের ভালো কদর ছিল। তাদের বংশের

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিসাবে স্মরণ করা হয় জিবরাইল ইবনে বখতেশুর নাম। তিনি জাফর বারমাকির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন।[৬৩]

এ ক্ষেত্রে মুসলিম নেতাদের উদারতার মাত্রা ও পরকে আপন করে নেওয়ার যোগ্যতা অনুধাবন করতে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির একটি উদাহরণই যথেষ্ট। তিনি যখন মিশরে প্রবেশ করেন, তখন তার সাথে প্রায় ১৮জনের মতো চিকিৎসক ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আটজন মুসলিম, পাঁচজন ইহুদি, চারজন খ্রিষ্টান এবং একজন সামেরি!

এভাবেই ইসলামি সভ্যতা উপকার ও কল্যাণের আধার দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ঢেলে সাজিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যাবলি ও শাখাপ্রশাখার সীমানা সম্প্রসারিত করেছে। মুসলিমজাতি-সহ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করেছে। মানবসভ্যতাকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। মসৃণ করেছে পূর্ববর্তীদের মাঝে স্থবির হয়ে থাকা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা।

বস্তুগত বিদ্যার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমাদেরও এভাবে নিয়োজিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা

চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিমদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অভিজ্ঞতা ও বাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর নির্ভরতা। অর্থাৎ চিকিৎসাকে বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে তারা নিছক তাত্ত্বিক দিক থেকে চর্চা করতেন না। বরং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব প্রয়োগবিধানের মাধ্যমে পঠিত বিষয়গুলো যাচাই করতেন। এদিক থেকে তারা গ্রিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। কারণ গ্রিক ধারায় সাধারণত ব্যবহারিকের তুলনায় তাত্ত্বিক দিককেই প্রাধান্য দেওয়া হতো বেশি। বেশিরভাগ সময়ই তাত্ত্বিক গবেষণা বাস্তবে রূপ পেত না, এমনকি তা বিশুদ্ধ হলেও!

মুসলিমরা চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতির ওপর জোর দিতেন। যেকোনো রোগের চিকিৎসায় তারা বিভিন্নভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। প্রাচীন বিভিন্ন পদ্ধতির মাঝে তুলনা করে তারা পার্থক্য লক্ষ করতেন এবং অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

---

৬৩. জাফর বারমাকি হারুনুর রশিদের যুগের একজন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব। *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/১৪-১৫

রোগী ও রোগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিবরণ লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন মুসলিম চিকিৎসকগণ। কখনো কখনো একই রোগের ধরন বিভিন্নরকম হয়। রোগের নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দেয়। এগুলো নিয়ে গবেষণা ও এগুলোর যথাসাধ্য প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। এভাবেই মুসলিমরা তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পেরেছেন। ফলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা মানবজাতি উপকৃত হয়েছে।

বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবনে সিনা রহ. বলেছেন, ...রোগীদের আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। ফলে পরীক্ষালব্ধ চিকিৎসাপদ্ধতি আমার সামনে এমনভাবে উন্মোচিত হয়েছে যা বর্ণনাতীত।[৬৪]

আবু বকর রাযি রহ. এই বিষয়ে আরও মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা যদি কখনো প্রচলিত তত্ত্বের বিপরীত হয়, তাহলে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এমনকি পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদদের মান বাঁচানোর জন্য যদি সবাই মিলে প্রচলিত তত্ত্বকে বৈধতা দিতে চায়, তবুও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করতে হবে।[৬৫]

এখানে তিনি সিদ্ধান্তমূলক কথা বলে দিলেন যে, মানুষ সাধারণত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত থাকে। গবেষকরা তাদের তত্ত্বের কাছে এসে থমকে যায়। কিন্তু কখনো কখনো বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের তত্ত্বের বিপরীত প্রমাণিত হয়। তখন মানুষের উচিত সেই তত্ত্বকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা, যদিও সেসব তত্ত্ব মহান ব্যক্তিদের হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষায় নির্ভরতা, যেকোনো মতবাদকে নিছক মতবাদ হিসাবে ধর্তব্য করা এবং বাস্তবতার পথ অবলম্বন করার দরুনই মুসলিমগণ অস্ত্রোপচারের জন্য পারসিক আর গ্রিক চিকিৎসকদের আদিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেননি। বরং নতুন নতুন যন্ত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন ও ব্যবহার করেছেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেগুলোর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করেছেন ও উন্নত করে তুলেছেন। এমনকি তারা হাড়ভাঙা, দন্ত, প্রসূতি ও শল্যচিকিৎসার জন্য নতুন ও অভিনব যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের নকশা প্রস্তাব করে

৬৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৭৩
৬৫. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৭৭-৭৮

গেছেন। সময়ের বিবেচনায় সেগুলো আমরা দেখে অবাক না হয়ে পারি না। বিশেষত তখন ছিল এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রাথমিক যুগ। আর সে সময় সারা বিশ্বে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদান রাখার মতো তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

এ প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক শল্যচিকিৎসার জনক আবুল কাসেম জাহরাবির উদ্ভাবনের কথা স্মরণ করতে পারি। শল্যচিকিৎসায় তার উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সারা বিশ্বকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছে। *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ* নামক অনবদ্য গ্রন্থে তিনি এসব যন্ত্রপাতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তার উদ্ভাবিত অভিনব যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিক শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত উন্নত উপকরণের মূল বীজ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নীতিমালার প্রতি গুরুত্বারোপ

এই তৃতীয় অনন্য বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর চিকিৎসাচর্চার পদ্ধতি থেকে মুসলিমদের চিকিৎসাচর্চায় স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। জাগতিক জ্ঞান আবিষ্কার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর কেউ শরিয়তের নীতিমালা অবলম্বন করে না। কোনো কার্যক্রমের সিদ্ধতা কিংবা অসিদ্ধতায় তাদের কোনো ঐশী ভিত্তিও নেই। কিন্তু মুসলিমদের চিকিৎসাপদ্ধতির ভিত্তি হলো কুরআন-সুন্নাহ, যা পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠী থেকে তাদের চিকিৎসাপদ্ধতিকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে।

আমাদের কথার অর্থ এই নয় যে, কুরআন-হাদিস যেহেতু রোগ নিরাময়ের জন্য বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছে, তাই কুরআন-হাদিসের দলিল ছাড়া কোনো রোগের চিকিৎসা করা যাবে না। বরং এর অর্থ হলো, চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইসলাম একটি সীমা ও আদর্শিক ভিত্তি দাঁড় করে দিয়েছে, যেন তা মুসলিম চিকিৎসকবৃন্দ-সহ সকল বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের জন্য পথের দিশারি হতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। জীবনের সকল অঙ্গনে কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করবে। এই বিবেচনায় আমরা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী অনুধাবন করতে পারি।

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ﴾

কিতাবে আমি কোনো কিছুই বাদ দিইনি। [সুরা আনআম : ৩৮]

তাই মুসলিম চিকিৎসকগণ শরিয়তের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। যেমন আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»

> নিশ্চয় আল্লাহ রোগ ও প্রতিষেধক অবতীর্ণ করেছেন। প্রত্যেক রোগের জন্যই তিনি দিয়েছেন প্রতিষেধক। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, কিন্তু হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।[৬৬]

এজন্যই মুসলিমগণ কখনো মদ, নাপাক বস্তু কিংবা ঘৃণিত কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন না। এই হাদিস মুসলিমদের সামনে অনিষ্টের বহু দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মানুষের জন্য কী উপকারী আর কী অপকারী, সে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় শরিয়ত অনুসরণের আরেকটি উদাহরণ হলো, সে যুগে যদিও মন্ত্রতন্ত্রের ছড়াছড়ি ছিল, তবুও চিকিৎসার ক্ষেত্রে মুসলিম চিকিৎসকগণ সেগুলোর আশ্রয় নেননি। বরং তারা রোগের চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। এভাবেই তারা বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একইভাবে মুসলিমগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আগুনে গরম করা লোহা দিয়ে দাগ লাগানোর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«وَأَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ...»

> তিনটি জিনিসে রোগমুক্তি রয়েছে। শিঙা লাগানোয়, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করছি।[৬৭]

এভাবেই মুসলিম চিকিৎসকগণ আগুন দিয়ে দাগ দেওয়ার প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির সমাপ্তি ঘটান। এখন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ

---

৬৬. *সুনানু আবি দাউদ*, ৩৮৭৪; *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, ১৯৪৬৫
৬৭. *সহিহ বুখারি*, ৫৩৫৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৩৪৯১; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২২০৮

করেছে যে, আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া মৌলিকভাবে কোনো প্রতিষেধক না, বরং তা সাময়িক স্বস্তি মাত্র।

মুসলিমদের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা কখনোই জাদুবিদ্যার আশ্রয় নেননি, যদিও তারা জাদুকে নিয়মকানুনসংবলিত একটি শাস্ত্র বলে মনে করতেন। কারণ শরিয়ত এ ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। শরিয়ত জাদুবিদ্যাকে কবিরা গুনাহ এবং ধ্বংসাত্মক কাজ হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকো...।' এখানে তিনি বিশেষভাবে জাদু থেকে নিষেধ করেছেন।[৬৮]

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার প্রতি গুরুত্বারোপের কারণে মুসলিম চিকিৎসকগণ চিকিৎসার উন্নত বহু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যেগুলোর উপযোগিতা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। বরং মুসলিমদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাগ্রসরতায় তারা বিস্ময়াভিভূত। যেমন মধু, কালোজিরা, হিজামা ও অন্যান্য চিকিৎসাপদ্ধতি যা হাদিস গ্রন্থসমূহে বহুল পরিমাণে আলোচিত হয়েছে।

এসব মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশে নেতৃত্ব দিয়েছে। এসবের মাধ্যমেই মুসলিমদের চিকিৎসাপদ্ধতি অন্যান্য চিকিৎসা থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে এবং এই মহান শাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত গড়ার সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়া সমগ্র মানবজাতিকে কয়েক শতাব্দী নেতৃত্বদানের জন্য আমাদের কিংবদন্তি মনীষীদের পথচলা সহজ হয়েছে।

---

৬৮. *সহিহ বুখারি*, ২৬১৫; *সহিহ মুসলিম*, ৮৯; *সুনানু আবি দাউদ*, ২৮৭৪; *সুনানুন নাসায়ি*, ৬৩৭১; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৫৫৬১

(160)

الفصل الثامن عشر في لقط السبل من العين ،

السبل عروق حمر تنسج في العين فتمنع للنظر فعله وتضعف العين مع طول الايام فينبغي لك اولاً ان تنظر فان كانت العين التي فيها السبل قوية ولم يكن فيها عرض اخر غير السبل فيح (فحينئذ) فالقط سبلها وهو ان تامر العليل ان تضع راسه في حجرك ثم علق تلك العروق بصنارة واحدة او اثنين علي حسب حذقك ويكون الصنارة لطيفة الاثنية علي هذة الصورة



او يكون صنارتين مزدوجتين في جسم واحد في هذه الصورة



ثم تلقط بمقص لطيف تلك العروق بلطف وتمسح بالدم حيناً بعد حين حتي ترى العين قد ذهبت منها تلك العروق وانحلبت الدم وتحفظ من العين لا تؤذيها باطراف المقص وليكن عملك نصف النهار بازاء الشمس وتثبت في عملك جداً لئلا تقطع غير تلك العروق فعند فراغك فتقطر في العين الشياف الاخضر او الاحمر لتاكل بحدته ما بقي من السبل فان لم يمكنك لقطه كله في تلك الساعة فضمد العين بما سكن المها واتركها اياماً حتي تسكن المها وتامن الورم الحار ثم اعد العمل علي هذة الصفة بعينها حتي يبرئ وهذه صورة المقص



চিত্র নং-১

আবুল কাসেম জাহরাবির শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান

মুসলিমগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানে গ্রিকদের অনূদিত জ্ঞানবিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে যান। তারা চিকিৎসাশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখেন। শারীরবৃত্তি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজির গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তাদের আবিষ্কৃত অনেক ওষুধ এখনো ব্যবহার করা হয়। মুসলিম চিকিৎসকগণ অ্যানেসথেসিয়াতেও অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং অস্ত্রোপচার কার্যক্রম পরিচালনায় তারা অগ্রগামী ছিলেন। সাফল্য তাদের পদচুম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে ইউরোপের গির্জা থেকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাচর্চা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল—যেমনটা বলেছেন ওয়েলস—ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র গির্জার লোকদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে আরবে চিকিৎসার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে অনেক মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষার যোগ্যতা থাকলে যে-কেউ চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে পারত, কোনো ধরনের শর্ত ছাড়াই। মুসলিমগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে যেসব বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন সেগুলো সকলের জন্য ছিল উন্মুক্ত।[৬৯]

চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলিমদের আবিষ্কার ও অবদানের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমরা দুটি বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

এক. আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইসলাম আগমনের পূর্বে চিকিৎসাক্ষেত্রে আরবদের কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না। ইতিপূর্বে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি। ইসলাম এসে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন করেছে। ব্যাপকভাবে পুরো আরবের পট পরিবর্তন করে দিয়েছে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে নতুন চেতনার বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষত জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে। তারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে স্বতন্ত্র রূপ দান করেছিলেন, যাকে আমরা চিকিৎসার শাখাপ্রশাখাকে বিশেষায়িতকরণ বলতে পারি। যেমন সার্জারি, শিশুচিকিৎসা, চক্ষুচিকিৎসা, অ্যানাটমি,

---

৬৯. *মাজমুআতু আবহাসিন আনিত তিব ওয়া উলুমিহি লি আহমাদ শাওকাত শাতি*, পৃ. ৩১-৩২; *দাওরুল হাযারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ৯৮-৯৯

মনোরোগবিদ্যা ইত্যাদি। আরও রয়েছে ওষুধ আবিষ্কারে ও চিকিৎসাপদ্ধতির বিকাশে স্বতন্ত্র কিছু শাখাপ্রশাখা।

দুই. এটা কোনো যৌক্তিক কথা নয় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের আবিষ্কার ও অবদানকে আমরা শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী আধুনিক যুগের নিক্তিতে পরিমাপ করব। বরং এ ক্ষেত্রে সুবিচার হবে তাদের যুগ ও তাদের যুগের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর অবস্থানের সাথে তাদের অবদানকে মিলিয়ে দেখা। একইসাথে সে যুগে মানুষের সক্ষমতার আলোকে তাদেরকে বিচার করা। তাহলেই তাদের প্রতি আমরা ইনসাফ করতে পারব। সে যুগের জ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমকে সামনে রেখে তারা কতটুকু উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছিলেন, এটাই দেখতে হবে আমাদের। এখানে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ে মুসলিমদের অবদান নিয়ে কথা বলব—

- সার্জারি
- মেডিক্যাল অ্যানাটমি
- চক্ষুচিকিৎসা
- শিশুরোগবিদ্যা
- ধাত্রী এবং স্ত্রীরোগবিদ্যা
- মনোরোগ বিজ্ঞান
- রোগ ও প্রতিষেধক[৭০]

---

৭০. আল-উলুম ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন, আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা, ইলেকট্রনিক ডিজিটাল সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.

প্রথম অনুচ্ছেদ

সার্জারি

ইসলামি সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে সার্জারি ছিল অনেকটা নিম্নমানের পেশা। একজন চিকিৎসকের সার্জারি করা উচিত বলে তারা মনে করত না। সার্জারিকে তারা 'হস্তশিল্প' বলে অবহিত করত। দীর্ঘ একটা সময় সার্জারি ছিল নরসুন্দর ও রক্তমোক্ষকদের কর্ম। এ কাজ তারা সম্পাদন করত সাধারণ কিছু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে। যেমন আগুনে দাগ দেওয়া, রক্তমোক্ষণ ও সামান্য কাটাছেঁড়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে তারা কিছু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনার আলোকে কাজ করতেন, যারা শল্যচিকিৎসার তথ্য আহরণ করেছিলেন হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, অ্যাজিনার পল প্রমুখ পূর্ববর্তীদের লেখাজোখা থেকে। তখন সার্জারি স্বতন্ত্র কোনো বিদ্যা হিসাবে বিবেচিত হতো না। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মুসলিমদের মাঝে সার্জারি বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ ধারা অগ্রসর হয় সৃজনশীলতা ও নতুনত্বের দিকে।[৭১]

প্রথম আবু বকর রাযি সার্জারিকে চিকিৎসার অন্যান্য শাখা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত করেন। তিনিই প্রথম সার্জারির ভিত্তি স্থাপন করেন অ্যানাটমির ওপর। প্রাণিবিজ্ঞান, প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন, বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা মুসলিম শল্যচিকিৎসকদের জন্য ছিল আবশ্যক। পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার জন্য তারা জীবিত ও মৃত প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করতেন। এমনকি তারা বানর কেটে পরীক্ষা করতেন, যেমনটা করেছেন ইবনে মাসাওয়াইহ।

সার্জারিতে মুসলিমদের যুগান্তকারী অবদান

মহিলাদের যোনিপথ দিয়ে মূত্রাশয়ের পাথর বের করার প্রথম কৃতিত্ব মুসলিমদের। তারাই প্রথম রক্তক্ষরণ ও হিমোফিলিয়া সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিবরণ

---

৭১. *তারিখুত তিব ওয়াস সাইদালাহ ইনদাল আরব*, পৃ. ৯৭; *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ১০৫; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০২

দিয়েছেন। হিমোফিলিয়াকে তারা জেনেটিক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এটাকে জেনেটিক বলার কারণ হলো তারা গবেষণা করে দেখেছেন দেহভেদে রক্তক্ষরণের মাত্রায় তারতম্য হয়। রক্তক্ষরণের মাত্রা বেশি এমন একটি পরিবারে তারা পরীক্ষা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই রোগ সারাতে তারা সক্ষম হয়েছেন। অস্ত্রোপচারের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধেও তারা সফল হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারা হৃৎপিণ্ডের বামদিক থেকে রক্তবহনকারী প্রধান ধমনি এয়োর্টাকে বেঁধে দিতেন।

শরীরের প্রায় প্রতিটি স্থানেই তারা অস্ত্রোপচার করে অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। দাঁতের শল্যচিকিৎসা, দন্তবিন্যাস এবং চোখের সার্জারি সম্পর্কেও গবেষণামূলক লেখালেখি করেছেন। চোখ থেকে গ্লুকোমা[৭২] রোগের বিষাক্ত পানি অপসারণের ক্ষেত্রেও তারা উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তাদের জন্য এটা বেশ সহজ ছিল। ফলাফলও ছিল ইতিবাচক। এই পানি অপসারণের ছয়ের অধিক পদ্ধতির কথা তারা লিখে গিয়েছেন। তন্মধ্যে সাকশন (suction) পদ্ধতিও ছিল। শ্বাসনালিতেও তারা সার্জারি করেছিলেন। আবুল কাসেম জাহরাবি (মৃ. ৪২৭ হি./১০৩৫ খ্রি.) প্রথম শ্বাসনালিতে সার্জারি করে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। তার এক খাদেমের শ্বাসনালিতে প্রথম সার্জারি করেন।[৭৩] আবু বকর রাযি রহ. এ প্রসঙ্গে বলেছেন, শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার জন্য ফুসফুসের সাথে সংযুক্ত নালির প্রতিবন্ধক ঝিল্লিটা কেটে ফেলতে হবে। কষ্ট থেকে রোগীর মুক্তি ও শ্বাস গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাওয়ার পর সম্ভব হলে তা সেলাই করে দিতে হবে। তাহলে সে শ্বাস নিতে পারবে এবং পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। আর এ ক্ষেত্রে সার্জারির পদ্ধতি হলো, একজন রোগীর মাথা পেছনে নিয়ে গলার চামড়া টান টান করে রাখবে। সার্জন চিকিৎসক শ্বাসনালির নিচেরদিকে কাটবে। সাময়িকভাবে ওপরে ও নিচে সুতা দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেবে, যেন শ্বাসনালি প্রকাশ পায়...। শ্বাসনালি থেকে টিউমার অপারেশনের পর রোগী স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে

৭২. গ্লুকোমা (Glaucoma) হলো চোখের একপ্রকার রোগ, যাতে অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও চোখ অন্ধ হয়ে যায়। সারা বিশ্বে প্রায় ৬৭ মিলিয়ন মানুষ গ্লুকোমায় আক্রান্ত। এ রোগ সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের বেশি হয়। আর ক্লোজড অ্যাংগেল গ্লুকোমা মহিলাদের বেশি হয়। সারা বিশ্বে ছানির পরে গ্লুকোমা অন্ধত্বের দ্বিতীয় কারণ।

৭৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৫

সক্ষম হলে চামড়া সেলাই করে দিতে হবে। তারপর ব্যান্ডেজ করে দেবে।[৭৪]

বর্তমানে প্লাস্টিক সার্জারি বলতে আমরা যা বুঝি, মুসলিম চিকিৎসকগণই হয়তো প্রথম সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঠোঁট, নাক এবং কানে যখন অতিরিক্ত চর্বি জমে ওঠে বা কেটে যায়, সে ক্ষেত্রেও সার্জারির বর্ণনা তারা দিয়েছেন। সার্জারির মাধ্যমে এগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে এবং অতিরিক্ত চর্বি বা মাংসের কুৎসিত দৃশ্য দূর হয়ে যায়।[৭৫]

আধুনিক কালে অপারেশন যেমন চিকিৎসার সর্বশেষ সমাধান, তেমনইভাবে আরব চিকিৎসকগণও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তারা অপারেশন করতে আগ্রহী হতেন না। অপারেশন ছিল সর্বশেষ মন্দ উপায়, যা কেবল বাধ্য হলেই অবলম্বন করতে হয়। এজন্যই আবু বকর রাযি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-হাবি*-তে লিখেছেন, যখন দেখবে, অস্ত্রোপচারে পারঙ্গমতা থাকার পরও কোনো চিকিৎসক একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শুধু ওষুধ ব্যবহার করে ফোড়া, এম্পাইমা, টনসিল, আলজিহ্বায় প্রদাহ, প্লেগ ইত্যাদির মতো মারাত্মক রোগগুলোর চিকিৎসা করতে পারে, তাকে তোমার প্রশংসা করতেই হবে।[৭৬] এখান থেকেই প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, সর্বশেষ প্রতিষেধক হলো আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া।[৭৭]

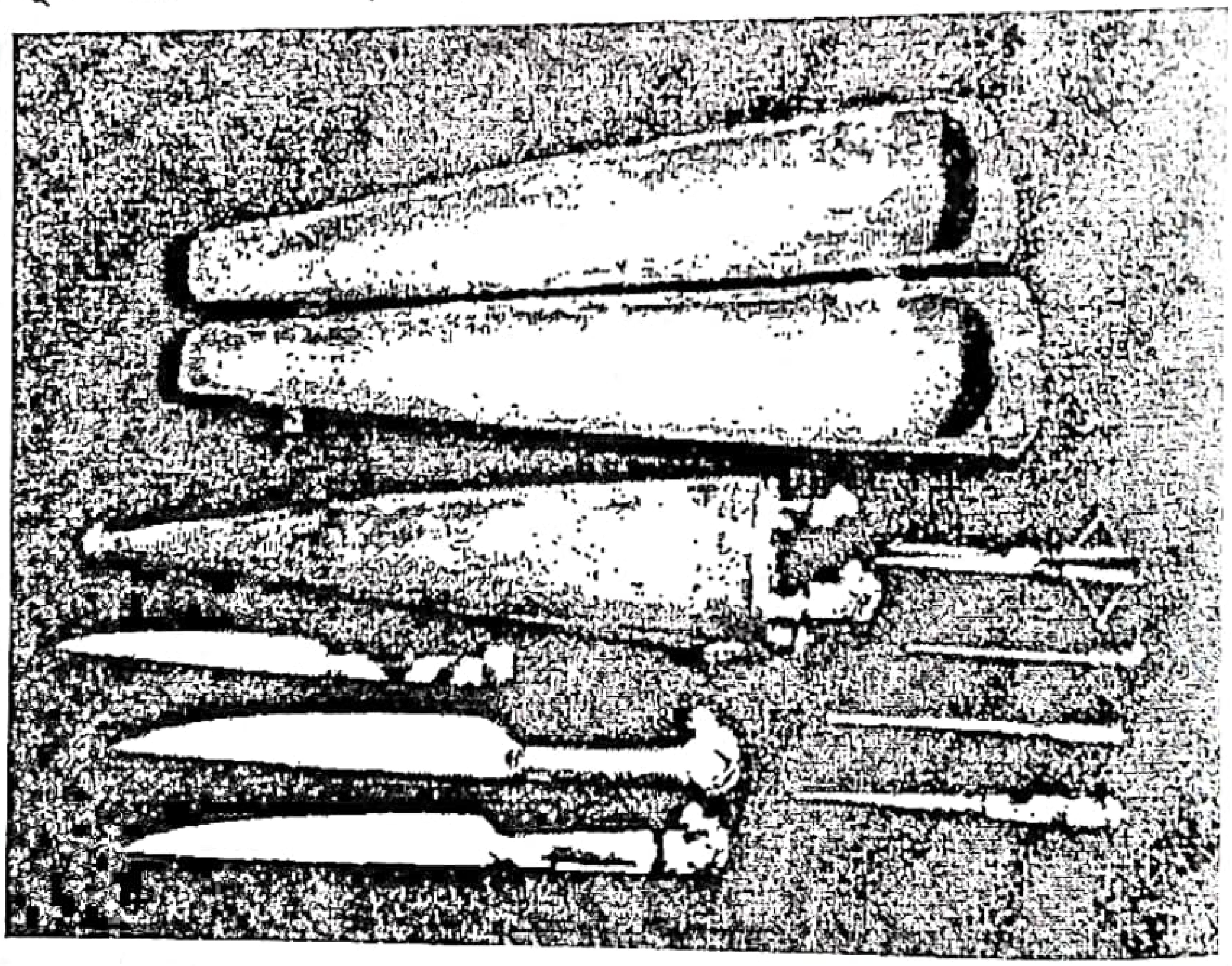
উদর, মূত্রনালি, গর্ভাশয়, নাক, কান, শ্বাসনালি এবং ভাঙা হাড়ের চিকিৎসায় মুসলিমগণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অস্ত্রোপচার শেষে তারা ভেতরের অংশ সেলাই করে দিতেন, ফলে বাইরে সেলাইয়ের কোনো চিহ্ন দৃশ্যমান হতো না। সেলাইয়ের ক্ষেত্রে তারা দুটি সুঁই এবং একটি সুতা ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন পশুপাখির উদরের ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে একধরনের সুতা তৈরি করেছিলেন। সেগুলো মানুষের ভেতরের অন্ত্র ও ক্ষতস্থানে সেলাইকাজে ব্যবহৃত হতো। কারণ কোনো ইনফেকশন ও ব্যথা ছাড়াই এগুলো মানুষের দেহের সাথে মিশে যেতে পারে। জার্মান লেখিকা সিগ্রিড হুংকে[৭৮] *শামসুল*

---

৭৪. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৩/ ২২৫
৭৫. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৬/ ২১৮
৭৬. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৭/৪২৫
৭৭. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৭/ ৪২৫
৭৮. **সিগরিড হুংকে (১৯১৩-১৯৯৯ খ্রি.)** : জার্মান প্রাচ্যবিদ। হামবুর্গ শহরে জন্ম। পড়াশোনা করেছেন ধর্মতত্ত্বের মূলনীতিবিষয়ক বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও

আরব তাসতুউ আলাল গারব গ্রন্থে লেখেন, রাযি তার ছাত্রদের অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সেলাই করা শিখিয়েছেন। ত্বকের ওপর সেলাইয়ের কোনো ছাপ দৃশ্যমান হতো না। তিনি আরও শিখিয়েছেন পেটে অষ্টভুজ সেলাই। দুটি সুঁইয়ে একটি সুতা ব্যবহার করে কুশিকাটা সেলাইয়ের পদ্ধতি তিনিই শিখিয়েছেন।[৭৯]

জখম স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন মুসলিমগণ। পাশাপাশি তারা অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামে এনেছিলেন অগ্রগতি। অ্যানেসথেসিয়া ও কার্ডিয়োপলমোনারি রেজারেকশনের ক্ষেত্রেও মুসলিম শল্যচিকিৎসকদের বড় অবদান রয়েছে। তারা অবলম্বন করেছিলেন পূর্ববর্তীদের চেয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন পদ্ধতি।[৮০]

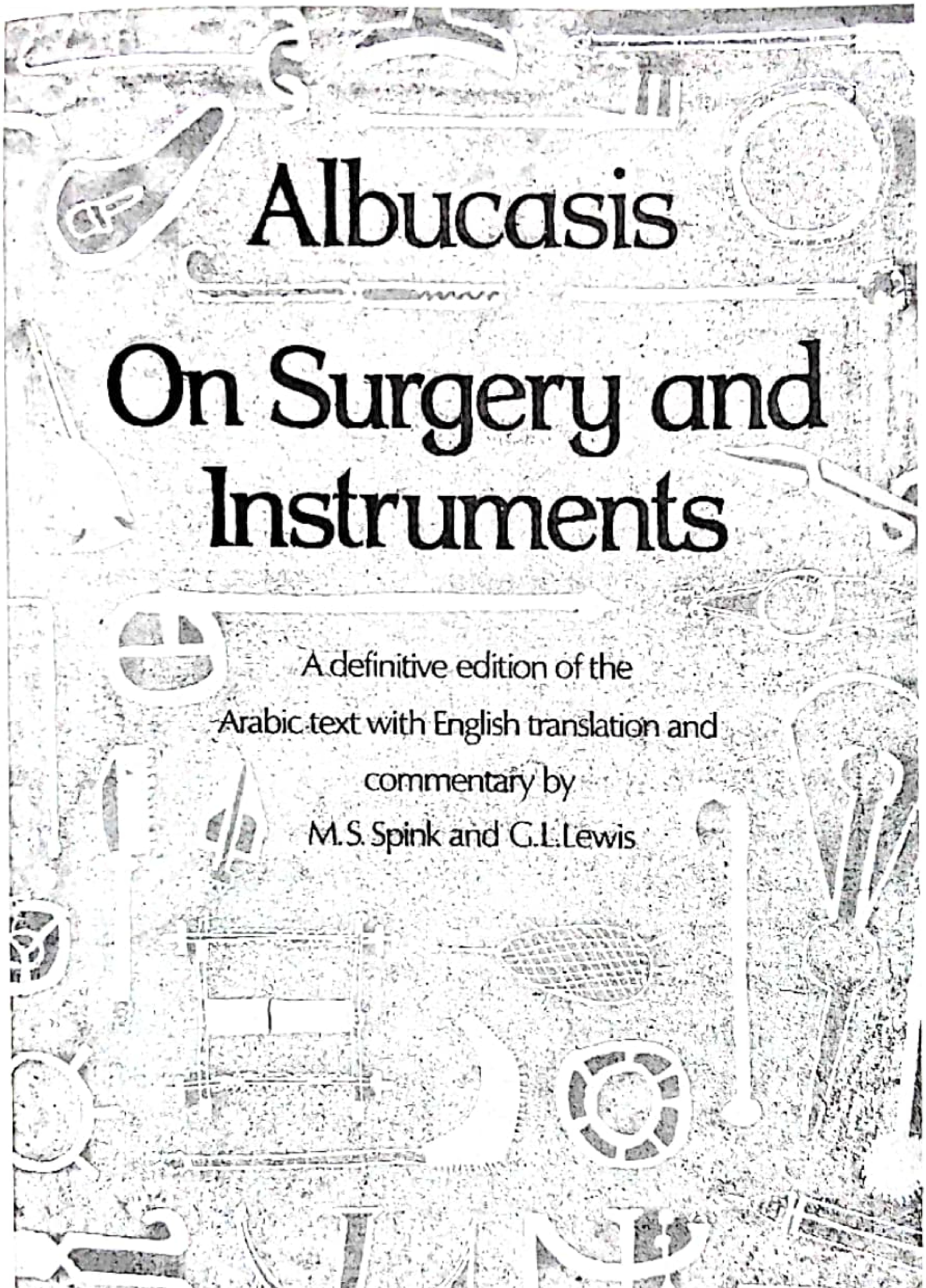


চিত্র নং-২
অস্ত্রোপচারের প্রাচীন উপকরণ

সাংবাদিকতা নিয়ে। ১৯৪১ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। বহু আরব দেশ ভ্রমণ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *শামসুল আরব তাসতুউ আলাল গারব* ও *আল্লাহু লাইসা কাযালিকা*।

৭৯. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ২৭৮

৮০. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা* (ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সংস্করণ)



চিত্র নং-৩

আবুল কাসেম জাহরাবির *আত-তাসরিফ* গ্রন্থের চিত্র

সার্জারির যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও আধুনিকায়ন

মুসলিম সার্জন চিকিৎসকগণ পূর্ববর্তীদের থেকে যেসব যন্ত্রপাতি পেয়েছেন সেসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং তারা নতুন নতুন অনেক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। পাশাপাশি আধুনিকায়ন করেছেন পূর্ববর্তীদের থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতিগুলোকে। তাদের যুগে চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কথা বইপুস্তকে উল্লেখ করে গিয়েছেন। এসব পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাহরাবির *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ*, ইবনুল কুফ আবুল ফারাজ ইবনে ইয়াকুবের (৬৮৫ হি./১২৮৬ খ্রি.) *উমদাতুল ইসলাহ ফি সিনাআতিল জিরাহ*, আবুল হাসান ইবনে বাতলানের *দাওয়াতুল আতিব্বা* প্রভৃতি। আমর ইবনুল আস রা. (২১ হি./৬৪১ খ্রি.)-এর হাতে বিজিত তৎকালীন রাজধানী ফুসতাতে বর্তমানে ব্যাপক খননকার্য চালানো হয়, তাতে বেরিয়ে আসে পূর্ববর্তীদের ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন সরঞ্জাম।

মুসলিমরা যেসব যন্ত্র ব্যবহার করতেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো দাস্ত। এটি অনেকটা ব্যাগের মতো, যার মধ্যে সংরক্ষিত থাকত বেশ কিছু স্ক্যালপেল[৮১]। প্রতিটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্ক্যালপেল ব্যবহার করা হতো। কর্মভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্নতা দেখা দিত সেগুলোর আকার-আকৃতিতেও। একটি স্ক্যালপেল ছিল দেহের চামড়া ব্যবচ্ছেদ করার জন্য। এর দুদিক ধারালো থাকত। সাধারণত এর ব্যবহার হতো ধমনির ওপরের কোনো স্থানে চামড়া কাটার ক্ষেত্রে; যেন সার্জন তা সেলাই করে দিতে পারে। আরেকটি স্ক্যালপেল ছিল এক পাশে ধারালো; আরবিতে এর নাম আল-মিবদাউল মাতুফ। টনসিল অপসারণে এটি ব্যবহৃত হতো। টনসিল অপসারণে আরও কিছু যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। এর মধ্যে অন্যতম হলো কাঁচির (Scissors) মতো একটি যন্ত্র। দুইটি ধাতব ফলা একত্রে জুড়ে তৈরি হতো এই ধারালো অস্ত্র। এ ছাড়া ছিল কাঁটাযুক্ত স্ক্যালপেল। এই স্ক্যালপেলগুলো দুই ধরনের ছিল। একধরনের স্ক্যালপেল ব্যবহার করা হতো প্যারেনটেসিসের সময় উদর থেকে সরু নল দিয়ে পানি বের করার জন্য। আরেক ধরনের স্ক্যালপেল ব্যবহার করা হতো মলদ্বারের ফিস্টুলা অপারেশন করার জন্য। টনসিল ও এর ভেতরের পুঁজ এবং নষ্ট পানি বের করার জন্যও

৮১. **স্ক্যালপেল** : একটি ছোট এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারালো যন্ত্র, যা শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্তীয় ব্যবচ্ছেদ, পোডিয়াট্রি এবং বিভিন্ন শিল্প ও কারুশিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহৃত হতো একধরনের স্ক্যালপেল; এর একদিকে ছিল গোলাকার ধারালো ব্লেড। এ ছাড়া অশ্রুনালিতে উদ্‌গত অতিরিক্ত মাংস কাটার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম একধরনের স্ক্যালপেল ব্যবহার করা হতো। কানের ভেতর শক্ত কিছু ঢুকে গেলে তা বের করার জন্য এবং পশ্চাদ্‌দেশ ও পেরিনিয়ামে অস্ত্রোপচার করে পাথরজাতীয় জিনিস বের করার জন্য ছিল আলাদা আলাদা স্ক্যালপেল। ব্লাডলেটিংয়ের[৮২] জন্যও ছিল আলাদা স্ক্যালপেল, যা দেখতে মেদিগাছের (Myrtus communis) পাতার মতো। এগুলো ব্যবহৃত হতো শিরা নিষ্কাশন করতে। অতিরিক্ত মাংস বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকের কারণে কারও যদি কান বন্ধ হয়ে যেত, সে ক্ষেত্রে দুধারি ছুরির মতো স্ক্যালপেল ব্যবহার করা হতো।[৮৩]

এসব স্ক্যালপেল ছাড়াও তখন সার্জারির জন্য ব্যবহার করা হতো লোহার হুকের মতো বিভিন্ন সরঞ্জাম। এগুলোও ছিল বিভিন্ন ধরনের। এক মাথার হুক যেমন ছিল, তেমনইভাবে ছিল দুই-তিন ও ততধিক মাথার হুক। চামড়া কাটার জন্য তিন মাথার হুকের সাথে স্ক্যালপেলযুক্ত একধরনের যন্ত্র ছিল। আংশিক ভেঙে পড়া দাঁতের বাকিটুকু বের করার জন্য একধরনের হুকের প্রচলন ছিল, যার মাথা ত্রিকোণ ও পুরু। অবশ্য মাড়িদাঁতের রুট বা শিকড় মূলোৎপাটনের জন্য ব্যবহৃত হতো অন্য একধরনের যন্ত্র; যার নাম 'আতালা'। এটি দেখতে বর্তমানের ক্রোবার (crowbar) ও সিঁধকাঠির মতো। তবে এটি বিভিন্ন আকার-আকৃতির ছিল, একেক কাজের জন্য ব্যবহার করা হতো একেকরকম আতালা। কিন্তু বিশেষভাবে শুধু দাঁত ও দন্তমূল উপড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হতো 'কালালিব' নামক একপ্রকার যন্ত্র। এটিও বিভিন্ন ধরনের ছিল। কিছু ছিল পাখির ধারালো চঞ্চুর মতো, যেগুলো মাড়ির উৎসমূল থেকে ভাঙা দাঁত টেনে আনতে পারত। আরেকটি ব্যবহার করা হতো গলার ভেতরের বাড়ন্ত মাংস বের করার কাজে। এটি দেখতে বক্র খসখসে রেতির মতো, কোথাও স্পর্শ করলেই সেটা টান দিয়ে বের করে নিয়ে আসত। গলার ভেতরে আটকে থাকা হাড্ডি ও কাঁটা বের করার জন্য আরেক ধরনের যন্ত্র ছিল। এমনইভাবে মুখের ভেতরের তালু ও আলজিভে আগুনের দাগ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো চামচের মতো একধরনের যন্ত্র।

---

৮২. **ব্লাডলেটিং :** অসুস্থতা ও রোগ নিরাময়ের জন্য রক্ত প্রত্যাহারের মাধ্যমে একধরনের চিকিৎসা।

৮৩. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ১৪৮-১৫১

চিকিৎসার জন্য যেসব নল ব্যবহৃত হতো, সেগুলো তৈরি হতো হয়তো পাখির পালক থেকে নয়তো লোহা-তামা-রুপা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ থেকে। কখন কোন ধরনের নল ব্যবহৃত হবে, তা নির্ধারিত হতো কর্মগত উপযোগিতার ওপর নির্ভর করে। মুখ বা গলায় বর্ধিত মাংস সার্জারির ক্ষেত্রে একধরনের নলের ব্যবহার দেখা যায়। এটি তৈরি হতো হাঁস ও বাজ পাখির পালক থেকে। এই নলের প্রয়োগপদ্ধতি হলো, বর্ধিত মাংসের ওপর নলটি রাখার পর সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হতো। এরপর নল ধরে আস্তে আস্তে টান দিলে সমূলে উপড়ে আসত। কানের ময়লা, পোকামাকড় এবং উকুন বের করার ক্ষেত্রেও তখনকার যুগে স্পেকুলার প্রচলন দেখা যায়। সেটার শুরুর প্রান্ত ছিল সরু, কিন্তু শেষ প্রান্ত খানিকটা চওড়া। চওড়া দিকটা কানের ভেতর ঢোকানো হতো। সরু প্রান্ত মুখে দিয়ে টান দিলে ভেতরের ময়লাগুলো সব নলের ভেতরে চলে আসত; কিন্তু সরু মাথার কারণে মুখের ভেতর যেত না। কানের পোকা বের করার জন্য রুপা অথবা তামার নলও ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সেগুলোর পদ্ধতি ছিল ভিন্নরকম; সেগুলো কানে ঢোকানোর পূর্বে গরম তেল দিয়ে মালিশ করা হতো । তাদের চিকিৎসাকার্যে দুই ধরনের জিফত[৮৪] ব্যবহৃত হতো। একটা গলা থেকে ভাঙা হাড্ডি বের করতে, আরেকটি কান থেকে সূক্ষ্ম কিছু বের করতে। কানের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মিজরাফাহ বা কুরেট। এটা বেলচার আকৃতির একটি ছোট যন্ত্র। কানের ময়লা বের করার জন্য এটা কাজে লাগানো হতো। তখনও মূত্রথলির সমস্যার কারণে কারও প্রস্রাব আটকে গেলে ক্যাথেটার লাগানোর প্রচলন ছিল। এর দৈর্ঘ্য ছিল দেড় মিটারের মতো। পাখির পালকের আকারে রুপার নল দিয়ে এটি বানানো হতো।

তাদের সময়ে, ধাত্রীরা বাচ্চা প্রসবের সময় ইংরেজি 'T' বর্ণের মতো দেখতে 'লাওলাব' নামক একধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত। জরায়ুর মুখ খোলার জন্য সহায়ক ছিল এই যন্ত্র। আবলুস কাঠ থেকে তৈরি হতো এটি। লাওলাবের এক প্রান্তে দুই আঙুলের সমান কাঠি থাকত। আর মূল যন্ত্রটি হতো প্রায় দেড় বিঘত। এটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় যোনিতে পরিচালনা করলে জরায়ুর মুখ খুলতে থাকত। শিশুকে সহজে বের করার জন্য আরও কিছু সরঞ্জাম ব্যবহৃত হতো।

---

৮৪. **জিফত :** এটি দেখতে চিমটার মতো, কিন্তু ধারহীন, দুমাথাবিশিষ্ট। কোনো কিছু অপসারণ বা ধরার জন্য এটির ব্যবহার বেশি। বর্তমানে সাধারণত টিস্যু নেওয়া বা জন্মের সময় শিশুর মাথা কাছে আনতে এর ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন 'মিশদাখ' (Cranioclasis)। এটি প্রসবের সময় শিশুর মাথা অতি সহজে জরায়ু থেকে বের করে আনার যন্ত্র। গর্ভপাতের পরবর্তী দিনগুলোয় হঠাৎ করে যদি নারীর নেফাস (রক্তস্রাব) বন্ধ হয়ে যেত, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো 'মিবখারা' নামক যন্ত্র। তামার তৈরি নলসদৃশ এই যন্ত্রটির এক প্রান্ত রাখা হতো আগুন বা জ্বলন্ত অঙ্গারের ধোঁয়ার ওপর, অপর প্রান্ত রাখা হতো যোনির কাছে। এভাবে তাপ দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হতো। আরও ছিল 'মিদফাউল জানিন'। এটা একধরনের ফরসেপস। এটা দিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে বাচ্চা টেনে বের করা হতো।

এ ছাড়াও তারা আরও অনেক ধরনের ফরসেপস ও স্ক্র্যাপার (scrapers) ব্যবহার করত। দাঁত ও মাড়ির ময়লা এবং কালো ও হলদে জমে যাওয়া পাথর বের করার জন্য এসব ব্যবহৃত হতো। এগুলো বিভিন্ন ধরনের ছিল। কিছু ছিল শুধু মাড়ির ভেতরের আর কিছু ছিল শুধু মাড়ির বাইরের ময়লা বের করার জন্য। কিছু আবার দাঁত ও মাড়ির মধ্যে পরিষ্কারের জন্য। কিছু স্ক্র্যাপার দিয়ে হাড্ডির ওপর থেকে চামড়া সরানো হতো। সেটা সাধারণত ধারালো ছিল। সব স্ক্র্যাপার ছিল লৌহনির্মিত।

মুসলিমগণ হিজামাকে সার্জারির অংশ হিসাবেই গণ্য করতেন। হিজামার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র তিন ধরনের ছিল; বড়, ছোট ও মাঝারি। এসব যন্ত্র সাধারণত রুপা বা চীনামাটি থেকে তৈরি হতো। দেখতে অনেকটা গোলাকার নলের মতো। দূষিত রক্তের ক্ষরণের জন্য এটি ব্যবহৃত হতো। চিকিৎসকের কাছে হিজামা করার সব ধরনের যন্ত্রই থাকত। হিজামার একেক যন্ত্রের ব্যবহারপদ্ধতি একেক ধরনের ছিল। 'মিহজামায়ে নারি' নামক হিজামা যন্ত্র তৈরি হতো হলুদ তামা থেকে। এর ঠিক মধ্যখানে ছিল সুঁই পরিমাণ ছিদ্র। হিজামার সময় চিকিৎসক সেই ছিদ্রটা আঙুল দিয়ে বন্ধ করে রাখতেন। হিজামা শেষ হলে আঙুল সরিয়ে নিতেন। তখন সেটি খুলে যেত। 'মিহজামায়ে মায়ি' নামক আরেক ধরনের যন্ত্র ছিল, যার মধ্যে কোনো ছিদ্র ছিল না। এর মধ্যে পানি ভরে সরাসরি রোগীর দেহে স্থাপন করা হতো।

মুসলিমগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিরিঞ্জও ব্যবহার করতেন। ছোট-বড় দুই ধরনের সিরিঞ্জ ছিল তখন। ছোট সিরিঞ্জ ব্যবহৃত হতো শিশুদের ক্ষেত্রে; তৈরি হতো রুপা, তামা ও চীনামাটি থেকে। আর সবচেয়ে বড় সিরিঞ্জ ছিল ব্যাগের আকারের; ভেতরে ভরে দেওয়া হতো প্রয়োজনীয় মেডিসিন। নিচের প্রান্তে চিকন, পাতলা ও ধারালো নল ছিল, যা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ

করানো হতো। মূত্রথলির জন্য একধরনের সিরিঞ্জ ছিল, যা তৈরি হতো রুপা থেকে। সিরিঞ্জের ভেতরে উত্তপ্ত তরল পদার্থ ভরে এর সরু ডগা মূত্রনালিতে প্রবেশ করানো হতো। চিকিৎসক সিরিঞ্জ পুশ করলে ধীরে ধীরে সেই পদার্থ মূত্রনালিতে চলে যেত।

মূত্রাশয়ের শল্যচিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত আরেকটি যন্ত্র ছিল 'মিযরাকা'। এর মাধ্যমে মূত্রাশয়ের গহ্বরের জল নিষ্কাশন করা হতো। এতে ছিল তিনটি ছিদ্র; দুটি এক পাশে, আরেকটি অন্য পাশে। 'মিশআব' নামে ত্রিকোণ শক্ত লোহার তৈরি একটি যন্ত্র ছিল। এর মধ্যে একটা কাঠের হ্যান্ডেল ছিল। লিঙ্গ ও মূত্রনালির পাথর ভাঙার কাজে এর ব্যবহার ছিল।

মুসলিম শল্যচিকিৎসকগণ টিউমার ও ফিস্টুলা কাটতে সূক্ষ্ম যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এর মধ্যে ছিল 'বারিদ'। এটা সাদা ও হলুদ সিসা থেকে তৈরি। ক্ষত পরীক্ষার শলাকার (probe) মতো দেখতে। এর আকার ছিল বিভিন্ন ধরনের। টিউমার, ফিস্টুলার আকার অনুসারে একেকটি ব্যবহৃত হতো। তাদের ব্যবহৃত সরঞ্জামের মধ্যে আরও ছিল 'মাদাস'। এটি দেখতে গোলাকার। এটিও টিউমারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। ছোট, বড়, মাঝারি তিন ধরনের মাদাস ছিল। টিউমারের নরম স্থানে এটি প্রবেশ করিয়ে আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরানো হতো। এরপর মাদাস বের করে নিয়ে এসে নির্গত তরল পদার্থ পরীক্ষানিরীক্ষা করা হতো।

টিউমারের শল্যচিকিৎসায় আরও ব্যবহৃত হতো 'মিশরাত'। এর মাধ্যমে টিউমার কাটা হতো। এটি ছিল তিন ধরনের; বড়, মাঝারি ও ছোট। এটি প্রশস্ত, দুই প্রান্তবিশিষ্ট; এক প্রান্ত ধারালো।

তাদের কাছে 'মিকবাস' নামে রুপা ও তামা দিয়ে বানানো একটি যন্ত্র ছিল। সমতল এই যন্ত্রের মাধ্যমে জিহ্বা নিচদিকে চাপ দিয়ে রাখা হতো যেন শল্যচিকিৎসক রোগীর গলার ভেতরের অংশ অতি সহজেই দেখতে পান এবং টিউমার বের করতে পারেন।

ফিস্টুলার শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে ছিল ছিদ্রযুক্ত 'মিসবার'। এই ছিদ্রে তারা পাঁচ প্যাঁচযুক্ত একটা সুতা লাগিয়ে বেঁধে দিতেন ফিস্টুলার গোড়ায়। দু-তিনদিন এভাবে রেখে দিলে ফিস্টুলা নিজে নিজেই পড়ে যেত।

টিউমারের শল্যচিকিৎসায় আরও ব্যবহৃত হতো 'কাভিয়া'[৮৫]। এটা দেখতে বাঁকানো ছুরির মতো। এর মাধ্যমে পা, উরু, পায়ের পাতায় সৃষ্ট টিউমারে আগুনের সেক দেওয়া হতো।

তেমনইভাবে ছিল পেরেকের মতো একধরনের 'কাভিয়া'। মলদ্বার ও জরায়ুর গুটির চিকিৎসায় আগুনের তাপ দিতে এর ব্যবহার ছিল। পাইপের মতো এক ধরনের 'কাভিয়া' ছিল তখন, যা মাড়িদাঁতের ব্যথায় আগুনের তাপ দিতে ব্যবহৃত হতো। এটি বিভিন্ন আকারের ছিল।

আরও বিভিন্ন ধরনের 'কাভিয়া' ছিল তখন। কিছু দ্বারা দেহের কেটে যাওয়া জায়গায় তাপ দেওয়া হতো। পেট, যকৃৎ, ধমনি কেটে তাপ দেওয়ার কাভিয়া। এ ছাড়া পক্ষাঘাত, মাথাব্যথা, সায়্যাটিকা, পাশাপাশি মাইগ্রেন, কিডনি রোগ, মূত্রাশয় এবং পিঠে ব্যথার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'কাভিয়া' ব্যবহৃত হতো।[৮৬]

চোখ, নাক, কান ও গলার অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে মুসলিম চিকিৎসকগণ বেশ কিছু যন্ত্র ব্যবহার করতেন। এর মধ্যে একটা ছিল 'বারিদ'। চোখের গভীরে না গিয়েও কর্নিয়ার পাতলা আবরণ অস্ত্রোপচারে এটি ব্যবহৃত হতো। এর পরে তারা ব্যবহার করতেন 'মিকদাহ'। চোখে অস্ত্রোপচার চলাকালে চোখের পাতা তুলে ধরতে ব্যবহৃত হতো বাঁশের তৈরি কাঠি 'কসবাহ'।

চোখে মাংস বেড়ে গেলে, চোখের পাতা উঁচিয়ে ধরার জন্য দুটি কাঠি ব্যবহৃত হতো। আঁটসাঁট করে রাখলে শুকিয়ে সাধারণত নিজে থেকেই পড়ে যেত সেই মাংস। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঝরে না পড়লে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হতো।

'কসবাহ'-এর মতো আরেকটি যন্ত্র ছিল 'মাখালিবুত তাশমির', যা দেখতে বাঁকানো হুক-সদৃশ। এটি চোখের পাতা তুলে ধরতে ব্যবহৃত হতো। স্ক্যালপেলের মতো এক ধরনের যন্ত্র ছিল 'মাকাদিহ' নামে। চোখ থেকে পানি পড়া বন্ধ করতে এর ব্যবহার ছিল।

চোখের অপারেশনে তারা কাঁচির মতো বিভিন্ন আকারের যন্ত্র ব্যবহার করতেন। ছোট আকারের কাঁচি দিয়ে চোখের পাপড়ির অতিরিক্ত চামড়া

৮৫. **কাভিয়া :** এটি এমন একধরনের যন্ত্র, যার মাধ্যমে দেহে আগুনের তাপ দেওয়া হয়।
৮৬. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা* (ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সংস্করণ)

কাটা হতো। অপারেশনের পর সংক্রমণ থেকে চোখের সুরক্ষার জন্য ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে আরেক ধরনের কাঁচির ব্যবহার ছিল।

চোখের ভ্রুতে অতিরিক্ত পশম গজালে বিশ্রী দেখা যায়। এটাও একধরনের রোগ। অতিরিক্ত পশম দূর করতে ব্যবহৃত হতো প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের 'কাভিয়া'। চোখের অশ্রুনালিতে গজানো গুটি কাটতে ব্যবহার করা হতো আরেক ধরনের 'কাভিয়া'।

চোখের পাতা ও ভ্রু ঝুলে গেলে চিকিৎসায় ব্যবহার করা হতো অর্ধবৃত্তাকার 'কাভিয়া'। এগুলো ছাড়াও অস্ত্রোপচারের জন্য তারা অন্য আরও অনেক যন্ত্রে ব্যবহার করতেন। যেমন প্রশস্ত ব্লেডের কাঁচি, গলা পরিষ্কার করার কাঁচি 'মিকরাদ', আঁচিল (Verrucae) তোলার 'মিনকাশ', অবাঞ্ছিত পশম অপসারণ করতে 'মিলকাত', নাকের অতিরিক্ত মাংস কাটতে 'মিখরাত', নাকে তরল ওষুধ দেওয়ার জন্য 'মিসআত'। এটা তৈরি হতো সাধারণত রুপা অথবা তামা দিয়ে। এটি ধরার জন্য হাতলও রয়েছে।

নাকের পলিপ দূর করতে মুসলিম চিকিৎসকগণ ব্যবহার করতেন 'মিনকাব'। মিনকাব হলো কাঠের হাতলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার একটি যন্ত্র। এর এক প্রান্ত ধারালো।

হাড়ের অপারেশনে তারা ব্যবহার করতেন 'বিরাম' নামক যন্ত্র। এটি একটি ছোট লৌহদণ্ড। দৈর্ঘ্যে আট আঙুল আর প্রস্থে সাধারণত ক্ষত ও হাড়ের আকার অনুযায়ী হতো। চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসা ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার কাজে 'বিরাম' যন্ত্রটি ব্যবহৃত হতো।

তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে একটার নাম ছিল 'খাশাবাতুর রাস'। এর মাধ্যমে তারা নষ্ট হাড্ডিকে দেহের অভ্যন্তর থেকে টেনে বের করে আনতেন। এর মাথা ছিল বৃত্তাকার। শক্ত লোহা দিয়ে এটি তৈরি হতো। এটি নষ্ট হাড্ডিতে স্থাপন করে কৌশলে ঘোরানো হতো। একপর্যায়ে নষ্ট হাড্ডিটি বেরিয়ে আসত।

তেমনইভাবে তারা হাড্ডির ভেতর ফুটো তৈরির প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন একধরনের ড্রিল মেশিন। এটি খুবই সূক্ষ্মভাবে কাজ সম্পাদন করত, হাড়ের একপাশে ফুটো তৈরি করলে অন্যপ্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। এই ড্রিল মেশিনগুলো বড়, ছোট ও মাঝারি, সব রকমই ছিল।

অস্ত্রোপচারের পর হাড়ের রুক্ষত্ব সমান করতে তারা যে যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন, সেটির নাম ছিল 'আল-মিকতাউল আদাসি'।[৮৭]

অ্যানেসথেসিয়া ও রেজারেকশন

সার্জারি তথা শল্যচিকিৎসায় মুসলিমদের অভূতপূর্ব সংযোজন কেবল কিছু নতুন ওষুধ আবিষ্কার ও অস্ত্রোপচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের থেকে দেহ অবশ করার যে পদ্ধতি পৌঁছেছে, তাতেও তারা উন্নতি সাধন করেছেন। অ্যানেসথেসিয়া ও রেজারেকশনে তারা নতুন পথ ও পন্থা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

ঘুমের ওষুধ বা চেতনানাশক আবিষ্কারের কৃতিত্ব যে মুসলিমদের, এর ঢের প্রমাণ রয়েছে। মুসলিমগণই প্রথম ইনহেলেশনের মাধ্যমে অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো চেতনানাশক স্পঞ্জের মাধ্যমে। স্পঞ্জের টুকরা হাশিশ ও আফিমের রসে চুবিয়ে রোদের তাপে রেখে দেওয়া হতো। রোদের তাপে ধীরে ধীরে তা শুকিয়ে যেত। এভাবেই সংরক্ষণ করা হতো এই চেতনানাশক ওষুধ।

অপারেশন শুরুর আগে স্পঞ্জ আবার ভিজিয়ে নেওয়া হতো। সেটা রোগীর নাক ও মুখের ওপর রাখা হলে রোগী হারিয়ে যেত গভীর ঘুমে। এরপর চলত অস্ত্রোপচারের প্রক্রিয়া।[৮৮] এটি ছিল অত্যন্ত সহজ এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলিমদের এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার। বলা যায় মানবতার প্রতি দয়া প্রদর্শন। কেননা প্রাচীন ভারতীয়, রোমান ও গ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সরাসরি মাদকজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হতো। অস্ত্রোপচারের পর রোগীরা ব্যথায় কাতরে উঠলেই বারবার মদ্যপানে বাধ্য করা হতো। সেদিক থেকে মুসলিমদের আবিষ্কৃত চেতনানাশক ওষুধ ছিল রোগীর পক্ষে অধিক উপযোগী।

নতুন ধরনের অবশকারক ওষুধ আবিষ্কারের পাশাপাশি মুসলিমরা অপারেশনের রোগীদের জন্য ব্যথানাশক ওষুধও আবিষ্কার করেছিলেন। এর মধ্যে একটা হলো 'লুফফা'। এটি তৈরি হতো ঘন-শিকড়বিশিষ্ট হলদে সুগন্ধি একধরনের উদ্ভিদ থেকে। এই ওষুধ তৈরিতে তারা গাঁজা ও ওয়াটার হেমলক

---

৮৭. দেখুন, *আল-উলুম ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা* (ইলেকট্রনিক সংস্করণ)

৮৮. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ১৫২

গাছের পাতা ব্যবহার করতেন। এটি নাইটশেড-পরিবারের অন্তর্গত এবং এটি চেতনানাশক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত।[৮৯]

অবশ বা অচেতন ব্যক্তিকে জাগানোকে সাধারণত চিকিৎসার ভাষায় বলা হয় রেজারেকশন। রেজারেকশনের ক্ষেত্রে যদিও মুসলিমদের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও বলা যায়, এর প্রাথমিক ধারণাটা তারা লাভ করেছিলেন। এর জন্য তারা অচেতন ব্যক্তির ফুসফুসে ধাপে ধাপে প্রচুর বাতাসের চাপ দিতেন, এর জন্য তারা ব্যবহার করতেন পাম্প দেওয়ার যন্ত্র 'মিনফাখ'।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আবি উসাইবিয়া একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ *তাবাকাতুল আতিব্বা*-য়। একবার হারুনুর রশিদের চাচাতো ভাই ইবরাহিম ইবনে সালেহের শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। মৃত হিসাবেই তাকে কাফন পরিয়ে রাখা হয়েছিল। মৃত্যুসংবাদ শুনে চিকিৎসক সালেহ ইবনে বাহলা ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। একটু পরেই বাইরে থেকে লোকেরা শুনতে পেল সালেহ ইবনে বাহলা তালু দিয়ে সজোরে ইবরাহিমের গায়ে আঘাত করছে এবং আল্লাহু আকবার তাকবির বলছে। তারপর তিনি বাদশাহ হারুনুর রশিদকে সংবাদ পাঠালেন। সালেহ ইবনে বাহলা একটি সুঁই বের করে ইবরাহিমের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। তার হাতটা টেনে শরীরের ওপর রাখলেন। তার শরীর থেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে দিতে বললেন। 'কুনদাস' (Pellitory) নামক ওষুধ ও পাম্প দেওয়ার যন্ত্র আনতে বললেন। সেটা দিয়ে তিন ঘণ্টা বাতাস দেওয়ার পর ইবরাহিমের শরীর নড়ে উঠল। তিনি হাঁচি দিয়ে জেগে উঠলেন।[৯০]

❋❋❋

৮৯. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ১৫২
৯০. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/ ১৬৭-১৬৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মেডিক্যাল অ্যানাটমি

গ্যালেনের *আত-তাশরিহুল কাবির* গ্রন্থটি ছিল প্রত্যেক শল্যচিকিৎসকের জন্য পাথেয়। এ ছাড়া মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ এ কথা জোর দিয়ে বলতেন যে, অ্যানাটমির পরিপূর্ণ জ্ঞান ছাড়া কেউ শল্যচিকিৎসক হতে পারবে না। শল্যচিকিৎসকের জন্য অবশ্যই শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকর্ম ও অবস্থান জানতে হবে, যেন সার্জারি করতে গিয়ে মানুষের জীবন বা কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

গ্যালেনের অ্যানাটমি সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থ মুসলিমরা আরবিতে অনুবাদ করে নিয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হলো, *ইখতিসারু কিতাবি মারনিস ফিত-তাশরিহ*, *তাশরিহুল হায়াওয়ানিল হাই*, *তাশরিহুল হায়াওয়ানিল মাইয়িত*, *ইলমু আবু করাত ফিত তাশরিহ* (অ্যানাটমিতে হিপোক্রেটিসের জ্ঞানধারা), *তাশরিহুর রাহিম* (জরায়ুর অ্যানাটমি), *তাশরিহুল আইন* (চোখের অ্যানাটমি), *তাশরিহু আলাতিস সাওত* (কণ্ঠনালির অ্যানাটমি) ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলো মুসলিমদেরকে শারীরবিদ্যা আয়ত্ত করতে সহযোগিতা করেছে। সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই তারা শল্যচিকিৎসায় উপকৃত হয়েছেন।

অ্যানাটমির ক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসকদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা হতো। এটাকে বলা হতো 'মিহনা'। চিকিৎসার কিংবদন্তি আবু বকর রাযি *মিহনাতুত তাবিব* গ্রন্থে লিখেছেন, শল্যচিকিৎসায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর তাত্ত্বিক জ্ঞানের অবস্থা পূর্বে জেনে নিতে হবে। তার শারীরবিদ্যা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে কি না, পূর্ববর্তীদের লেখাজোখা সম্পর্কে অবগত কি না ইত্যাদি। যদি এমনটা না হয়, তাহলে তার পরীক্ষা নেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। যদি সে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোয় পারঙ্গম হয় তবেই তার ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।[৯১]

---

৯১. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা*

ইবনে তুফাইল (মৃ. ৫৮১ হি./১১৮৫ খ্রি.) মৃত ও জীবিত উভয় দেহের অঙ্গব্যবচ্ছেদে পারদর্শী ছিলেন। একবার তিনি জীবিত এক হরিণের বুক চিরে বের করে আনলেন হৃৎপিণ্ড। দেখে বললেন, হৃৎপিণ্ডে বিদ্যমান রক্ত সারা দেহে সঞ্চালিত রক্তের মতোই। কিন্তু রক্ত দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে জমাটবদ্ধ হয়ে যায়।[৯২]

মুসলিম চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রাণীর চোখের অ্যানাটমি নিয়েও গবেষণা করেছেন। এখান থেকেও তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ইবনে ঈসা তো চোখের অ্যানাটমি ও চোখের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য রোগ-বালাই নিয়ে *তাযকিরাতুল কাহহালিন* নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করে ফেলেছেন। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপের চিকিৎসাব্যবস্থায় এই গ্রন্থের গভীর প্রভাব ছিল।

কিন্তু মুসলিম চিকিৎসকগণ সে যুগে মানবদেহের ব্যবচ্ছেদ করতে যাননি কখনো। এর পেছনে কার্যকর ছিল ধর্মীয়, মানবিক ও সামাজিক কারণ। তবে কেউ কেউ বলে থাকেন, মুসলিম চিকিৎসকগণ গোপনে হয়তো মানবদেহের দেহব্যবচ্ছেদ করে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে তারা দুটি দলিল উপস্থাপন করেন।

প্রথম দলিল : তারা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠনকাঠামোর খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষত চোখ, হৃৎপিণ্ড, কলিজা ও জরায়ুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তারা তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় দলিল : মানবদেহের অ্যানাটমির ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করেছেন। গ্রিকদের অনেক ধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাদের বহু ভুলত্রুটিও ধরিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পাই অ্যানাটমির ক্ষেত্রে ইবনে নাফিস গ্যালেনের চিন্তার সমালোচনা করেছেন, পাশাপাশি গ্যালেনের চিন্তার অনুগামী ইবনে সিনারও সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তিনি হৃৎপিণ্ড ও গলার অ্যানাটমির মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দনের মাঝে একটি যোগসূত্র রয়েছে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেখান থেকেই তিনি ফুসফুসের গঠন ও কর্ম সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে গ্যালেন ও ইবনে সিনার ভুল তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছিলেন ধমনি ও

৯২. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৪৪

শিরাসমূহের সংযোগকারী কৈশিক জালিকার কর্ম, ফুসফুস ও হার্টের মধ্যে প্রসারিত আলভোলি ও শিরাগুলোর গতিপ্রকৃতি।[৯৩]

অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যার গুরু ইবনে নাফিস-সহ অন্যান্য মুসলিম বিশেষজ্ঞের অবদান সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তুলে ধরছি—

১. ফুসফুসে পালমোনারি সংবহনের আবিষ্কার। এর মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুস থেকে পালমোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। এই আবিষ্কারই উইলিয়াম হার্ভের পথ তৈরি করে দিয়েছে সংবহনতন্ত্র (Circulatory system) আবিষ্কারের।

২. ফুসফুস ও কৈশিক জালিকাসমূহের কাঠামো সম্পর্কে অবগতি লাভ এবং করোনারি ধমনি ও এর রক্ত সঞ্চালনের বর্ণনা। তারাই প্রমাণ করেছিলেন যে মানব হৃৎপিণ্ডে আছে দুটি নিলয় (Ventricle)।

৩. গ্যালেনের মতের বিপরীতে তারা প্রমাণ করেছিলেন, ফুসফুসের ধমনিতে রক্তের সাথে কোনো বায়ু নেই।

৪. মানবদেহের কঙ্কাল সম্পর্কে গ্যালেনের বর্ণনার সমালোচনা করেছেন মুসলিম অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞগণ। আবদুল লতিফ বাগদাদি (মৃ. ৬১৯ হি./১২২২ খ্রি.) ২ হাজারেরও বেশি খুলি পরীক্ষা করার পর বলেছিলেন, নিচের চোয়ালের হাড্ডি এক টুকরো, দুই টুকরো নয়।

৫. ইবনুল কাফ (মৃ. ৬৮৫ হি./১২৮৬ খ্রি.) কার্ডিয়াক ঝিল্লিসমূহের সংখ্যা, তাদের কর্মপ্রক্রিয়া এবং রক্ত চলাচলকালে ঝিল্লিসমূহের ক্রিয়াপদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

৬. তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে, রক্ত ফুসফুসে প্রবাহিত হয়, সেখানে রক্তের পুনর্নবীকরণ হয়, অক্সিজেনের মাধ্যমে রক্ত পুষ্ট হয়, খাদ্যের মাধ্যমে নয়। এটাই পরবর্তীকালে উইলিয়াম হার্ভে বলেছিলেন।

৭. তারা নিশ্চিত করেছেন যে, ফুসফুসের ধমনি ও শিরার মাঝে একটা সংযোগ আছে। এর মাধ্যমে ফুসফুসের মধ্যে পালমোনারি রক্ত সঞ্চালিত হয়।

---

৯৩. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫১; *তাতাওরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০৫-২০৭

৮. তারা বলেছেন, জীবিতদের সূক্ষ্ম শিরাগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা কঠিন, এতে তাদের প্রচুর কষ্ট হবে। এমনইভাবে যারা ডায়রিয়া, রক্তক্ষরণ ইত্যাদির মতো রক্ত হ্রাসকারী রোগে মারা যায় তাদের শিরার ব্যবচ্ছেদও জটিল। তবে যারা শ্বাসরোধে মারা যায়, তাদের শিরার ব্যবচ্ছেদ করা বেশ সহজ।

৯. এটারই কাছাকাছি তত্ত্ব নিশ্চিত করে আধুনিক রোগবিজ্ঞান (Pathology)।

১০. তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে, ফুসফুসীয় ধমনির প্রাচীর পুরু আর ফুসফুসীয় শিরার প্রাচীর পাতলা এবং ফুসফুসীয় ধমনির প্রচীর দু-স্তরে গঠিত।

১১. চোখের অ্যানাটমি ও অস্ত্রোপচারেও মুসলিমদের বেশ দক্ষতা ছিল। ইবনে সিনা বর্ণনা করেছেন, মানব-চোখের পেশির সংখ্যা ছয়টি। চারটি চারদিকে আর দুটি টিম্বিক ওপরে ও নিচে। ইবনে নাফিস বলেছেন, চোখ হলো দৃষ্টির সহায়ক যন্ত্র, এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই যন্ত্রের ক্রিয়া মস্তিষ্কের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানও একই কথাই বলে। দর্শনীয় বস্তু থেকে আলোকরশ্মি চোখে পড়ে। রেটিনার ওপর বস্তুটির ছোট ও উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে এই আলোক-অনুভূতি মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে। মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

১২. গ্যালেন বলেছিলেন, হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকলদুটির মধ্যে যে পর্দা আছে, সেখানে একটি ফাঁকা আছে। মুসলিম চিকিৎসকগণ এই মতের জোর বিরোধিতা করেছিলেন। মুসলিমরা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, রক্ত হৃৎপিণ্ডে সঞ্চালিত হয়ে সম্পূর্ণ চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে রক্ত ফুসফুসের ভেতরে গিয়ে অক্সিজেনযুক্ত হয়। তারপর পালমোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে পৌঁছে।[৯৪]

---

৯৪. *আল-মাওসুআতুল আরবিয়্যাতুল আলামিয়্যা*

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

চক্ষুচিকিৎসা

চক্ষুচিকিৎসাকে আরব মুসলিমগণ 'কাহালাহ' বলে অভিহিত করতেন। আর চক্ষু চিকিৎসককে বলতেন 'কাহহাল'। হিন্দুস্তান, গ্রিস ও রোম থেকে প্রাপ্ত চক্ষুচিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থগুলো মুসলিমগণ আরবিতে অনুবাদ করে নিয়েছিলেন। সার্জারির মতো চক্ষুচিকিৎসার অঙ্গনকেও তারা বিকশিত করেছেন। চক্ষুচিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতেও অভিনবত্ব এনেছেন। তারা এমন কিছু সৃজনশীল কাজ করেছেন যা তারা পূর্ববর্তীদের থেকে লাভ করেননি। চোখ থেকে ময়লা নীল পানি অপসারণে তারা ছিলেন পারঙ্গম। অথচ আধুনিক যুগেও এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন।[৯৫] চোখের নীল পানি অপসারণের পাশাপাশি তারা চোখের ছানি অপসারণেও অভিজ্ঞ ছিলেন। তারা চোখের ছানির শল্যচিকিৎসার ছয়টি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল শুষে নেওয়ার পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করতেন পাতলা কাচের নল। সেটি চোখে ঢুকিয়ে অস্বচ্ছ লেন্স কুটিকুটি করে কেটে শুষে বের করে নিয়ে আসতেন। আধুনিক যুগেও ছানির চিকিৎসায় এটিই সর্বাধুনিক পদ্ধতি। যন্ত্র ও উপকরণের দিক থেকে আধুনিক যুগের সাথে মিল না থাকলেও পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে দুইয়ের মাঝে রয়েছে অনেক মিল।

চক্ষুচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা এবং ওষুধ নিয়ে মুসলিমগণ বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে আছে হুনাইন ইবনে ইসহাকের *আশরু মাকালাতিন ফিল আইন*। এটি মুসলিমদের চক্ষুচিকিৎসার উন্মেষপর্বের উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত।[৯৬]

মুসলিমদের যুগে চক্ষুবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে দুজন চক্ষুবিশেষজ্ঞের হাত ধরে। তাদের একজন আবুল কাসেম আম্মার ইবনে আলি মাওসিলি (মৃ. ৪০০ হি./১০১০ খ্রি.), আরেকজন আলি ইবনে ঈসা আল-কাহহাল (মৃ.

---

৯৫. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৯৯-৩০০

৯৬. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/ ১২৮

৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.)। প্রথমজন চক্ষুচিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে পারঙ্গম ছিলেন। মুসলিম চক্ষুচিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। চোখের রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকার নিয়ে তিনি রচনা করেছেন *আল-মুনতাখাব ফি ইলাজি আমরাদিল আইন*। তার কর্মক্ষেত্র ছিল কায়রোয়। আর আলি ইবনে ঈসা চক্ষুচিকিৎসার পাশাপাশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন *তাযকিরাতুল কাহহালিন* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। তার কর্মক্ষেত্র ছিল বাগদাদে। প্রাচ্যবিদরা তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুচিকিৎসক হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। তার গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে লাতিন ও হিব্রু ভাষায়। লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে দুবার।

ইবনে আবি উসাইবিয়া *তাবাকাতুল আতিব্বা*-য় বর্ণনা করেছেন যে, আলি ইবনে ঈসার গ্রন্থে তিনটা নিবন্ধ আছে। প্রথম নিবন্ধ চোখের পরিচয়, সংজ্ঞা, অ্যানাটমি, স্তর, আর্দ্রতা, স্নায়ু ও পেশিসংক্রান্ত। প্রতিটি স্তরের উৎপত্তি, সমাপ্তি, পুষ্টিলাভের প্রক্রিয়া, অবস্থান ও কার্যকারিতা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় নিবন্ধ চোখের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান রোগ, রোগের কারণ, উপসর্গ, লক্ষণ ও প্রতিষেধকবিষয়ক। এ ছাড়াও তার চক্ষুচিকিৎসার বিষয়ে লেখা গ্রন্থ প্রায় ৩২টি। *তাযকিরাতুল কাহহালিন* গ্রন্থে তিনি চোখের ১৩০টি রোগের কথা তুলে ধরেছেন।[৯৭]

চোখের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো চক্ষুচিকিৎসক সালাহুদ্দিন ইবনে ইউসুফের *নুরুল উয়ুন ওয়া জামিয়ুল ফুনুন*। গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন আনুমানিক ৬৯৭ হিজরি/১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে রয়েছে চোখের বর্ণনা, দৃষ্টিক্ষমতা, চোখের রোগ-ব্যাধি, রোগের উপসর্গ, চোখের সুরক্ষা, অক্ষিকোটরের রোগ, চোখের পাতার রোগ, কনজাংটিভা, কর্নিয়া, চোখের অত্যন্ত সংবেদনশীল কিছু রোগ, যা সাধারণত নির্ণয় করা কষ্টকর এবং চোখের ওষুধের বিবরণ।

তবে ইসলামি সভ্যতার চক্ষুবিজ্ঞান সম্পর্কে ফিজিক্যাল দিক থেকে শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায় হাসান ইবনে হাইসামকে (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৮ খ্রি.)। তিনি চোখ সম্পর্কে সূক্ষ্ম বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি আলোচনা করেছেন দৃষ্টিশক্তি ও এর প্রকৃতি সম্পর্কে। তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল, চোখে আলো প্রবেশ

---

৯৭. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/ ২৬৩

করে, কিন্তু চোখ থেকে আলো বের হয় না। চোখের রেটিনা দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। রেটিনার ওপর দর্শনীয় বস্তুটির ছোট ও উলটো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে এই আলোক-অনুভূতি মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে। মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

মিশরের চক্ষুচিকিৎসক কাজি ফাতহুদ্দিন আবুল আব্বাস কাইসির (মৃ. ৬৫৭ হি./১২৫৮ খ্রি.) *নতিজাতুল ফিকর ফি আমরাদিল বাসার* গ্রন্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাকে মিশরের প্রধান চিকিৎসক হিসাবে অভিহিত করা হতো। তার সেই গ্রন্থে চক্ষুবিদ্যা (Ophthalmology)-বিষয়ক ১৫টি অধ্যায় ছিল। তেমনইভাবে প্রসিদ্ধ ছিল খলিফা ইবনে আবিল মাহাসিন হালবির লেখা *আল-কাফি ফিল কাহল* গ্রন্থটি। এটি তিনি রচনা করেছিলেন ৬৫৪ হিজরি থেকে ৬৭৪ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে।[৯৮]

❁❁❁

[৯৮]. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা*, বিস্তারিত জানতে দেখুন, *আল-কাহহালা ইনদাল আরব লি ফুরাত ফায়েক খিতাব*, পৃ. ৪৩

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

শিশুরোগবিদ্যা

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ কোনো মুসলিম চিকিৎসকের নাম আমরা খুঁজে পাই না। কিন্তু চিকিৎসার অন্যান্য শাখার সাথে মুসলিম চিকিৎসকগণ শিশুরোগ নিয়ে চর্চা করেছেন গভীরভাবে। কেউ গবেষণা করে বইপত্র লিখেছেন। কেউ-বা আবার ভ্রূণবিজ্ঞান ও বংশগত রোগের ওপর গবেষণা করেছেন। কেউ আবার সাত মাসের মধ্যে জন্ম নেওয়া শিশুদের নিয়ে লিখেছেন। তাদের যত্ন ও লালনপালনের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। তেমনইভাবে তাদের কেউ দুধ পান করানো এবং ধাত্রীদের নিয়েও গবেষণা করেছেন।

শিশুর জন্ম থেকে শৈশবের বিভিন্ন স্তর নিয়ে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভাগ আর তাদের বিভাগগুলোয় আকাশ-পাতাল তফাত ছিল না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বিকাশের পর্যায়সমূহ তারা উল্লেখ করেছেন। ভ্রূণে জীবন সঞ্চারিত হওয়ার পর যত্নপদ্ধতি তুলে ধরেছেন। শিশুদের দুধ পান করানোর বিষয়টাও তারা গুরুত্বের সাথে গবেষণা করেছেন। ধাত্রীর পুষ্টিকর খাবার খাওয়া যেন বুকের দুধ স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর হয় ইত্যাদি নিয়ে তারা লিখেছেন বহু অধ্যায়। যেসব রোগে সাধারণত শিশুরা আক্রান্ত হয় সেসব নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন। যেমন ডায়রিয়া, হাঁপানি, বিছানায় প্রস্রাবের অভ্যাস, ধনুষ্টংকার, টেরা চোখ, ঘা, ফোসকা, ফুসকুড়ি, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া, মুখের ঘা, বিভিন্ন ধরনের কৃমি, পক্ষাঘাতগ্রস্ততা, বিভিন্ন ধরনের জ্বর, টিটেনাস, কান ও চোখ ব্যথা ইত্যাদি।[৯৯]

আরব চিকিৎসক আবুল হাসান আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ তবারির (মৃ. ৩৬৬ হি./৯৭৬ খ্রি.) লেখা গ্রন্থটি শিশুরোগবিষয়ক প্রাচীনতম একটি পাণ্ডুলিপি বলা যায়। কারণ এর আগে আবু বকর রাযির রচিত একটি গ্রন্থ ব্যতীত আর

---

৯৯. মাহমুদ আল-হাজ কাসেম অনূদিত *রিসালাতুন ফি আমরাদিল আতফাল ওয়াল-ইনায়াতু বিহিম লি রাযি*, পৃ. ৯৮

কোনো আরবি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। ইংরেজি ও ইতালি ভাষায় এর বিভিন্ন অনুবাদ আছে। প্রাচীন হিব্রু ও লাতিন অনুবাদও পাওয়া যায়।[১০০]

মুসলিম চিকিৎসকগণ যেমন সাত মাসে জন্ম নেওয়া শিশুকে নিয়ে লিখেছেন, তেমনইভাবে শিশুদের জন্মের পর প্রাথমিক অবস্থায় করণীয় কী তা-ও তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে ইবনে সিনা যা লিখেছেন, তা আধুনিক চিকিৎসার সাথে বেশ মিল রাখে। *আল-কানুন* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, শিশুর জন্মের পর প্রথমে চার আঙুল সমপরিমাণ নাভি রেখে বাকি গর্ভনালি কেটে দিতে হবে। এরপর গা ধুয়ে কাপড়ে আবৃত করবে। চোখ ও নাক পরিষ্কার করে দেবে। তাকে রাখতে হবে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়। কুসুম গরম পানি দিয়ে শরীর পরিষ্কার করবে এবং তাপ দেবে। এরপর শিশুর নাকে কয়েক ফোঁটা মিষ্টি তেল দেবে।[১০১]

মুসলিম চিকিৎসকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শিশুর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ খাবার হলো মায়ের দুধ। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও একই কথা বলে। প্রসূতি মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান বজায় রাখতে বিশেষ তালিকাও দিয়েছেন মুসলিম চিকিৎসকগণ। যেমন গম, ছাগল ও ভেড়ার গোশত, মাছ ইত্যাদি। বিশেষ কিছু অবস্থায় তারা প্রসূতি মাকে দুধ পান করাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। যেমন মা যদি সংক্রামক ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, প্রচুর পাতলা পায়খানা হয়, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ দেখা দেয় তাহলে দুধপান করানো বন্ধ রাখতে হবে। এমনইভাবে যদি দুধপান করানোর সময়ে প্রসূতি মাকে গভীর প্রভাবক ও শক্তিশালী ওষুধ সেবন করতে হয়, তাহলেও বুকের দুধ বন্ধ রাখবে।[১০২] আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও ইবনে সিনার মতবাদ সমর্থন করে।

দুধপানের সময়সীমা মুসলিম চিকিৎসকগণ নির্ধারণ করেছেন দুই বছর। এ ক্ষেত্রে তারা হয়তো কুরআন থেকেই ধারণা নিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

---

১০০. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৩৫-২৩৬
১০১. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ১/ ২০৩
১০২. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ১/ ২০৫

> মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে। (এ সময়কাল) তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। [সুরা বাকারা : ২৩৩]

তারা এটাও বলেছেন যে, দুধপান বন্ধ করতে হবে নাতিশীতোষ্ণ ঋতুতে। প্রচণ্ড গরমেও নয়, কনকনে শীতেও নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে, এসব ঋতুতে হঠাৎ করে দুধ বন্ধ করলে শিশু পেটের পীড়ায় ভুগতে পারে। এমনকি কমে যেতে পারে শিশুর হজমশক্তিও।

দুধপান বন্ধ করতে হবে ধীরে ধীরে, যেমনটি বলেছেন ইবনে সিনা। তিনি বলেন, শিশুর সামনের দাঁত উঠলে ধীরে ধীরে তাকে কিছুটা স্বাভাবিক খাবারে অভ্যস্ত করতে হবে। তবে খুব শক্ত খাবার দেওয়া যাবে না। দুধ ছাড়ানোর পর তাকে সুজি জাতীয় খাবার এবং নরম গোশত খেতে দেবে। দুধপান ছাড়াতে হবে ধীরে ধীরে, একবারে নয়।

তেমনইভাবে যখন শিশুকে হাঁটা শেখানো হবে তখন দ্রুত হাঁটা শেখার জন্য তাকে চাপাচাপি করা যাবে না। এটি বেশ বিপজ্জনক এবং এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ইবনে সিনা বলেন, শিশুকে বসানো বা হাঁটা শেখানোর ক্ষেত্রে কোনো চাপাচাপি করা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই সে শিখে নেবে। বেশি চাপাচাপি করলে পায়ের গোছা ও হাড্ডিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে।[১০৩]

❁❁❁

১০৩. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ১/২১০

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ধাত্রী এবং স্ত্রীরোগবিদ্যা

মুসলিম চিকিৎসকগণ স্ত্রীরোগবিদ্যা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন। মাসিক, ঋতুস্রাবজনিত ব্যাধি, ব্যথা, জরায়ুর অ্যানাটমি এবং এ জাতীয় অন্যান্য রোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবু বকর রাযি লিখেছেন, নারীদের রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা নিয়ে। ইবনে সিনা *আল-কানুন* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে নারীদের রোগ, ধাত্রীবিদ্যা, জরায়ুর সমস্যা ও উপসর্গ এবং গর্ভকালীন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ১১টি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথম প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে জরায়ু সম্পর্কে সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, জরায়ু নারীদের প্রজননতন্ত্র। বাচ্চা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি ফুলে ওঠে। বাচ্চা ধারণের পূর্বে এটি সংকুচিত থাকে। এর অবস্থান মূত্রাশয়ের পেছনে এবং অন্ত্রের সামনে। এটি সাধারণত দৈর্ঘ্যে ছয় থেকে এগারো আঙুল হয়ে থাকে। ঋতুস্রাবের সময় এটি ঘন হয়ে কিছুটা ফুলে ওঠে। ঋতুস্রাব শেষ হলে এটা আবার শুকিয়ে চুপসে যায়। ভ্রূণ বৃদ্ধিতে জরায়ু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভ্রূণের দেহের আকার ও বিস্তৃতি অনুযায়ী জরায়ু সম্প্রসারিত হয়। জরায়ু পেশিবহুল, যোনিমুখের সাথে এর একটি সংযুক্ত রাস্তা আছে। এর মাধ্যমেই বীর্য জরায়ুতে পৌঁছে, ঋতুস্রাব বের হয় এবং ভ্রূণের জন্ম হয়। রক্তপিণ্ড ধারণকালে এটি খুবই সংকীর্ণ হয়ে থাকে।[১০৪]

ইবনে সিনা-সহ অন্য আরও অনেকেই স্বাভাবিকভাবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পদ্ধতি ও এতে অংশ নেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন। প্রাকৃতিকভাবে শিশুভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মাথা বের করতে হবে আগে। আর যদি কৃত্রিম পন্থায় (সিজারের মাধ্যমে) হয় তাহলে আগে পা বের করতে হবে। মুসলিম চিকিৎসকগণ সফলভাবে কিছু সিজারও করেছেন। লিখেছেন বন্ধ্যাত্ব ও এর কারণ নিয়ে। সন্তান না হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মহিলাদের কিছু কারণ এবং পুরুষদের কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। ইবনে সিনা বলেছেন, এর জন্য হয়তো পুরুষের বীর্য দায়ী নয়তো নারীর বীর্য, অথবা সমস্যা জরায়ুতে অথবা

---

১০৪. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ২/৭৫৪

পুরুষের লিঙ্গে এবং বীর্যের কার্যক্ষমতায়। অথবা ভিন্ন কিছু কারণ এর জন্য দায়ী। যেমন দুশ্চিন্তা, ভয়, আতঙ্ক, মাথাব্যথা, শোক, হজমের দুর্বলতা, বদহজম অথবা উদ্ভূত কোনো সমস্যা।[১০৫]

মুসলিম চিকিৎসকগণ বলেছেন, এসব ছাড়াও বন্ধ্যাত্বের আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন জরায়ুতে প্রজননগত প্রতিবন্ধকতা, জরায়ু সংকীর্ণ হওয়া, জরায়ুতে গভীর আঘাত লাগা, মেনোপজ ঘটা, জরায়ু উলটে যাওয়া, জরায়ুর রোগ যেমন টিউমার, ঘা, জরায়ুর মাংস বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ইবনে সিনা বলেছেন, জরায়ুর সমস্যা বিভিন্নরকম। হয়তো সেটা পুরুষের বীর্যকে নষ্ট করে দেয়। অথবা বীর্য আকর্ষণকারী শক্তিকে দুর্বল করে। কিংবা জরায়ুতে বীর্য পৌঁছানোর পথে কোনো প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে। জরায়ুতে ঘা, বর্ধিত মাংস, শীতল স্যাঁতসেঁতে গর্ভে বীর্য এলে বীর্য নষ্ট হয়ে যায়, যেমন স্যাঁতসেঁতে জমিতে শস্যবীজ নষ্ট হয়ে যায়। এমনইভাবে জরায়ু অতি শুষ্ক হলেও বীর্য নষ্ট হয়ে যায়, যেমন রোদের সরাসরি তাপে শুষ্ক বীজতলায় বীজ শুকিয়ে যায়। এ ছাড়া ঋতুস্রাবের রক্ত না থাকা, জরায়ু নেমে আসা, জরায়ু উলটে যাওয়া, দেহের অতি শীর্ণকায় অবস্থা, জরায়ুতে কোনো সমস্যা, টিউমার, ক্ষত সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদিও বন্ধ্যাত্বের কারণ।

আর পুরুষের সমস্যাগুলো হলো, বীর্যথলির অক্ষমতা, বীর্যে সন্তান জন্মক্ষমতা হ্রাস, খাটো কিংবা বক্র পুরুষাঙ্গ, যার ফলে বীর্য গর্ভাশয়ে পৌঁছে না ইত্যাদি।[১০৬]

বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে মুসলিম চিকিৎসকগণ যেসব কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর কথা আধুনিক বিজ্ঞানও বলে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কল্যাণে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আরও নতুন নতুন কারণ আবিষ্কার করেছে।

গর্ভাবস্থা, প্রসব, গর্ভধারণের পর গর্ভের ভেতরে ভ্রূণের বিকাশ, গর্ভাবস্থার ঝুঁকি, গর্ভবতী নারীর শারীরিক পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়েও মুসলিম চিকিৎসকগণ আলোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিকারে তরলজাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে; রেচকজাতীয় খাবার খাওয়ানো যাবে না। তা ছাড়া প্রসূতির খাদ্যতালিকাও তারা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। গর্ভবস্থায় পেটের ওপর চাপ প্রয়োগ থেকে প্রসূতিকে সাবধান থাকতে বলেছেন।

---

১০৫. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ২/৭৬২

১০৬. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ২/৭৬৩

বলেছেন, প্রসূতি হালকা শরীরচর্চা করতে পারেন; সেটা হাঁটাচলার মাধ্যমেও হতে পারে। অধিক নড়াচড়া, ভারী কাজ, লাফালাফি, মারামারি, হইহুল্লোড় থেকে সম্পূর্ণ বারণ করেছেন। পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলার মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও তারা বিবেচনা করতে বলেছেন। ইবনে সিনা বলেন, তাদের সামনে এমন কিছু উপস্থাপন করা যাবে না, যা তাদেরকে চিন্তাক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত করে। প্রসূতিকে গর্ভপাতের সকল কারণ থেকে দূরে থাকতে হবে; বিশেষত প্রথম মাসে। আর সবসময় তাদের পাকস্থলীর অবস্থা খেয়াল রাখতে হবে।[১০৭]

বর্তমানে আমরা যাকে 'মোলার প্রেগন্যান্সি' বলি, সেটার লক্ষণ শনাক্ত করে এর প্যাথোলজিক্যাল শারীরবৃত্তীয় দেখিয়েছেন মুসলিমগণ। উদাহরণস্বরূপ ইবনে সিনা বলেছেন, কখনো কখনো মহিলার গর্ভাবস্থার মতো পরিস্থিতি দেখা দেয়। যেমন ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাসিকের রং পরিবর্তন হওয়া, জরায়ুর মুখ সংকুচিত হয়ে যাওয়া, স্তনের ফোলাভাব, তলপেটে ভ্রূণের মতো আকার ও গতিবিধি অনুভূত হওয়া, প্রসববেদনা অনুভূত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভ্রূণের কোনো অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ ঋতুস্রাবের রগ প্রসারিত হওয়া ও ফুলে যাওয়া।[১০৮]

মুসলিম চিকিৎসকগণ ডাইস্টোসিয়া ও প্রসবে অতিরিক্ত ব্যথা নিয়েও লিখেছেন। তারা বলেছেন, কয়েকটি কারণে অতিরিক্ত ব্যথা হতে পারে। যেমন, গর্ভবতী নারীর শারীরিক সমস্যা, শিশুর অস্বাভাবিক অবস্থান, জরায়ুপ্রদাহ, ধাত্রীর অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

মাত্রাতিরিক্ত প্রসববেদনার ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কেও মুসলিম চিকিৎসকগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জরায়ুর বিভিন্ন রোগ, যেমন টিউমার, গনোরিয়া, রক্তপাত, জরায়ু নেমে পড়া ইত্যাদি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। এসব রোগের প্রতিষেধক নিয়েও আলোচনা করেছেন তারা। হোক সেটা ভেষজ ওষুধ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, বাষ্প অথবা জীবাণু পরিশোধক। বিশেষত ইবনে সিনা বিস্তারিতভাবে জরায়ুর রোগগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন জরায়ুর ক্ষত, টিউমার, জরায়ু নেমে আসা, উলটে যাওয়া, জরায়ুর বক্রতা, শক্ত হয়ে যাওয়া। এমনইভাবে জরায়ুর হট টিউমার, সলিড টিউমার ও যৌনাঙ্গের গ্রানুলোমাটাস টিউমার সম্পর্কেও তার পর্যালোচনা আছে।[১০৯]

---

১০৭. *আল-কানুন ফিত-তিব লি-ইবনি সিনা*, ২/৭৭১
১০৮. *আল-কানুন ফিত-তিব লি-ইবনি সিনা*, ২/৭৮১
১০৯. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ২/৫৯১, ৫৯৮

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

মনোরোগ বিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে মনোরোগ বিজ্ঞান যতটা অবজ্ঞা ও অস্বীকারের মুখোমুখি হয়েছে, চিকিৎসার অন্য কোনো শাখার ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। তবে মুসলিম চিকিৎসকগণ মনোরোগ বিজ্ঞানকে যতটা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার চোখে দেখেছে, সেটা বিস্তারিত উল্লেখ করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। একসময় ইউরোপে মানসিক রোগ বা উন্মাদনাকে মনে করা হতো শয়তানি রোগ-বালাই। তখন ইউরোপীয়রা মানসিক রোগীদের শিকলে বেঁধে বন্দি করে রাখত। চিৎকার করলে বেদম প্রহার করত।[১১০]

শারীরিক রোগ-ব্যাধির বলয়ে মুসলিম চিকিৎসকগণ তাদের চিকিৎসাব্যবস্থা সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। বরং মানসিক রোগ-ব্যাধিকেও তারা সমান গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেছিলেন। মুসলিম চিকিৎসকগণ মনে করতেন, মানসিক রোগ দেহের বাহ্যিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলে। এজন্য সব বড় হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ ছিল।[১১১]

আবু বকর রাযি চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক কারণ ও বিষয়গুলোর কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনিই প্রথম রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের[১১২] (Rheumatoid Arthritis) মনস্তাত্ত্বিক উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। গেঁটেবাত (Gout) থেকে এ রোগটি যে সম্পূর্ণ আলাদা, সেটিও তিনি বলেছিলেন। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগ সম্পর্কে তার মতামত হলো, বাহ্যিকভাবে যদিও এটি শারীরিক ব্যাধি বলে মনে হয়, কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে তৈরি হয় মানসিক সমস্যা থেকে। এই রোগটি বেশিরভাগ সময় ক্রোধ সংবরণকারীদের হয়ে থাকে। প্রচণ্ড ক্রোধ সংবরণের কারণে

---

১১০. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২১৭

১১১. দেখুন, *রিহলাতু ইবনে জুবাইর*, পৃ. ১৯-২০

১১২. **রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস :** এটি এমন একটি রোগ, যার ফলে রোগীর হাঁটু, গোড়ালি, কবজি বা ঘাড়ের জয়েন্টগুলোয় ব্যথা অনুভূত হয়। সময়মতো চিকিৎসা না নিলে রোগটি শরীরের অন্যান্য অঙ্গকেও প্রভাবিত করতে পারে।

তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাযি আরও মনে করেন, কখনো কখনো বদহজম হয় মানসিক কারণে। বদহজমের পেছনে লিভার ও প্লিহার সমস্যা ছাড়াও আবহাওয়া, গোসল, পানি পানের স্বল্পতা, ঘন ঘন রক্তক্ষরণ, অধিক সহবাস, ক্ষুধা, মানসিক উদ্‌বেগও কখনো কখনো কাজ করে। আবু বকর রাযি আরও বলেন, চিকিৎসকের উচিত ভালো-মন্দ রোগীকে সুস্থতার আশ্বাস দেওয়া, যদিও চিকিৎসকের মনে কোনোরূপ আশা না থাকে। কারণ রোগীর মানসিক অবস্থার প্রভাব তার দেহেও পড়ে; চাই তা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক।[১১৩]

সে যুগে অনেক চিকিৎসকই মানসিক রোগ এবং এর প্রতিষেধক নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনে ইমরান বিষণ্ণতা (Melanchol) নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। ইবনে মাইমুন (মৃ. ৪১৫ হি./১০২৪ খ্রি.) লিখেছেন মনস্তাত্ত্বিক রোগ নিয়ে *আর-রিসালাতুল আফদালিয়্যা*। সেখানে তিনি রাগ, আনন্দ এবং দুঃখ নিয়ে লিখেছেন এবং স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব তুলে ধরেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, মানসিক সাধনা ও মনোবল বৃদ্ধির মাধ্যমেই এর চিকিৎসা সম্ভব। এই গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানসিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।[১১৪]

এটা অসম্ভব কিছু নয় যে, তাদের মাঝে হয়তো এমন চিকিৎসকও ছিলেন যারা মনস্তাত্ত্বিক রোগ বিশ্লেষণের নীতিমালা জানতেন। এর মধ্য দিয়ে তারা অনেক রোগের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইবনে সিনার একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। ইরানের জুরজান শহরে এক যুবকের অজ্ঞাত রোগ দেখা দিলো। কোনো চিকিৎসকই রোগ নির্ণয় করতে পারছিলেন না। একদিন ইবনে সিনা তাকে দেখতে এলেন। দেখেই বুঝতে পারলেন তার শারীরিক কোনো রোগ নেই। সে এক মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু সেই মেয়ের পরিচয় অজ্ঞাত। যুবকের হাতের শিরার স্পন্দন দেখে ইবনে সিনা মেয়ের নাম-ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন।[১১৫]

ইবনে সিনার আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। একবার বনি বুওয়াইহের এক শাসকের মানসিক রোগ দেখা দিলো। তিনি

---

১১৩. *মানাফিউল আগযিয়া লি রাযি*, পৃ. ১৮

১১৪. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২১৮-২১৯

১১৫. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৩১

খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন। শাসকের মনে হতে লাগল যে, তিনি গরু হয়ে গেছেন। এখন তাকে জবাই করে ফেলা উচিত। ইবনে সিনা তাকে চিকিৎসা করতে এলেন। ধারালো ছুরি নিয়ে এগিয়ে গেলেন শাসকের দিকে। তাকে কাত করে শুইয়ে দিয়ে জবাইয়ের ভণিতা করলেন। এ সময় ইবনে সিনা চিৎকার দিয়ে বললেন, এই গরু তো নিতান্তই দুর্বল ও শীর্ণকায়। জবাই দেওয়ার আগে একে খাইয়ে মোটাতাজা করে নাও। এ কথা শুনে শাসক রীতিমতো খাওয়াদাওয়া শুরু করল। তার খাবারের সাথে ইবনে সিনা মিশিয়ে দিতেন ওষুধ। এভাবেই ধীরে ধীরে সেই শাসক সুস্থ হয়ে ওঠে।[১১৬]

ইবনে সিনা বন্ধ্যাত্বের একটি কারণ হিসাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনস্তাত্ত্বিক বিরোধের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক ও গবেষকদের অন্যতম ছিলেন আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা (মৃ. ৫৬১ হি./১১৬৫ খ্রি.)। তিনি মানসিক রোগের একটা প্রতিষেধক আবিষ্কার করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন। একপর্যায়ে সফলও হয়েছেনে। যা দেখে দ্বাদশ শতকের চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণও অবাক হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার চিন্তাধারা ও মতামতগুলো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

❀❀❀

১১৬. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২২৭

সপ্তম অনুচ্ছেদ

রোগ ও প্রতিষেধক

যে জাতির বিস্তৃতি প্রাচ্যের চীন থেকে নিয়ে পাশ্চাত্যের স্পেন পর্যন্ত ছিল, সেই জাতির চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে কত রোগের নাম থাকতে পারে, তা হিসাব করা মুশকিল। এ ছাড়াও অঞ্চল ও দেশভেদে ছিল একই রোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম। উদাহরণস্বরূপ ইবনুল আইন যারবি (মৃ. ৫৪৮ হি./১১৫৩ খ্রি.) 'শাকফা'—বর্তমানে এটি তড়কা রোগ নামে পরিচিত—সম্পর্কে বলেন, এই রোগ আমরা শাম, ইরাক, খোরাসান, মিশর, মরক্কো-সহ বিভিন্ন দেশেই দেখেছি। তারা কখনো এটাকে 'শাকফা' বলে, কখনো বলে 'খাযফা'। পাশ্চাত্যে বলা হয় 'স্পঞ্জ'। এটা একধরনের হট টিউমার। প্রথমে ছোট থাকলেও ধীরে ধীরে তা বেশ বড় হয়ে যায়।[১১৭]

মুসলিম চিকিৎসকগণ রোগের সংজ্ঞায় বলেছেন, রোগ হলো দেহের কোনো অঙ্গ আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে যাওয়া। তারা রোগের কারণ ও লক্ষণগুলোও তালিকাভুক্ত করেছেন। সাধারণ রোগ ও প্রতিষেধক নিয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, তারা সাধারণত মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত সারা শরীরের রোগ ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। আর যারা বিশেষ কোনো রোগ নিয়ে কলম ধরতেন সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতেন। যেমন মাথার রোগ, কানের রোগ, চোখ ও পেটের রোগ ইত্যাদি। একইসাথে তারা চিকিৎসাপদ্ধতিও আলোচনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনুল আইন যুরবি লিখেছেন চর্মরোগ নিয়ে। সেখানে তিনি 'শাকফা' রোগের কথাও তুলে ধরেছেন। বর্তমানে এটি স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু (একধরনের ব্যাকটেরিয়া) ত্বকে সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট ঘা বলে মনে করা হয়।[১১৮]

বিশেষ কোনো রোগ নিয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে হুনাইন ইবনে ইসহাকের *আশরু মাকালাতিন ফিল আইন*। এখানে তিনি চক্ষুরোগ এবং এর প্রতিষেধক

---

১১৭. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা*

১১৮. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৪/ ৪২৭

তুলে ধরেছেন। চোখে প্রয়োজনে কীভাবে মলম লাগাতে হয়, সেটার বর্ণনাও এখানে আছে।[১১৯]

আল-হাবি গ্রন্থে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে করণীয় তুলে ধরেছেন রাযি। যেমন নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা, তাপমাত্রা, কাঁপুনি, মুখ, চোখ, শ্বাস ও নখ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।[১২০] ইবনে সিনা *আল-কানুন* গ্রন্থে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূত্র, মূত্রের রং পরিবর্তন, গন্ধ ও স্বচ্ছতা পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শ দিয়েছেন রোগীর অবস্থা সর্বদা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। নতুন অবস্থা ও উপসর্গ দেখা দিলে এর নোট লিখে রোগীর বিছানায় রেখে দিতেন।[১২১]

আর সাইকোথেরাপির ক্ষেত্রে তারা রোগীর পারিবারিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। আলি ইবনে ঈসা বাগদাদি রোগীর জীবনের যাবতীয় রোগের ইতিহাস শুনতেন।

আবু বকর রাযি প্লুরিসি, নিউমোনিয়া ও এর চিকিৎসাপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পেটব্যথা ও কিডনি ব্যথার পার্থক্য তিনি তুলে ধরেছেন। টনসিলের চিকিৎসাও তিনি বলে দিয়েছেন।[১২২] মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ততা ও মস্তিষ্কের বাইরের অন্য কোনো সমস্যার কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ততার মাঝে পার্থক্য করেছেন ইবনে সিনা। এ ছাড়াও তিনি পার্থক্য করেছেন ব্যাকটেরিয়াল ও ভাইরাল মেনিনজাইটিসের[১২৩] মধ্যে। নিউমোনিয়া, যকৃতের বিভিন্ন রোগ, অন্ত্র ও রেনাল কোলিকের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন।[১২৪]

মুসলিম চিকিৎসকগণ ঠান্ডা ওষুধ ও ঠান্ডা পানির মাধ্যমে পক্ষাঘাত ও রক্তক্ষরণের চিকিৎসা করতেন। স্থানচ্যুত কাঁধের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা আধুনিক অস্ত্রোপচারপদ্ধতির সাথে অনেকটাই মিল রাখে।

---

১১৯. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/১২৮
১২০. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৭/৭১-৭২
১২১. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ১/১৯৭
১২২. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ২/৭
১২৩. মেনিনজাইটিস : এমন একটি রোগ, যার ফলে জীবাণু মস্তিষ্কের এবং মেরুরজ্জুর আবরণীকে আক্রমণ করে। এই রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর চিকিৎসার জন্য সময় থাকে ২৪ ঘণ্টারও কম।
১২৪. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ২/৩৬৯-৩৭১

প্রথম ব্যক্তি হিসাবে লিসানুদ্দিন ইবনে খতিব বলেছিলেন, প্লেগ একটি সংক্রামক রোগ। এটি এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মাঝে সংক্রমিত হয়। ইবনে তামিমির লেখা থেকে বোঝা যায়, তিনি মহামারির প্রতিষেধকরূপে বিভিন্ন মলম ও ধোঁয়া তৈরি করেছিলেন। এখান থেকেই পরবর্তী চিকিৎসকগণ জীবাণু ধ্বংসের জন্য ধোঁয়া (Fumigation) ব্যবহারের ধারণা পেয়েছিলেন। মুসলিম চিকিৎসকগণই প্রথম কুষ্ঠরোগ এবং চক্ষুরোগের বর্ণনা দিয়েছিলেন। তারাই বলেছিলেন টাইফয়েডের চিকিৎসায় ঠান্ডা পানি ব্যবহারের কথা।

মুসলিম চিকিৎসকগণ রোগীকে হাসপাতালে রেখে আরোগ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তারা গভীরভাবে লক্ষ করতেন রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাপনপদ্ধতি। পর্যবেক্ষণ করতেন রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রস্রাবের রং, মল, নাড়ির স্পন্দন, তাপমাত্রা, চামড়া ও নখের রং। এগুলো বর্তমানে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা হিসাবে পরিচিত।

আবু বকর রাযি প্রথম গুটিবসন্ত ও হামকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তার *আল-হাবি* গ্রন্থকে বিবেচনা করা হয় রোগীদের ওপর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিয়ে সংকলিত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্ভার। তেমনইভাবে ইবনে যুহর প্রথম পেরিকার্ডিয়ামের ফোড়া ও পেরিকার্ডিয়ামের প্রদাহ বর্ণনা করেছিলেন। ক্লিনিক্যাল ঘটনার সূক্ষ্ম বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। মুসলিম চিকিৎসকগণই প্রথম যক্ষ্মা রোগীদের নখের আকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[১২৫]

ইবনে সিনা *আল-কানুন* গ্রন্থে অন্ত্রের কৃমি সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বক্র কৃমির কারণে সৃষ্ট হেলমিনথিয়াস রোগের দিকে। এ রোগের কারণও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এই রোগের নাম দিয়েছিলেন 'রাহকান'। আর কৃমির নাম দিয়েছিলেন 'আদ-দুদাতুল মুসতাদিরাহ'। ১২৫৪ হিজরি/১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এটাই পুনরাবিষ্কার করেছিলেন ইতালির দুবিনি। ইবনে সিনা ফিলারিয়া রোগ এবং দেহে ফিলারিয়া রোগ বিস্তারের বর্ণনা

১২৫. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা*

দিয়েছিলেন। তিনি 'নারে ফারসি'[১২৬] (অ্যানথ্রাক্স) রোগের বর্ণনা দিয়েছিলেন।[১২৭]

সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষণবিশিষ্ট বিভিন্ন রোগের মধ্যে পার্থক্যসূচনার জন্য মুসলিম চিকিৎসকদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিষয়টি তাদের বেশ সহায়ক হয়েছিল। তারা পার্থক্য করেছিলেন নিউমোনিয়া ও প্লিওরাইটিসের মাঝে, প্লিওরাইটিস ও হাইটাল হার্নিয়া প্রদাহের মাঝে, ভাইরাল ও ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের মাঝে, অন্ত্র ও রেনাল কোলিকের মাঝে এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট পক্ষাঘাতের মাঝে।

মানসিক অসুস্থতা ও চিকিৎসা-সম্পর্কিত মুসলিমদের লেখা গ্রন্থাবলিতে গভীর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ছাপ দেখা যায়। পূর্ববর্তী সভ্যতার চিকিৎসকগণ মানসিক রোগ-ব্যাধিকে অপ্রাকৃতিক শক্তির অশুভ প্রভাব হিসাবে দাবি করেছেন। যেমন তারা মনে করতেন, রোগ হলো অশুভ আত্মার প্রভাব, যা মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু মুসলিম চিকিৎসকগণ মানসিক রোগের জন্য অস্বাভাবিক কোনো কারণকে দায়ী করেননি। বরং আমরা দেখতে পাই, তারা রোগীর দেহের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করেছেন ও চিকিৎসা দিয়েছেন।[১২৮]

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের দান ও অবদান ছিল এমনই কৃতিত্বপূর্ণ। সময়ের চেয়ে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে ছিলেন তারা। যুগ বিবেচনায় যা কল্পনা করাও সম্ভব না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মুসলিম সভ্যতার কাছে চিরঋণী।

❋❋❋

---

১২৬. প্রতিটি তৈলাক্ত জ্বলন্ত ক্ষয়ী ফোড়াকে 'নারে ফারসি' বলে। তড়কাজাতীয় রোগ। *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ৩/১৫৯

১২৭. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ৩/১১৮

১২৮. দেখুন, *আল-উলুম ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন, আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়্যা* (ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সংস্করণ)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালব্যবস্থা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান অগণিত। তাদের গৌরবোজ্জ্বল অগণন অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্বের প্রথমবারের মতো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব। পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর প্রায় নয় শতাব্দী পূর্বেই তারা বিশ্বের বুকে হাসপাতালব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

ইসলামি সভ্যতার প্রথম হাসপাতাল নির্মিত হয় উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে। তার শাসনকাল ছিল ৮৬ হিজরি থেকে ৯৬ হিজরি পর্যন্ত। এই হাসপাতালে বিশেষভাবে কুষ্ঠরোগীদের সেবা দেওয়া হতো।[১২৯] এরপরে মুসলিম বিশ্বে আরও অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু হাসপাতাল পৌঁছে গিয়েছিল উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে। এই হাসপাতালগুলো জ্ঞান ও চিকিৎসার দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে বিবেচিত হতো। এগুলোই ছিল বিশ্বের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ। অন্যদিকে ইউরোপের প্রথম হাসপাতাল নির্মিত হয় এরও প্রায় নয় শতাব্দী পরে; প্যারিসে।

সেই সময় হাসপাতালকে বলা হতো 'বিমারিস্তান'। কিছু হাসপাতাল ছিল স্থায়ী, আর কিছু ছিল ভ্রাম্যমাণ। স্থায়ী হাসপাতাল সাধারণত শহরে প্রতিষ্ঠা করা হতো। মুসলিম অধ্যুষিত কোনো শহর হাসপাতালশূন্য ছিল না। এমনকি ছোট ছোট শহরেও হাসপাতাল ছিল। আর ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল সাধারণত, গ্রামগঞ্জ, মরু-পাহাড় এবং দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়াত।

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল বহন করা হতো বহুসংখ্যক উটের মাধ্যমে। সুলতান মাহমুদ সেলজুকির সময়ে ৪০টি উটে হাসপাতাল বহন করা হতো। তার শাসনকাল ছিল ৫১১ হিজরি থেকে ৫২৫ হিজরি পর্যন্ত। এমন চিকিৎসা-কাফেলায় থাকত প্রচুর চিকিৎসাসরঞ্জাম, যন্ত্র ও ওষুধ। থাকতেন অনেক চিকিৎসকও। এভাবেই তারা গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সেবা দিতেন।[১৩০]

---

১২৯. *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক লিত তবারি*, ৪/২৯

১৩০. *তারিখুল হুকামা লি কিফতি*, পৃ. ৪০৫

শহরে হাসপাতালের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছিল। শহুরে হাসপাতালের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল 'আদুদি হাসপাতাল'। ৩৭১ হিজরিতে বাগদাদে এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দামেশকে নুরি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৪৯ হিজরিতে। এরপর কায়রোয় অবস্থিত 'মানসুরি' হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ৬৮৩ হিজরিতে। আশ্চর্যের বিষয় হলো মুসলিম বিশ্বের কেবল কর্ডোভাতেই ছিল ৫০টির অধিক হাসপাতাল।[১৩১]

আধুনিক হাসপাতালের মতো এসব হাসপাতালেও ছিল বিভিন্ন বিভাগ। অভ্যন্তরীণ রোগ, সার্জারি, চর্মরোগ, চক্ষুরোগ, মনোরোগ ও অর্থপেডিক বা হাড়ভাঙার চিকিৎসার জন্যও আলাদা অলাদা বিভাগ ছিল।

এই হাসপাতালগুলো কেবল রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল না; বরং ছিল যুগপৎ উচ্চশিক্ষার মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি। বিশেষজ্ঞ প্রধান চিকিৎসক—যিনি উসতায বা অধ্যাপক নামে পরিচিত হতেন—প্রতিদিন সকালে ঘুরে ঘুরে রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। তার সঙ্গে থাকত ইন্টার্ন চিকিৎসকগণ। তিনি তাদের শেখাতেন এবং কী পর্যবেক্ষণ করছেন তার নোট নিতে বলতেন। পাশাপাশি চিকিৎসার পদ্ধতিও বলে দিতেন। তারা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং শিখতেন। তারপর অধ্যাপক একটি বড় হলরুমে গিয়ে উপস্থিত হতেন। তাকে ঘিরে বসত শিক্ষার্থীরা। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ থেকে তাদের পড়ে শোনাতেন। যতটুকু পড়তেন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। প্রতিটি শিক্ষাকার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। যারা শিক্ষাকার্যক্রম শেষ করেছে তারা পরীক্ষায় অংশ নিত। বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সনদ দিতেন।

ইসলামি হাসপাতালগুলোর ভেতরে থাকত বড় বড় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, ওষুধপ্রস্তুতপ্রণালি, শারীরস্থান বা অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যাবলি, চিকিৎসাসংক্রান্ত ফিকহি বিষয়াবলি ইত্যাদি গ্রন্থ এখানে স্থান পেত। চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জ্ঞানশাখার গ্রন্থাবলিও স্থান পেত হাসপাতালের গ্রন্থাগারে।

হাসপাতালগুলোয় কত বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল তা বোঝার জন্য এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কায়রোয় অবস্থিত ইবনে তুলুন হাসপাতালের গ্রন্থাগারে ছিল ১ লাখেরও বেশি গ্রন্থ।

---

১৩১. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৩২৮-৩২৯

হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী জমিগুলোয় বড় বড় বাগান ছিল। এসব বাগানে ওষুধি বৃক্ষ ও তৃণলতার চাষ হতো। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের জন্য এসব বাগান তৈরি করা হতো।

রোগসংক্রমণ ঠেকাতে এসব হাসপাতালে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা এককথায় অনন্য ও বিস্ময়কর। কোনো রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করামাত্রই তার পরনের পোশাক পালটে নতুন পোশাক দেওয়া হতো, যেন রোগীর পরনের পোশাক থেকে কোনো রোগ না ছড়ায়। এই নতুন পোশাক দেওয়া হতো সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। তারপর যার যে রোগ, সে ওই রোগের জন্য নির্ধরিত ওয়ার্ডে প্রবেশ করত। কোনো রোগীর নির্ধারিত ওয়ার্ড ব্যতীত অন্য ওয়ার্ডে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। রোগের সংক্রমণ রোধ করতেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। প্রত্যেক রোগীই ঘুমাত নির্ধারিত বেডে। নতুন বিছানা-বালিশ ও নির্ধারিত আসবাবপত্র তার বেডে দিয়ে দেওয়া হতো।

এসব ইসলামি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নয় শতাব্দীরও বেশি সময় পরে প্যারিসে যে হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল তার সঙ্গে এগুলোর তুলনা করে দেখতে পারি আমরা। প্যারিসের হাসপাতালটিতে সব রোগীকে একই ওয়ার্ডে থাকতে বাধ্য করা হতো। রোগীদের কার কী রোগ সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ করা হতো না। শুধু তা-ই নয়, একটি বেডে তিন-চারজন রোগীকে শোয়ার জন্য বাধ্য করা হতো। কখনো কখনো পাঁচজনকেও থাকতে হতো একই বেডে। দেখা যেত, গুটিবসন্তের রোগী রয়েছে হাড়ভাঙা রোগীর পাশে এবং প্রসূতি মায়ের পাশে রয়েছে কোনো পুরুষ রোগী! চিকিৎসক ও নার্সরা নাকে কাপড় দেওয়া ছাড়া কোনো ওয়ার্ডে প্রবেশ করতে পারত না। কারণ ওয়ার্ডগুলোর ভেতরে থাকত উৎকট দুর্গন্ধ! এমনকি যেসব রোগী মারা যেত তাদেরকে কম করে হলেও মারা যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর ওয়ার্ড থেকে বের করা হতো! এমন যদি হয় সেই হাসপাতালের অবস্থা, তাহলে সেখানে যেসব রোগী চিকিৎসার জন্য যেত তাদের কী ভয়াবহ অবস্থা হতো তা একবার ভেবেই দেখুন![১৩২]

এখন আমরা আলোচনা করব ইসলামি ইতিহাসের কয়েকটি বিখ্যাত হাসপাতাল সম্পর্কে। এর মধ্যে প্রথমেই আসবে বাগদাদের আদুদি হাসপাতালের কথা। ৩৭১ হিজরিতে/৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের প্রাণকেন্দ্রে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদুদুদ দাওলা ইবনে বুওয়াইহ।

১৩২. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি মুস্তফা সিবাই*, পৃ. ১১৬-১১৭

প্রতিষ্ঠাকালে এই হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় নিযুক্ত ছিলেন ২৪জন চিকিৎসক। তারপর চিকিৎসকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একটি বিশাল গ্রন্থাগার সংযুক্ত হয় হাসপাতালটিতে। নির্মাণ করা হয় ওষুধালয়। তৈরি করা হয় একাধিক রান্নাঘর। বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের এক বিশাল দল এই হাসপাতালে কাজ করত। চিকিৎসকগণ পালাক্রমে রোগীদের সেবা করতেন। ফলে হাসপাতালে দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই চিকিৎসক থাকতেন।

আরেকটি বিশাল ইসলামি হাসপাতাল হলো দামেশকের নুরি বড় হাসপাতাল। এটি ৫৪৯ হিজরি/১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আদিল নুরুদ্দিন মাহমুদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই হাসপাতালটি ছিল বিশাল, অসাধারণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নুরি হাসপাতাল প্রায় ৮০০ বছর, অর্থাৎ ১৩১৭ হিজরি/১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোগীদের সাদরে গ্রহণ করেছে এবং চিকিৎসাসেবা দিয়েছে!

ইসলামি ইতিহাসে আরও একটি বিশাল হাসপাতালের উদাহরণ হলো মানসুরি বড় হাসপাতাল। হাসপাতালটি কায়রোয় ৬৮৩ হিজরিতে/১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বাদশাহ মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন। যথার্থতায়, ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচ্ছন্নতায় মানসুরি হাসপাতাল ছিল পৃথিবীর এক বিস্ময়। এই হাসপাতাল এত বিশাল ছিল যে এখানে দৈনিক ৪ হাজারেরও বেশি রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো!

ইসলামি সভ্যতার উল্লেখযোগ্য হাসপাতালগুলোর আলোচনায় মারাকেশের হাসপাতালের কথা না বললেই নয়। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মরক্কোর মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্যের বাদশাহ আবু ইউসুফ ইয়াকুব। তার শাসনকাল ছিল ৫৮০ হিজরি থেকে ৫৯৫ হিজরি পর্যন্ত। মারাকেশ হাসপাতালের নির্মাণশৈলী ছিল নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। নৈসর্গিক পরিবেশও এখানে তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে ছিল। হাসপাতালের এরিয়ায় সব ধরনের গাছ ও লতাগুল্ম রোপণ করা হয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল চারটি কৃত্রিম জলাশয় বা লেক। হাসপাতালটির চিকিৎসাব্যবস্থাও ছিল খুবই উন্নত। ছিল আধুনিক ওষুধপত্র ও দক্ষ চিকিৎসকবৃন্দ।[১৩৩] ইসলামি সভ্যতার ললাটে মারাকেশ হাসপাতাল ছিল সত্যিকার অর্থেই এক উজ্জ্বল তিলক।

---

১৩৩. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি-মুস্তফা সিবাই*, পৃ. ১১০-১১৮

এখানে বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর একেকটিতে নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা দেওয়া হতো। যেমন চক্ষু হাসপাতাল, কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল ইত্যাদি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অভিনব ব্যাপার এই যে, কোনো কোনো বৃহৎ মুসলিম নগরীতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাপল্লিই ছিল। আন্দালুসীয় ভূগোলবিদ ও পর্যটক ইবনে যোবায়ের তার ৫৮০ হিজরি/১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ ব্যাপারে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা খুবই বিস্ময়কর। তিনি আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাপল্লি পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা ছোট একটি শহরের সমান। এই পল্লির মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা। অট্টালিকার চারপাশে রয়েছে বাগান এবং বেশ কিছু ঘর। এ সবকিছুই রোগীদের জন্য ওয়াকফকৃত। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসাপল্লি পরিচালনা করতেন। সেখানে ছিল ওষুধ প্রস্তুতকারী (ফর্মুলেশন) বিজ্ঞানীদের দল, ছিল চিকিৎসাবিদ্যার বহু শিক্ষার্থী। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সকলের খরচ বহন করা হতো। উম্মাহর ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেসব সম্পত্তি ওয়াকফ করেছিলেন তা থেকেও আসত খরচের একটি বড় অংশ।[১৩৪]

সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শত শত হাসপাতালের মধ্য থেকে এখানে কেবল চারটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। ইউরোপ তখন ডুবে ছিল অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকারে। মুসলিম বিশ্বের হাসপাতালের উপযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উন্নত ব্যবস্থাপনা, মানবিক বোধ ইত্যাদি তাদের কিছুই জানা ছিল না। জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট ম্যাক্স মেয়েরহোফ[১৩৫] ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষের সময় ইউরোপীয় হাসপাতালের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ইসলামি সভ্যতার হাসপাতালের সাথে ইউরোপীয় হাসপাতালব্যবস্থার তুলনা করতে গেলে আমাদের মুখোমুখি হতে হয় এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার, যা আমাদের জন্য অনুমান করাও কষ্টকর। সে সময়ে নির্মিত ইউরোপের হাসপাতালগুলোর সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা কিছুটা

---

১৩৪. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি-মুসতফা সিবাই*, পৃ. ১০১

১৩৫. **ম্যাক্স মেয়েরহোফ** (১৮৭৪-১৯৪৫ খ্রি.) : জার্মান প্রাচ্যবিদ ও চক্ষুচিকিৎসক। একজন শ্রেষ্ঠ পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ। আরবি ভাষা রপ্ত ছিল তার। ১৯০৩ সালে মিশর যান এবং সেখানেই থিতু হন। কায়রোয় ইন্তেকাল করেন। ইসলামি সভ্যতার চিকিৎসা ও ওষুধবিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চা ছিল তার অত্যন্ত আগ্রহের জায়গা।

ধারণা পেতে পারি। আমাদের থেকে মাত্র তিন শতক আগেও হাসপাতাল বলতে ইউরোপে কিছুই ছিল না। এমনকি যদি বলি অষ্টাদশ শতক (১৭১০ খ্রি.) পর্যন্তও রোগীদের চিকিৎসা করা হতো তাদের বাড়িতে অথবা কিছু সেবাকেন্দ্রে, তাহলে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না। তখনও ইউরোপে হাসপাতাল ছিল দয়া ও আশ্রয়কেন্দ্রের নাম। রোগী কিংবা কর্মক্ষম, যাদের থাকার কোনো জায়গা ছিল না, তাদের আশ্রয়কেন্দ্রকে বলা হতো হাসপাতাল।

জার্মান লেখিকা সিগরিড হুংকে লিখেছেন, আধুনিক যুগের হাসপাতালগুলোয় আমরা যে উন্নত ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষানিরীক্ষার ল্যাব, ফার্মেসি আর ওষুধ সংরক্ষণাগার দেখতে পাই, তা প্রকৃতপক্ষে আরবদের প্রতিভার স্মারক ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি প্রতিটি ছোট ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুজন বড় আরব চিকিৎসক[১৩৬] এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষকের কথা।[১৩৭]

হাসপাতালসংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমি কিছু বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা পাশ্চাত্যের চেয়ে হাসপাতালব্যবস্থায় এগিয়ে ছিলাম কমপক্ষে ৯০০ বছর। আমাদের হাসপাতালগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানবিকতা, সহযোগিতা ও উদারতার ওপর ভিত্তি করে, ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই। এমনকি বর্তমানেও তাদের সেই বোধ ও প্রতীতি নেই। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় এতটা উচ্চতায় পৌঁছেছিলাম, যা পশ্চিমা সভ্যতা আজও স্পর্শ করতে পারেনি। রোগীর চিকিৎসা, ওষুধ ও পথ্য আমরা বিনামূল্যে সরবরাহ করতাম। এমনকি সদ্য সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তিকে আমরা অর্থও প্রদান করতাম, যেন কিছুদিন সে নিজের ব্যয়ভার বহন করে কাজে সমর্থ হয়ে উঠতে পারে। এমনই ছিল আমাদের মানবপ্রেম। সভ্যতার নেতৃত্বের ঝান্ডা যখন আমাদের হাতে ছিল, তখন মানবজাতির সঙ্গে আমরা এমন নৈতিক ও আদর্শিক আচরণই করেছি। কিন্তু হায়, আজ আমরা কোথায়?! আর মানবতার ফেরিওয়ালা পশ্চিমারা কোথায়?!

এ পরিচ্ছেদে আমরা তিনটি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করব—

- অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন
- রোগ প্রতিরোধে ইসলামের ব্যবস্থাপনা
- চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান এবং অমুসলিম গবেষকদের সাক্ষ্য

---

১৩৬. লেখিকা এখানে ইবনে সিনা ও রাযিকে উদ্দেশ্য করেছেন।

১৩৭. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৩৪

প্রথম অনুচ্ছেদ

অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও হাসপাতালব্যবস্থায় মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা ইসলামি সভ্যতায় মুসলিমদের চিকিৎসাসেবার আরেকটি স্বতন্ত্র দিক নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হলো মানবিক বন্ধন। সাধারণভাবে মানুষের প্রতি সম্মান এবং তাদের দুঃখদুর্দশা, রোগ-ব্যাধি এবং কষ্ট লাঘবের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয়ের মধ্য দিয়ে এই বন্ধন দৃশ্যমান হয়। মানুষ যে-ই হোক আর তার কষ্ট যা-ই হোক, সেটা এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা হয় না।

মুসলিম চিকিৎসকগণ অসুস্থদের সেবাদানের ক্ষেত্রে মানবিক বন্ধনের খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের জন্য এটি কোনো অদ্ভুত বিষয় ছিল না। কারণ ইসলামি শরিয়ার নীতিবোধই এই নৈতিক ও আদর্শিক বোধের কথা বারবার উচ্চারণ করেছে। অসুস্থ ব্যক্তিকে বিপদগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে ইসলাম। তাই যে তার পাশে দাঁড়াবে, তাকে সাহায্য করবে, তার ভয় ও শঙ্কা দূর করবে এবং তার শারীরিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট লাঘব করবে, তার জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা হলো যেকোনো উপায়ে অসুস্থ ব্যক্তির সংকট দূর করা এবং যতটুকু সম্ভব তার দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করা। তাই তো ইসলামি শরিয়া অসুস্থ ব্যক্তিকে রমজানে রোজা ভাঙার অনুমতি দিয়েছে। কারও হজ পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত বাধা থাকলে তাকে হজ না করার অবকাশ দিয়েছে; এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। যে অসুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারে না তাকে তার সুবিধামতো অবস্থায় নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছে। সে বসে অথবা শুয়ে এমনকি চোখের ইশারায়ও[১৩৮] নামাজ পড়তে

---

১৩৮. এ মতটি শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি মাজহাবের। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত ও সারা বিশ্বের অধিকাংশ ভূখণ্ডে সর্বাধিক চর্চিত হানাফি মাজহাব অনুযায়ী চোখের ইশারায় নামাজের অনুমতি নেই। তাই মাথার ইশারায় নামাজ পড়তে সক্ষম হলে মাথার ইশারাতেই নামাজ পড়বে। এর চেয়ে বেশি অক্ষম হলে চোখের ইশারায় নামাজ পড়বে না। বরং সক্ষমতা ফিরে

পারে! যে অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অক্ষম তার জন্য অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। কেউ যদি কোনো কারণে অজু বা তায়াম্মুম কোনোটাই করতে না পারে তাহলে সে এই অবস্থায়ই নামাজ পড়বে।[১৩৯] শরিয়তের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে 'ফাকিদুত তাহুরাইন' (দুটি পদ্ধতিতেই পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম) বলে!

এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদের মুহূর্তে রুগ্ন ব্যক্তি থেকে ইসলামি শরিয়া বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছে। ফলে সে জিহাদ না করলেও তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

> অন্ধের জন্য কোনো দোষ নেই, পঙ্গুর জন্য কোনো দোষ নেই, রোগাক্রান্তের জন্য কোনো দোষ নেই। [সুরা নুর : ৬১, সুরা ফাতহ : ১৭]

ইসলামি শরিয়া কেবল কিছু বিধান উঠিয়ে নিয়ে এবং ফরজ কিছু ইবাদতে রুখসত (ছাড়) দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং অসুস্থের পাশে থেকে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে এবং তার মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তির ব্যবস্থা করতে বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থকে তার বাড়িতে বা হাসপাতালে দেখতে যাওয়া মুসলিমদের একটি অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

পেলে ছুটে যাওয়া নামাজ আদায় করে নেবে। রাসুলের হাদিস থেকেও এমনটি বুঝে আসে। ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেজদা করতে সক্ষম সে যেন সেজদা করে। আর যে ব্যক্তি সেজদা করতে অক্ষম সে যেন সেজদা করার জন্য কপাল বরাবর কোনো বস্তু না ওঠায়। তবে সে রুকু-সেজদা আদায়ার্থে মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

আল-মুজামুল কাবির, ১৩৩৫৮; *নাসবুর রায়া*, ২/১৭৬; *হিদায়া*, ১/১৪১; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা*, ২৭/২৬৪

১৩৯. ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে তাকে এ অবস্থায় নামাজও পড়তে হবে, পরবর্তী সময়ে অজু বা তায়াম্মুমে সক্ষম হলে কাজাও করতে হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে তাকে নামাজও পড়তে হবে না, কাজাও করতে হবে না। হাম্বলি মাজহাবে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী সে নামাজের নিয়ত ব্যতীত নামাজের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে ও পরে অজু বা তায়াম্মুমে সক্ষম হলে কাজা পড়ে নেবে। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকেও এমনটি বুঝে আসে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পবিত্রতা ছাড়া নামাজ গ্রহণযোগ্য না। *সুনানুত তিরমিজি*, ০১; *মাআরিফুস সুনান*, ১/৩১-৩২; *রদ্দুল মুহতার*, ১/২৫২-২৫৩

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের হক ছয়টি, ...(ছয়টির মধ্যে একটি এই যে,) যখন সে অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে।[১৪০]

যে ব্যক্তি অসুস্থকে দেখতে যাবে তার জন্য জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,

«مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا»

যে ব্যক্তি অসুস্থকে দেখতে যায় তার জন্য আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, তোমার কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক তোমার আগমনের, তুমি তো জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ।[১৪১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীর সামনে ভালো ও কল্যাণের কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে বলেছেন। সে দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘজীবী হবে, এমন আশ্বাস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ»

তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে আয়ু ও রোগমুক্তির ব্যাপারে আশ্বস্ত করো।[১৪২] এটা তাকদিরে নির্ধারিত কোনো কিছু প্রতিহত করবে না বটে, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির মনকে প্রশান্ত করবে।[১৪৩]

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও মনোবলকে আসমানি বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ধৈর্যধারণ-সাপেক্ষে রোগ-ব্যাধি ও অসুস্থতা হলো পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং

---

১৪০. *সহিহ মুসলিম*, ২১৬২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৮৮৩২; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ২৪২; *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ৯২৫

১৪১. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১৪৪৩

১৪২. *ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি*, ১০/১২১-১২২; *তুহফাতুল আহওয়াযি*, ৬/২৬৩

১৪৩. *সুনানুত তিরমিজি*, ২০৮৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১৪৩৮; *আল-মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবা*, ১০৮৫১; *শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি*, ৯২১৩; *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২/ ২০৮

আখেরাতে মুক্তির কারণ। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের ওপর যেসব ক্লান্তি ও রোগ-ব্যাধি, উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা ও দুঃখকষ্ট আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিঁধে, এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[১৪৪]

আনাস রা. থেকে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে যে,

«إِنَّ اللهَ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ»

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি যদি আমার বান্দাকে দুটি অতি প্রিয় জিনিসের[১৪৫] ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে তাতে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে আমি তাকে জান্নাত দান করি।[১৪৬]

অসুস্থ মুমিন বান্দার আত্মবিশ্বাস এভাবেই পর্বতসম হয়ে যায়। সমাজে সে নিজেকে অক্ষম-অপদার্থ ও ফেলনা মনে করে না। বরং বিশ্বাস করে যে, সবাই তাকে গুরুত্ব দেয় এবং খোঁজখবর রাখে।

ইসলামের এই উন্নত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মুসলিম রোগীদের জন্য নয়, বরং যেকোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা প্রযোজ্য, তার ধর্মাদর্শ যা-ই হোক না কেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ﴾

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি...।

[সুরা বনি ইসরাইল : ৭০]

সাধারণভাবে সব মানুষই সম্মানিত। তাই কেউ অসুস্থ হলে সেবাযত্ন করতে হবে এবং রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করতে হবে, সে মুসলিম না হলেও। এক ইহুদি বালক অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।[১৪৭] এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম বুখারি রহ. তার গ্রন্থে

---

১৪৪. *সহিহ বুখারি*, ৫৩১৮; *সহিহ মুসলিম*, ২৫৭৩

১৪৫. দুটি প্রিয় জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য দুই চোখ। *ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি*, ১০/১১৬

১৪৬. *সহিহ বুখারি*, ৫৩২৯; *আল-মুজামুল আওসাত লিত তবারানি*, ২৫০; *শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি*, ৯৯৫৮

১৪৭. *সহিহ বুখারি*, ১২৯০

একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদটির নাম ইয়াদাতুল মুশরিক (মুশরিক অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া)।

এই গভীর মানবিক বন্ধনের শেকড় আমাদের মধ্যে প্রোথিত করে দিয়েছে ইসলামি শরিয়া। এর ফলেই ইসলামি সভ্যতার যুগে যুগে মুসলিম চিকিৎসকগণ রোগীদেরকে 'মানুষ' ভেবেই আচরণ করতেন, সেবা দিতেন। তাদের 'অনুভূতিশূন্য বস্তু' মনে করতেন না। অথবা এটাও মনে করতেন না যে, রোগীরা হলো টাকাপয়সা রোজগারের হাতিয়ার, তাদের থেকে টাকাপয়সা খসানোর ফন্দি বের করতে পারলেই হয়! বরং রোগীদের মনে করা হতো বিপদ্গ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষ। তাদেরকে অর্থ-কড়ি দিয়ে এবং পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করা কর্তব্য। শুধু চিকিৎসা ও সেবামূলক সাহায্য নয়; বরং মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এমন মহৎ অনুভূতি ও প্রেরণা নিয়েই মুসলিম চিকিৎসকরা রোগীদের সেবা দিতেন। ইসলামি রাষ্ট্রে ধনী-গরিব, আরব-অনারব, সাদা-কালো, শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা, মুসলিম-অমুসলিম-নির্বিশেষে সবাইকে অতি উন্নত চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। অধিকাংশ সময়ই সকলের জন্য চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রোগীদের সামাজিক অবস্থান ও স্তরভেদ যা-ই হোক না কেন, তারা সবাই একই মানের চিকিৎসাসেবা পেত।

আসুন আমরা ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার দিকটি দেখি, তাহলেই আমরা মানবিক বন্ধন সম্পর্কে একটি ধারণা পাব।

নতুন রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করামাত্রই একটি বহিঃকক্ষে (বহির্বিভাগে) তার প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হতো। তার রোগ হালকা পর্যায়ের হলে তাকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া হতো। সে চিকিৎসাপত্র দেখিয়ে হাসপাতালের ওষুধালয় থেকে ওষুধ নিয়ে যেত। রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ ও হাসপাতালে ভর্তির উপযোগী হলে তার নাম রেজিস্ট্রি করা হতো। এরপর তাকে গোসলের জন্য গোসলখানায় নেওয়া হতো। তারপর পরনের পোশাক খুলে নিয়ে একটি বিশেষ বস্ত্রভাণ্ডারে রাখা হতো। তাকে দেওয়া হতো হাসপাতালের বিশেষ একপ্রস্থ নতুন পোশাক। তারপর তাকে তার মতো রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। নতুন বিছানা-

বালিশে সজ্জিত একটি বেড পেত সে। তার মানসিক দিকটি বিবেচনা করেই এই বেডে অন্য কোনো রোগীর অবস্থানের অনুমতি ছিল না।

রোগী ইসলামি হাসপাতালে প্রবেশের পর চিকিৎসক তাকে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন সে অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হতো। তার স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য ও পথ্যও দেওয়া হতো নির্ধারিত পরিমাণে। রোগীরা সাধারণত যে ধরনের খাবার খায় তাদের সেসব খাবার খেতে বাধ্য করা হতো না। বরং উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হতো তাদের। রোগীদের খাদ্যতালিকায় ছিল খাসি, গরু, পাখি ও মুরগির গোশত। খাবারের পরিমাণের ক্ষেত্রেও কোনো কৃপণতা ছিল না। রোগীদের কষ্ট দেওয়া হতো না। বরং একজন রোগীর সুস্থতার প্রমাণ ছিল এই যে, সে এক বসায় পুরো একটি রুটি ও একটি আস্ত মুরগি খেয়ে শেষ করবে!

রোগী যখন আরোগ্যলাভের পর্যায়ে পৌঁছে যেত, তাকে আরোগ্যলাভকারীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এখানে পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের পর তাকে আরেক প্রস্থ নতুন পোশাক দেওয়া হতো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুধু তা-ই নয়, তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও দেওয়া হতো, যেন সে কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত খরচ চালিয়ে নিতে পারে! অর্থাৎ সে যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগে কাজ করতে বাধ্য না হয়। কারণ এতে তার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়তে পারে।[১৪৮]

এখন আপনার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই যে ইসলামি সমাজে দরিদ্র মানুষেরা কী পরিমাণ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। তারা জানতই যে অসুস্থ হলে এই পর্যায়ের চিকিৎসাসেবা, যত্ন-আত্তি ও সাহায্য-সহযোগিতা পাবে। এমন চিকিৎসা ও সাহায্য পেতে তাদের কপালের ঘাম ঝরানোর প্রয়োজন হতো না, প্রয়োজন হতো না কারও সুপারিশ বা মধ্যস্থতারও। আর চিকিৎসা পরিপূর্ণ করার আবেদন জানিয়ে কাকুতিমিনতি করার তো প্রশ্নই আসে না!

মহান চিকিৎসক আবু বকর রাযি তার ছাত্রদের উদ্দেশে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা কত চমৎকার। তিনি তাদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে রোগীদের সুস্থ করে তোলা; তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ নয়। তারা আমির-উমারা ও ধনী ব্যক্তিদের চিকিৎসা যতটা গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে করবে, ততটাই আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সঙ্গে

১৪৮. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি মুস্তফা সিবাই*, পৃ. ১১০

করবে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের চিকিৎসা; তারা নিজেরা বিশ্বাস না করলেও রোগীদের বোঝাবে যে তারা আরোগ্যলাভ করবে, সুস্থ হয়ে উঠবে। কেননা মানসিক অবস্থা শারীরিক অবস্থার ওপর খুবই প্রভাব ফেলে।[১৪৯]

স্বাস্থ্যসেবার এমন উন্নত ব্যবস্থা কেবল বড় বড় শহর ও নগরে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইসলামি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পেত। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো তাদের চিকিৎসাসেবা দিত। আগের অনুচ্ছেদে আমরা এসব হাসপাতাল সম্পর্কে বলেছি। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চল, ছোট পল্লি, পাহাড়ি জনপদ ও দূরবর্তী এলাকাগুলোয় ঘুরে বেড়াত।

ইসলামি রাষ্ট্র স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়েছে; পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ভিন্নতা ইত্যাদিকে আমলে নেয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে যে-কেউ এরূপ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবেন।

অসুস্থের প্রতি ইসলামের মমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বরং সমাজের সকল স্তরের প্রতিই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল। এমনকি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল জেলখানার কয়েদিরাও। অথচ তারা ছিল মুসলিম সমাজের অনিষ্টের গোড়া! এসব কয়েদিও পরিপূর্ণ চিকিৎসাসেবা পেত। কারণ তারাও মানুষ। যেকোনোভাবেই হোক, তারাও সমাজের সদস্য। তাদের যে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা তাদের সংশোধনের জন্যই; ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয়। অথচ আজকের বিশ্বে অসংখ্য কারাগারের বন্দিদের সঙ্গে এমনই আচরণ করা হচ্ছে। তাদেরকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

উজির আলি ইবনে ঈসা ইবনে জরারাহ বাগদাদের প্রধান চিকিৎসক (সিভিল সার্জন) সিনান ইবনে সাবেতকে চিঠি লিখে জানান, আমি জেলখানার কায়েদিদের ব্যাপারে ভেবেছি। তাদের সংখ্যাধিক্য এবং পরিবেশের রুক্ষতার কারণে তাদের রোগাক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই আপনার উচিত কয়েদিদের জন্য কয়েকজন চিকিৎসক নির্ধারণ করা, যারা প্রতিদিন গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, ওষুধপত্র ও পথ্য দেবেন, পুরো জেলখানা ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং অসুস্থ কয়েদিদের চিকিৎসা করবেন।[১৫০]

---

১৪৯. *তালিমুত তিব ইনদাল আরব লি আবদিল মুনয়িম*, পৃ. ২৭৯

১৫০. *তারিখুল হুকামা লি কিফতি*, পৃ. ১৪৮

মানবিকতার এই তরঙ্গ ইসলামি সভ্যতায় যুগ যুগ ধরে প্রবহমান ছিল। কারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল মুসলিম উম্মাহর উদারচিত্তে ও মুক্তহস্তে দান। এই দান ছিল অবিরাম প্রস্রবণের মতো এবং তা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যও সহায়ক। আমি এখানে জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ-ব্যবস্থার কথা বোঝাতে চাচ্ছি। অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা, যত্ন ও আপ্যায়ন এবং তাদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে ওয়াকফ-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উন্নত হাসপাতালগুলো সম্পূর্ণরূপে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন দায়িত্বশীল এসব সম্পত্তির দেখভাল করতেন। কখনো কখনো স্বয়ং বিচারকও এই দায়িত্ব পালন করতেন। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় থেকেই হাসপাতালগুলোর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো। রোগীদের প্রয়োজনীয় খরচ, চিকিৎসকদের বেতন-ভাতা, বিছানাপত্র ও খাদ্য ক্রয়, ওষুধি বাগান তৈরি, ওষুধ প্রস্তুতকরণ, সবকিছুর খরচ আসত ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে। এমনকি হাসপাতালে অনুশীলনরত মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের খরচাদিও মেটাত এ থেকে!

এই ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ নমুনা হলো কায়রোয় অবস্থিত মানসুরি বড় হাসপাতাল। বাদশাহ মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন ৬৮৩ হিজরি/১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ এবং তা মুসলিমদের মানবিক ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা উল্লেখ করা হলো। প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা জরুরি বলে মনে করছি। তা এই যে, রোগীর মন-মানসিকতা সজীব ও সতেজ রাখার কিছু অভিনব ও অভূতপূর্ব কৌশল অবলম্বন করা হতো ওই সময়। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির একটি অংশের আয় নির্দিষ্ট ছিল এমন দুজন ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য, যারা প্রতিদিন হাসপাতালে ঘুরে বেড়াবে এবং রোগীদের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাদেরই সুস্থতার কথা বলবে। অর্থাৎ তারা রোগীর পাশে থেকে নিচুস্বরে এমনভাবে কথা বলবে যে, রোগী তাদের কথা শুনতে পেলেও তাদের দেখতে পাবে না। তারা নিজেদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রোগীকে আরোগ্যলাভ ও সুস্থতার কথা জানান দেবে! ওয়াকফকৃত সম্পত্তির এই অংশটির নাম ছিল ওয়াকফ খিদায়িল মারিদ (রোগীর মনভোলানোর জন্য ওয়াকফিয়া সম্পত্তি)। রোগীর মন সতেজ ও মনোবল চাঙা করে তোলার

জন্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। ফলে দেখা যেত রোগী খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠেছে![১৫১]

রোগীদের সঙ্গে আচারব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দৃঢ় মানবিক বন্ধন ব্যক্তিগত আচরণে সীমাবদ্ধ ছিল না যে, কিছু চিকিৎসকই তা চর্চা করেছেন এবং তা কেবল জনগণের হৃদয় থেকে উৎসারিত জাতীয়তাভিত্তিক মমতা ও কল্যাণার্থে; বরং এমন আচরণ ছিল সর্বজনীন ও সামগ্রিক। রাষ্ট্রীয় নীতিই এমন আচরণের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। উম্মাহর সকল সদস্য—রাজা ও প্রজা এবং শাসক ও শাসিত সবাই—এই নীতি অবলম্বন করত। অধিকাংশ সময় খলিফা বা আমির নিজে এসে রোগীদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানসুর মুওয়াহহিদি[১৫২] সাপ্তাহিক রুটিনমাফিক মারাকেশে মানসুরি হাসপাতালে পরিদর্শনে যেতেন। প্রতি সপ্তাহে জুমার নামাজের পর হাসপাতালটি পরিদর্শন করতেন এবং রোগীদের অবস্থা দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হতেন।[১৫৩]

ইসলামি চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আরেকটি মানবিক দিক বিবেচনায় রাখা হতো। ইসলামি শরিয়া এ ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছে। তা হলো রোগীর সম্মান রক্ষা করা ও তার লজ্জা হেফাজত করা। ফলে রোগীর ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হতো। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলামি শরিয়ার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজন ছাড়া রোগীর সতর উন্মোচন করা জায়েজ নয়। পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার করতে যতটুকু অংশ উন্মোচিত করা প্রয়োজন ততটুকু উন্মোচিত করা যাবে, এর বেশি নয়। বাইরের কারও জন্য রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারগুলো দেখা জায়েজ নয়, আর যদি তারা হয় ভিন্ন লিঙ্গের তাহলে তো কথাই নেই। একইভাবে মাহরাম পুরুষের[১৫৪] অথবা অন্য নারীর (যেমন নার্স) উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোনো পুরুষ চিকিৎসক নারী রোগীর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। এটা তার জন্য কোনোভাবেই জায়েজ নয়। এ কারণেই ইসলামি

---

১৫১. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি মুস্তফা সিবাই*, পৃ. ১১২
১৫২. মরক্কোর মুওয়াহহিদি রাজ্যের সুলতান।
১৫৩. *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা লি মুস্তফা সিবাই*, পৃ. ১১৬
১৫৪. মহিলার স্বামী এবং যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম। যেমন বাবা, ভাগিনা, ভাতিজা...।

সভ্যতায় হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল।

ইসলামি চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগীদের সাথে আরও একটি মানবিক দিককে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে। শরিয়া আইন চিকিৎসাগ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীদের অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ চিকিৎসকের জন্য মহিলা রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে এবং একইভাবে নারী চিকিৎসকের জন্যও পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে। এই অনুমোদন তখনই কার্যকর হবে যখন সমলিঙ্গের অভিজ্ঞ চিকিৎসক না পাওয়া যাবে যিনি পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। যেন রোগীদের—পুরুষ হোক বা নারী—সঠিক চিকিৎসার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে না যায়। এমনকি শরিয়া এই অনুমতিও দিয়েছে যে, মুসলিম রোগী অমুসলিম চিকিৎসকের কাছেও চিকিৎসা নিতে পারবে, যখন তার যথার্থ চিকিৎসা করতে পারে এমন মুসলিম ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর হবে। রোগীদের স্বাস্থ্য ও জীবন সুরক্ষার জন্যই শরিয়ার এই অনুমতি।

যে কথাটি বলে আমরা এই অধ্যায় শেষ করতে চাই তা এই যে, ইসলামি সভ্যতায় স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলোর ভিত্তি ছিল নিখাদ ইসলামি সম্পর্ক ও মানবিক বন্ধন; ইতিহাসে যার নজির নেই। এই ব্যাপারটার সঙ্গে পাশ্চাত্যের এখনো পরিচয় ঘটেনি। ইসলামি স্বাস্থ্যসংস্থাগুলো রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, পথ্য ও খাদ্য দিত তো বটে, দরিদ্র রোগীদেরকে উট বা অন্যান্য পশু এবং নিজের খরচের অর্থও দিত। যাতে তারা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে এবং কর্মক্ষম হয়ে কাজ করে খেতে পারে।

আলোচিত সকল বিষয় হলো ইসলামের অনুপম আদর্শ, শিষ্টাচার ও নীতিমালা, যা আমাদের সামনে তুলে ধরে কুরআনের এই আয়াত,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি...। [সুরা বনি ইসরাইল : ৭০]

ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম সমাজ এই মূলনীতিকেই বাস্তবায়ন করেছে সামাজিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। ফলে সকল সৃষ্টিজীবের জীবনপ্রণালি থেকে মানবজীবন হয়েছে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি অবতীর্ণ করেছেন এমন পরিপূর্ণ শরিয়ত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

রোগ প্রতিরোধে ইসলামের ব্যবস্থাপনা

ইসলাম আগমনের পর থেকেই মুসলিমদের পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের দিকে সবসময় লক্ষ রেখেছে। মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছে জ্ঞানার্জন করতে এবং উৎসাহ দিয়েছে জীবনের সকল অঙ্গনে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে।

এরই ধারাবাহিকতায় ইসলাম রোগ প্রতিরোধ-বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে বিশেষভাবে। এর জন্য দিয়েছে অভিনব ব্যবস্থাপনা। কেবল মুসলিমজাতি নয়; বরং সকল মানবগোষ্ঠীর রোগ প্রতিরোধে ইসলামের অনুরাগ সুস্পষ্ট। কেননা কোনো রোগ সমাজে ছড়িয়ে পড়লে তা ধর্মবর্ণ বা জাতপাত বিচার করে না। সামগ্রিকভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই ইসলাম মানুষকে দিয়েছে এক অলৌকিক জীবনব্যবস্থা। এতে রয়েছে দেহ, মন ও সমাজের অনিঃশেষ সুখশান্তি আর সমৃদ্ধি। জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত ব্যবস্থাপনা কি ভুল হতে পারে?

একসময় সবকিছুতে অপরিচ্ছন্নতা আর নোংরামি ছিল ইউরোপীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি তারা শরীর ও পোশাকে জমে যাওয়া ময়লাকে সৌভাগ্য মনে করত। তারা মনে করত, ময়লা হলো শক্তিবর্ধক! বিষয়টি এত নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, তারা পুরো বছরে মাত্র একবার বা দুবার গোসল করত![১৫৫] অথচ সে সময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির শহুরে জীবনের বর্ণিল ছোঁয়া থেকে বহুদূরে মরুভূমির বুকে অবতীর্ণ হওয়া ইসলাম ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিল পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা অবলম্বন এবং নিয়মিত অজু-গোসলের প্রয়োজনীয়তা।

জানাবাত[১৫৬], ঋতুস্রাব ও প্রসব-পরবর্তী রক্তস্রাব ইত্যাদিতে গোসল করা ফরজ। ঈদের দিন ও ইহরাম-সহ অন্যান্য সময় সুন্নত। কিন্তু জুমার দিন গোসল ওয়াজিব নাকি সুন্নত, এ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ

---

১৫৫. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৪

১৫৬. জানাবাত : শরীর থেকে নাপাক পদার্থ বের হওয়ার পর শরীরের গুণগত অবস্থা।

আলেমের মতে জুমার দিন গোসল করা সুন্নত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুমার দিন গোসল করা ও মেসওয়াক করা কর্তব্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করবে।[১৫৭]

বরং তিনি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য গোসল না করার সর্বোচ্চ সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে একবার গোসল করা। গোসল করে শরীর ও মাথা পরিষ্কার করবে।[১৫৮]

কিছু ফকিহ তো গোসলের গুরুত্ব বোঝাতে গোসলের ১৭টি প্রকার বর্ণনা করেছেন! ইসলাম শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যেসব অঙ্গে রোগ-বালাই সংক্রমিত হওয়ার বা ময়লা জমার সম্ভাবনা বেশি, সেসব জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে।

মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»

আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক অজুতে তাদের মিসওয়াক করতে বলতাম।[১৫৯]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মিসওয়াকের জন্য আমাদের এত বেশি আদেশ দেওয়া হতো যে, আমরা ধারণা করেছিলাম এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে।[১৬০]

শরীরের যে-সকল স্থানে প্রচুর ঘাম হয়, ময়লা জমে ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয় সে সকল স্থান সবসময় পরিষ্কার রাখার আদেশ দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বরং এই পরিচ্ছন্নতাকে তিনি 'সুনানুল

---

১৫৭. *সহিহ বুখারি*, ৮৮০; *সহিহ মুসলিম*, ৮৪৬
১৫৮. *সহিহ বুখারি*, ৮৫৬; *সহিহ মুসলিম*, ৮৪৯
১৫৯. *সহিহ বুখারি*, ৮৮৭; *সহিহ মুসলিম*, ২৫২
১৬০. *আল-মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবা*, ১৭৯৩

ফিতরাত' তথা ইসলামের সুন্নত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি জিনিস মানুষের ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত,

১. খতনা করা

২. নাভির নিম্নের অবাঞ্ছিত লোম চেঁছে ফেলা

৩. গোঁফ ছাঁটা

৪. নখ কাটা

৫. বগলের লোম উপড়ে ফেলা।[১৬১]

মরুজীবনের রুক্ষ পরিবেশে পানির স্বল্পতা এবং ইসলামের সূচনাপর্বের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ইসলাম এমন উন্নত জীবনপ্রণালি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখান থেকেই ইসলামের সভ্যতাগত উৎকর্ষের ধারণা আমরা লাভ করতে পারি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মলমূত্র থেকে সবসময় পরিষ্কার থাকার আদেশ দিয়েছেন। এমনকি এ বিষয়ে কঠোরতাও করেছেন। একবার তিনি দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গীদের লক্ষ করে দুটি কবর সম্পর্কে বললেন—যেমনটা বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রা.—তাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনো মারাত্মক গোনাহের কারণে নয়। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অবলম্বন করত না। আরেকজন চোগলখুরি করে বেড়াত।[১৬২]

পবিত্রতা ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যগত বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র ভরতি করে না। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও

---

১৬১. *সহিহ বুখারি*, ৫৫৫০; *সহিহ মুসলিম*, ২৫৭

১৬২. *সহিহ বুখারি*, ২১৫; *সহিহ মুসলিম*, ২৪০

যদি খেতে ইচ্ছা হয় তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহার, এক-তৃতীয়াংশ পানি এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[১৬৩]

খাবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশও দিয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন,

«غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ»

খাবারের পাত্র ঢেকে রাখো। পানির মশক বন্ধ করে রাখো।[১৬৪]

ইসলামি শরিয়া আরও দূরদর্শী অনেক বিধান দিয়েছে। মানুষের দেহ ও মনের অনিষ্টকর সকল পদার্থ থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে। এজন্যই ইসলাম হারাম করে দিয়েছে মদ ও মাদকতা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্য মদ। আর প্রত্যেক মদই হারাম।[১৬৫]

এভাবেই ইসলাম মুসলিমদের মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে। নেশাগ্রস্তদের সংঘটিত দুর্ঘটনা কিংবা অপরাধ-সহ অন্যান্য ঝুঁকি থেকে রক্ষা করেছে সমগ্র মানবতাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় নেশাগ্রস্তদের সংঘটিত দুর্ঘটনা ও অপরাধের পেছনে দায়ী হলো চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়া।

নেশাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমি যা বললাম, তা পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে অশ্লীলতার ক্ষেত্রেও। ইসলাম ব্যভিচার-সহ অন্যান্য অবৈধ সম্পর্ক হারাম করেছে। এর মাধ্যমে যে কেবল মুসলিমদের স্বাস্থ্য, বংশ ও নৈতিকতা রক্ষা পেয়েছে তা নয়; বরং মুসলিম-অমুসলিম সবার সামাজিকতায় এটি ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্যই তো আমরা দেখতে পাই অমুসলিম দেশগুলোর তুলনায় মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোয় যৌনব্যাধির

---

১৬৩. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৩৩৪৯; *সহিহ ইবনি হিব্বান*, ৫২৩৬; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৭৯৪৫

১৬৪. *সহিহ মুসলিম*, ৩৭৫৫; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৪৮৭১; *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ২২৫৮; *সুনানুত তিরমিজি*, ২৮৫৭

১৬৫. *সহিহ বুখারি*, ২৩৯; *সহিহ মুসলিম*, ২০০৩

পরিমাণ অনেক কম। কারণ ইসলাম এসব ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে নিষেধ করে দিয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখনই কোনো জাতি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়বে, তখনই তাদের মধ্যে প্লেগ ও এমন মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটবে যা তাদের পূর্বপুরুষের মাঝে ছিল না।[১৬৬] এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এইডস, ইবোলার মতো মারাত্মক যৌন ভাইরাসের কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে পূর্বে ছিল না। এগুলো অস্তিত্বে এসেছে সমাজে ব্যভিচার ও অবাধ মেলামেশার বিস্তৃতির পর।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করি, ইসলাম মৃত প্রাণী খেতে নিষেধ করেছে। কারণ মৃত প্রাণী খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আজ আমরা তা জানতে পেরেছি।

একবার আমেরিকা গিয়েছিলাম। দেখলাম, তারা মৃত পশু বা পাখি না খাওয়াকে একটা সচেতনতা ও ফ্যাশন মনে করে। কারণ এতে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি আছে। এটা তারা মাত্র কয়েক বছর আগে আবিষ্কার করতে পেরেছে। অন্যদিকে ইউরোপে এখনো মৃত প্রাণী খাওয়া তেমন ক্ষতিকর হিসাবে দেখা হয় না। তাই তো আমেরিকানরা ইউরোপীয়দের ওপর নিজেদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে গর্ব করে! এই হলো তাদের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা। তাদের জ্ঞানের দৌড় দেখে একজন মুসলিম হিসাবে আমি গর্বিত।

তাদের কর্মকাণ্ড দেখে আমি মনে মনে বলেছিলাম এবং এখন আমেরিকা-ইউরোপ-সহ সকল কাফেরের সামনে বলছি যে, আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য মৃত প্রাণী হারাম করেছে চৌদ্দশ বছর পূর্বে। অথচ তোমরা তার যৌক্তিকতা সামান্য কদিন আগে বুঝতে পারলে! সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি গুপ্ত ও গুপ্ততম সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত!

এদিক বিবেচনায় আমি সিগারেটকে হারাম মনে করি। যে ধূমপান করে, আমার মতে সে পাপী। কারণ যে ধর্ম আমাদের জন্য সকল মন্দ কাজকে হারাম করে দিয়েছে, তা কখনোই ধূমপানকে বৈধতা দেবে না। ধূমপানের ফলে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং ইসলামে ফিরে এসো হে মুসলিম!

---

১৬৬. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৪০০৯; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ৮৬২৩; *শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি*, ৩৩১৫

ইসলাম কেবল শারীরিক সুস্থতার কথাই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করে না; বরং একইসাথে আত্মিক সুস্থতার প্রতিও জোর দেয়। তাই আল্লাহ তাআলার জিকির করতে আদেশ করেছে এবং আল্লাহর জিকিরকে হৃদয়ের প্রশান্তি বানিয়েছে। কুরআনে এসেছে,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

> এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো, কেবল আল্লাহর জিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। [সুরা রাদ : ২৮]

মুসলিমজাতিকে দয়া, সদাচার, শিষ্টাচার, মিষ্টি ও শালীন ভাষার অধিকারী হতে আদেশ দেয় ইসলাম। মুচকি হাসি ইসলামে সদকা হিসাবে বিবেচিত। মানুষের সাথে উত্তম আচরণে ইসলাম প্রতিদান দেয়। ইসলাম একে অপরের ভুল ক্ষমা করতে শেখায়। শেখায় আল্লাহর দেওয়া সকলকিছুতে সন্তুষ্ট থাকতে। ধৈর্যের বিনিময়ে ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব আদর্শ উত্তম হৃদয় গঠনে অত্যন্ত প্রভাবক। এ সকল সুকুমারবৃত্তি আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে, অন্তর প্রশান্ত করে। মুসলিমের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এতটা উচ্চতায় নিয়ে যায়, যা একজন অমুসলিম কল্পনাও করতে পারে না। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, মুসলিম দেশগুলোর তুলনায় অমুসলিম দেশগুলোয় মানুষের মাঝে হতাশা, মানসিক যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। মুসলিম ও অমুসলিমদের আত্মহত্যার তুলনামূলক জরিপ দেখলে ইসলামের মূল্যমান আমাদের সামনে প্রভাতের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানেই আমরা ইসলামের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

ইসলাম যেভাবে মানুষের আত্মা ও দেহের সুরক্ষার ব্যবস্থা দিয়েছে তেমনইভাবে বাহ্যিক পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সুন্দর পরিচ্ছন্ন কাপড় থেকে ব্যক্তি ও তার আশপাশের সকল লোকজন উপকৃত হয়। এমনকি যারা তাকে দেখে তারাও উপকৃত হয়, যদিও তারা তাকে না চেনে।

কুরআনে একেবারে প্রথমদিকেই নাজিল হয়েছে এই আয়াত,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখো। [সুরা মুদ্দাসসির : ৪]

প্রথম থেকেই ইসলাম একাধারে মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাকেও গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণার সঙ্গে মানুষের পরিচ্ছন্নতার আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে,

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

এবং নিজ প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখো। [সুরা মুদ্দাসসির : ৩-৪]

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতে পারি। আবার এর অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে।

ইসলামি শরিয়া কাপড়ে সামান্য নাপাকি লাগলেও অপবিত্র বলে আখ্যা দেয়। এই অপবিত্রতা দূর না করলে নামাজ বিশুদ্ধ হয় না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে প্রশ্ন করা হয়, কাপড়ে নাপাক নিয়ে যদি কেউ নামাজ আদায় করে তাহলে তার নামাজ কি বিশুদ্ধ হবে? এর উত্তরে তিনি বলেন, পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে, নাপাকি কম হোক কিংবা বেশি।[১৬৭] তেমনইভাবে পানি নাপাক হয়ে যায় এই পরিমাণ নাপাকিতে, যা পানির রং, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন করে ফেলে।[১৬৮] এসব বিধানের লক্ষ্য হলো, ময়লা, অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন বস্তু ব্যবহারে মুসলিমদের নিষেধ করা।

একজন মুসলিমের দায়িত্ব কেবল শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতায় সীমাবদ্ধ না। বরং চারপাশের পরিবেশের সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা তার আবশ্যিক দায়িত্ব। বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই।

ইসলাম রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। রোগ প্রকাশের পর সামাজিকভাবে ইসলাম শুধু রোগীকে নিরাময়ের কথাই বলেনি; বরং সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ওপরও জোর

---

১৬৭. *মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ*, পৃ. ৪১; অন্যান্য অনেক আলেম ও ফকিহ এই মত পোষণ করেন।

১৬৮. *আল-মুগনি লি ইবনি কুদামা*, ১/৫২

দিয়েছে, যাকে বর্তমানে আমরা কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধ বলে আখ্যায়িত করি।

রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নবীজির দিকনির্দেশনায় আমাদের অবাকই হতে হয়। সামাজিকভাবে যেন রোগের বিস্তার না ঘটে, এ নিয়ে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন,

«لَا يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»

কোনো রোগাক্রান্তকে যেন সুস্থের কাছে না আনা হয়।[১৬৯]

এভাবেই তিনি রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য সমাধান দিয়ে গিয়েছেন। তাও আবার চৌদ্দশ বছর আগে!

বর্তমানে বেশ কিছু গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, সেগুলো একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। তাই বিশেষভাবে এ সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«فِرَّ مِنَ المَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ»

কুষ্ঠরোগী থেকে এমনভাবে দূরে সরে যাও, যেমন সিংহ থেকে পলায়ন করো।[১৭০]

তিনি মহামারির সংক্রমণ নিরোধ নিশ্চিত করতে কোয়ারেন্টাইনের পদ্ধতিও বলে গেছেন। বলেছেন, যখন শুনবে, কোনো এলাকায় মহামারি প্রবেশ করেছে, তখন সেখানে প্রবেশ করবে না। কিন্তু তোমরা যদি সেই এলাকায়ই থাকো, তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।[১৭১] বর্তমান যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞান মহামারি নিরোধে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছে।

রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য ইসলাম যে পদ্ধতি বলে দিয়েছে, তার সূক্ষ্ম বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একে জুড়ে দিয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নামের ভয়ের সাথে। ইসলামি জীবনবোধের উদ্দেশ্য নিছক পার্থিব জীবনের সুখ অর্জন নয়, যদিও এটা আল্লাহর ইচ্ছায় নিজে

---

১৬৯. *সহিহ বুখারি*, ৫৪৩৭; *সহিহ মুসলিম*, ২২২১

১৭০. *সহিহ বুখারি*, ৫৩৮০; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৯৭২০; *আল-মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবা*, ২৪৫৪৩; *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*, ১৩৫৫০

১৭১. *সহিহ বুখারি*, ৫৩৯৬; *সহিহ মুসলিম*, ২২১৮

নিজেই অর্জিত হয়ে যায়। ইসলামি মূল্যবোধ ও বিধানের উদ্দেশ্য এর চেয়েও বহু ঊর্ধ্বে। আর সেটা হলো আখেরাতে চিরসুখ অর্জন।

মুখের পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও মিসওয়াকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»

মিসওয়াক করলে মুখ পরিষ্কার হয় এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।[১৭২]

এটা কেবল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যই নয়, এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে প্রতিদান ও সওয়াবের নিশ্চয়তা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অজু-গোসলের পবিত্রতা সম্পর্কে বলেছেন, (আবু মালেক আশআরি রা. থেকে বর্ণিত)

«الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ»

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[১৭৩]

এখানে নবীজি পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক ঘোষণা করেছেন!

কোয়ারেন্টাইন পালনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি মহামারি ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে চেষ্টা করবে, তার জন্য হাদিসে নববিতে ঘোষণা করা হয়েছে শহিদের সম্মান। আয়েশা সিদ্দিকা রা. একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহামারির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। নবীজি উত্তর দিয়েছিলেন, মহামারি হলো একটি আজাব। আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা এটি পতিত করেন। মুমিনদের জন্য এটিকে আল্লাহ তাআলা রহমত বানিয়ে দেন। মহামারি ছড়িয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ নিজের দেশে ধৈর্য ধরে বসবাস করতে থাকে এবং বিশ্বাস করে, আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া তার কোনো কিছু হবে না, তাকে আল্লাহ শহিদের মর্যাদা ও সওয়াব প্রদান করবেন।[১৭৪]

রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গির এই হলো কিছু দৃষ্টান্ত।

---

১৭২. *সুনানুন নাসায়ি*, ৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ২৮৯; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৭; *সুনানুদ দারিমি*, ৬৮৪; *সহিহ ইবনি খুজাইমা*, ১৩৫

১৭৩. *সহিহ মুসলিম*, ২২৩; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২২৯৫৩; *সুনানুদ দারিমি*, ৬৫৩

১৭৪. *সহিহ বুখারি*, ৫৪০২; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৪৪০৩

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান এবং অমুসলিম গবেষকদের সাক্ষ্য

পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম গবেষক ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ, অগ্রগতি এবং অনস্বীকার্য অবদান ও উন্নতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এগুলো নিছক মুখের কথা ছিল না; বরং এই সাক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত তারা দিয়েছেন মুসলিমদের ঐতিহ্য এবং জ্ঞান-গবেষণা সম্পর্কে দীর্ঘ পর্যালোচনা ও গভীর অধ্যয়নের পর। ইসলামি সভ্যতার চিকিৎসাব্যবস্থা ও মুসলিমদের রচিত গ্রন্থাবলির প্রশংসা ও বন্দনায় যত কথা বলা হয়েছে তা থেকে আমরা এখানে যৎসামান্য তুলে ধরছি। এসব থেকেই আমরা সুস্পষ্ট ধারণা পাব যে, ইসলামি সভ্যতার চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে!

স্কটিস প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট লিখেছেন, ইসলামি সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অনেক মনীষী ছিলেন ইসলামি সভ্যতায়। ইবনে সিনা সাধারণত মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসাবে বিবেচিত। একইসাথে তিনি ছিলেন একজন মহান চিকিৎসক। তেমনইভাবে ইবনে রুশদ ছিলেন মহান দার্শনিক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিচারপতি। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে রচনা করেছেন বেশ কিছু গ্রন্থ।[১৭৫]

ফরাসি প্রাচ্যবিদ ও গণিতের ইতিহাস রচয়িতা লুই সডিও[১৭৬] লেখেন, সামগ্রিক বিবেচনায় আরবের চিকিৎসকগণ ছিলেন অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী। তাদের অনেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন

১৭৫. মন্টগোমারি ওয়াট, *ফাদলুল ইসলাম আলাল হাযারাতিল গারবিয়্যা*, পৃ. ৫৩

১৭৬. **লুই সডিও :** ফ্রান্সের সেন্ট লুইস কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ। গণিত ও আরবি ভাষায় দক্ষ। আরবদের গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূগোল নিয়ে তিনি কিছু গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। তার জন্ম-মৃত্যু প্যারিসে (১৮০৮-১৮৭৫ খ্রি.)। তিনি আলি মারাকিশির *জামিউল মাবাদি ওয়াল গায়াত ফিল আলাতিল ফালাকিয়া* গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

বখতেশু ইবনে জিবরাইল। তিনি তার বিস্ময়কর চিকিৎসাক্ষমতার কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তবে আবু বকর রাযি এবং ইবনে সিনার সমপর্যায়ে কেউ পৌঁছতে পারেনি। দীর্ঘকাল তাদের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্যসূচিতে রাজত্ব করেছে।[১৭৭]

জার্মান-মিশরীয় চক্ষুবিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসা-ইতিহাসবিদ ম্যাক্স মেয়েরহোফ বলেন, বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্র খ্রিষ্টান-মাজুসি-সহ অন্যান্য জাতির হাত থেকে মুসলিমদের হাতে স্থানান্তরিত হওয়া শুরু হলো। তাদের সিংহভাগই ছিলেন পারস্যদেশীয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তারা প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করে বিশ্বকোষ তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে সন্নিবেশিত করেছেন সকল প্রাচীন অভিজ্ঞতা। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে সেগুলো মুসলিমরা বিচারবিশ্লেষণ করেছেন।[১৭৮]

ফরাসি ঐতিহাসিক ডোমিনিক সোর্ডেল[১৭৯] লেখেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরব চিকিৎসাবিদগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন রোগ নির্ণয়ে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে। আবু বকর রাযি নিঃসন্দেহে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চিকিৎসক। তিনি রায় শহরে বসবাস করতেন। তার পর্যবেক্ষণক্ষমতা ছিল অসাধারণ। দুটি বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য মৌলিক অবদান রয়েছে।

১. গুটিবসন্ত নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

২. *কিতাবুল হাবি* যা চিকিৎসাশাস্ত্রের বৃহৎ একটি বিশ্বকোষ।

পরবর্তীকালে এই বিশ্বকোষের স্থান দখল করে নেয় ইবনে সিনার *আল-কানুন* গ্রন্থটি। এ ছাড়াও আরব সভ্যতা জন্ম দিয়েছে প্রখ্যাত সার্জারি বিশেষজ্ঞ আবুল কাসেম জাহরাবি, চিকিৎসক ইবনে যুহর, ইবনে রুশদ, ইবনে

---

১৭৭. লুই সডিও, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫

১৭৮. আর্নল্ডের সম্পাদনায় প্রকাশিত *তুরাসুল ইসলাম* নামক গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ আল-উলুম ওয়াত তিব, পৃ. ৪৬২-৪৮৮; *আল-ইসলাম ফি উয়ুনিন গারবিয়্যা মুনসিফা*, পৃ. ২৩৪-২৩৫

১৭৯. **ডোমিনিক সোর্ডেল :** দামেশকের প্রাক্তন ফরাসি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

মাইমুন প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য চিকিৎসক। খ্রিষ্ট ও ইউরোপীয় আধুনিক চিকিৎসায় যাদের গভীর প্রভাব বিদ্যমান।[১৮০]

জার্মান লেখক সিগরিড হুংকে আবু বকর রাযি সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ছিলেন মহান চিকিৎসক। সূক্ষ্ম ও লক্ষ্যভেদী দৃষ্টির অধিকারী। উদারচিত্ত ও মানবিক। তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যেমন এগিয়ে ছিলেন তেমনইভাবে এগিয়ে ছিলেন মানবিকতায়। গ্রিক চিকিৎসকগণ চিকিৎসার অঙ্গনে যে আদর্শিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল, তা তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।[১৮১]

ফরাসি ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লি বোঁ লিখেছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞান আরবদের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাস্ত্র। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের রয়েছে অনবদ্য সব আবিষ্কার। আরবদের গ্রন্থাবলি অনূদিত হয়েছে সমগ্র ইউরোপে। সেসব গ্রন্থের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই নির্ভুল, যেমন তাদের অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থগুলো নির্ভুল।[১৮২]

জার্মান গবেষক পিটার ব্যুরমান বলেছেন, বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রতিটি শাখায় মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের অবদান ফুটে উঠেছে অনবদ্যরূপে। এজন্যই আমি 'মধ্যযুগে ইসলামি চিকিৎসাবিজ্ঞান' নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছি । তিনি আরও বলেছেন, এই গ্রন্থ আমি এজন্যই লিখেছি যে, একজন জার্মান খ্রিষ্টান হিসাবে আমি মনে করি, আমাদের সভ্যতার একাংশ ইসলামি সভ্যতা ও ইতিহাসের কাছে চিরঋণী। আমি এটাই মূলত ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। সারা বিশ্ব, বিশেষত ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইসলাম ও মুসলিমদের গভীর প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য। তবুও কিছু মানুষ তাদের অবদান অস্বীকার করতে চায়। আমি এবং আমার গবেষণা সহকর্মী এমিলি সাভেজ স্মিথ[১৮৩] মধ্যযুগে চিকিৎসাব্যবস্থায় মুসলিমদের অবদান ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো নিয়ে গবেষণা করে খুঁজে বের করেছি... ইসলামি হাসপাতালগুলো ছিল ওয়াকফ মন্ত্রণালয়েরই একটি অংশ। এই হাসপাতালগুলো মানুষকে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে চিকিৎসাসেবা প্রদান করত। সেখানে ইহুদি, মাজুসি, অগ্নিপূজক, জরথুস্ত্র

---

১৮০. ডোমিনিক সোর্ডেল, *আল-ইসলাম*, পৃ. ১৫৭

১৮১. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ২৫৩

১৮২. *হাযারাতুল আরব*, পৃ. ৪৮৮

১৮৩. **এমিলি সাভেজ স্মিথ** : ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধীন সেন্ট ক্রস কলেজের বিশেষজ্ঞ।

সকলেই সেবা নিত। ইসলামি হাসপাতাল কাউকেই চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করত না। এটি ছিল মূলত অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের উদারতা ও উত্তম আচরণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যেসব রোগের প্রতিকারে মুসলিমগণ নতুন আবিষ্কার এনেছেন, সে সম্পর্কে পিটার ব্যুরমান বলেন, অনেক রোগেরই প্রতিরোধে তারা নতুন ব্যবস্থাপনা নিয়ে এসেছেন, বিশেষত মেলানচোলিয়া রোগের চিকিৎসায়।[১৮৪]

মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ হাওয়ার্ড আর টার্নার[১৮৫] বলেন, মুসলিম চিকিৎসকগণ সার্জারি ও ফার্মাকোলজি বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শনের পাশাপাশি তারা মধ্যযুগে বড় বড় শহরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশাল বিশাল হাসপাতাল। এই হাসপাতালগুলো আকারে, অভিজ্ঞতায় ও সেবা দানে পূর্বের সকল প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে যায়। ছাড়িয়ে যায় মুসলিম বিশ্বের বাইরে প্রতিষ্ঠিত সকল চিকিৎসালয়কেও।[১৮৬]

ইংরেজ প্রাচ্যবিদ আলফ্রেড গিলিয়াম বলেন, গুণগত বিবেচনায় সালেরনো ছিল তৎকালের মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাগত ধারায় আরব চিকিৎসা-প্রভাব উল্লেখযোগ্য হারে লক্ষণীয়। যদিও এই প্রভাবটা সৃজনশীল ছিল না, বরং অনুকরণ ও গ্রহণগত ছিল।[১৮৭]

স্যার উইলিয়াম অসলার বলেন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তুলনায় ইবনে সিনার *আল-কানুন* গ্রন্থটি দীর্ঘকাল একক দলিল-গ্রন্থ হিসাবে সম্মান পেয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষ ৩০ বছরে এই গ্রন্থের ১৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল! ইবনে সিনার রচনাবলি চিকিৎসাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানবিপ্লবে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে, যা কার্যত শুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এটি পূর্ণতা লাভ করে।[১৮৮]

---

১৮৪. *আল-আখরাবুল মিসরিয়্যা* পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, তারিখ : ১৩/৪/২০০৭ খ্রি.
১৮৫. **হাওয়ার্ড আর টার্নার :** আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
১৮৬. *আল-উলুম ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৬৭
১৮৭. গিলিয়াম, আল-ফালসাফাতু ওয়া ইলমুল কালাম, আর্নল্ডের *তুরাসুল ইসলাম* গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪
১৮৮. *ইউনেস্কো ম্যাগাজিন*, ১৯৮০ খ্রি.

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডোনাল্ড আর হিল[১৮৯] বলেন, মধ্যযুগে ইউরোপে আরবি গ্রন্থগুলো বেশ প্রসিদ্ধি ও সমাদৃতি লাভ করেছিল। এমনকি অনেক আরবি নাম পরিবর্তিত হয়ে গ্রহণ করেছিল লাতিন রূপ। ইবনে সিনা হয়ে উঠেছিল আভিসিনা (Avicenna), আল-বাত্তানি হয়ে উঠেছিল আলবাতিনুস (Albatenius)। এমন উদাহরণ ভূরিভূরি।[১৯০]

জার্মান প্রাচ্যবিদ প্লেসনার মার্টিন বলেন, এ পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে ইসলামি জগতের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছি। তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যায়। এর আগে যেখানে উদ্ভিদ নিয়ে আভিধানিক ও শব্দতাত্ত্বিক স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ ছিল না সেখানে মুসলিম গবেষকগণ উদ্ভিদের চাষ-উৎপাদন ও ভেষজ গুণাবলি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৯১]

❋❋❋

১৮৯. **ডোনাল্ড আর হিল :** সমকালীন পশ্চিমা গবেষক এবং আরবি জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ। অনেক মুসলিম বিদ্বান ও গবেষকের রচিত গ্রন্থ তিনি নিরীক্ষা করেছেন। এ ছাড়া তিনি সভ্যতা বিনির্মাণে প্রকৌশল, রসায়ন, গণিত ও নির্মাণশাস্ত্রে মুসলিমদের জ্ঞানগত গবেষণা তুলে ধরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯০. ডোনাল্ড আর হিল রচিত *আল-উলুম ওয়াল হান্দাসা ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়া, লাবিনাতুন আসাসিয়্যাতুন ফি সারহিল হাযারাতিল ইনসানিয়্যা*, অনুবাদ : আহমাদ ফুআদ পাশা, *সিলসিলাতু আলামিল মারিফা*, পৃ. ২৯০

১৯১. প্লেসনার, *আল-উলুমুত তাবিয়িয়া ওয়াত তিব*, পৃ. ১৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞান

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের নিকট চিকিৎসাবিজ্ঞান কেবল রোগীর রোগ আরোগ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মুসলিমগণ এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের নতুন দ্বারও উন্মোচন করেছেন। পূর্ববর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের লেখালেখির বলয়ে তারা আবদ্ধ থাকেননি। জীবন্ত অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানই ছিল তাদের কষ্টিপাথর। ফলে মুসলিমগণ রোগপ্রতিরোধবিদ্যা থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্যান্য বিজ্ঞানের দিকে সফলভাবে যাত্রা করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব বিজ্ঞান নিয়ে আমরা নিচের শিরোনামে আলোচনা করব।

- ফার্মাকোলজিতে মুসলিমদের অবদান
- উদ্ভিদবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান
- প্রাণিবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান
- জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা
- প্যারাসাইটোলজি বা পরজীবীবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফার্মাকোলজিতে মুসলিমদের অবদান

মুসলিমগণই হলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ফার্মাকোলজির জনক, এ কথা শুনে যে-কেউ স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত হবে। কিন্তু সত্য কথা হলো মুসলিমগণই ফার্মাকোলজির জনক। ফার্মাকোলজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্সের ইতিহাসে ফার্মাকোলজি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। কারণ রোগীর সেবায় ওষুধ ও চিকিৎসা একটি অপরটির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই আমরা এই অধ্যায়ে মুসলিম সমাজে ফার্মাকোলজির চর্চা নিয়ে কথা বলব। মানবতার হাতে মুসলিমজাতি ফার্মাকোলজির কী উপহার তুলে দিয়েছেন, তা আমরা দুটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

- মুসলিমগণই ফার্মাকোলজির জনক
- ফার্মাকোলজিতে মুসলিমদের অবদান

❀❀❀

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুসলিমগণই ফার্মাকোলজির জনক

ফার্মাকোলজি মুসলিমদের উদ্ভাবিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখা। এ শাখায় মুসলিমগণ সৃজনশীলতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, পৃথিবী তার চাক্ষুষ সাক্ষী। মূলত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তারা একে অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন। ফার্মাকোলজি হলো এমন শাস্ত্র যেখানে ওষুধ, দেহের ওপর ওষুধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ওষুধ তৈরির পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এটি এমন এক বিজ্ঞান, যা উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কেননা বেশিরভাগ ওষুধ তৈরিতে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর প্রয়োজন হয়। তেমনইভাবে এটি রসায়নের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ ওষুধের কার্যকারিতায় রাসায়নিক সমীকরণ ও নীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। চিকিৎসাবিজ্ঞান রোগনির্ণয় করে দেয় এবং চিকিৎসাপদ্ধতি বলে দেয়। কিন্তু ওষুধ প্রস্তুতকারক ব্যতীত এসব বর্ণনা নিষ্ফল। তাই ফার্মাকোলজি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক।

সত্যি কথা হলো ফার্মাকোলজি মুসলিম চিকিৎসকদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম চিকিৎসকগণ কার্যকর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যৌগিক ওষুধ প্রস্তুতের নবযুগের শুভ সূচনা করেন। ফলে তারা ফার্মাকোলজির ব্যাপক চর্চা ও সাধনার প্রথম যুগ হিসাবে অন্যান্য সভ্যতা থেকে পার্থক্যরেখা টেনে দিতে সক্ষম হন। তাই আমরা নিঃসংকোচে দাবি করতে পারি মুসলিম চিকিৎসকগণই ফার্মাকোলজির জনক। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সামনে আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, ফার্মাকোলজি আরব ইসলামি কেন্দ্রভূমি থেকে উৎসারিত বিজ্ঞান।[১৯২] পূর্বে ওষুধের যেসব ধারণা প্রচলিত ছিল, সেগুলোর সংস্কার করে মুসলিমগণ নতুন রূপ দিয়েছেন। সমৃদ্ধ

১৯২. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাযারাতুল আরব*, পৃ. ৪৯৪

করেছেন এবং নতুনত্ব এনেছেন। মুসলিম চিকিৎসকগণই ফার্মাকোলজির প্রথম গ্রন্থটি রচনা করেছেন।[১৯৩]

অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা ব্যথা উপশম ও কিছু রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অল্পকিছু ওষুধি গাছের কার্যকারিতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তারা হয়তো প্রাণীদের থেকেই অভিজ্ঞতা ধার করে থাকবেন। প্রাণীরা অসুস্থ হলে যেসব গাছ-লতাপাতা খায় সেসব ওষুধি গাছ তারা নিজেদের বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। তবে তাদের এই পদ্ধতির কোনো উৎস, নীতিমালা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না।

মধ্যপ্রাচ্যের সুমেরীয় সভ্যতার মৃত্তিকার একটি ফলক পাওয়া যায়, যা ছিল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের। এই ফলককে ওষুধ সম্পর্কিত তথ্যের প্রথম রেকর্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই ফলকে ১২টি প্রেসক্রিপশন রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি মিশরীয় পেপিরাস কাগজে সাত শতাধিক ওষুধের নাম দেখা যায়। প্রাচীন চীন ও রোমানরাও অনেক ওষুধ ব্যবহার করত। ফার্মাকোলজি ও ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ বর্ণনায় রোমানদেরকে অগ্রদূত হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

প্রাচীন সভ্যতার চিকিৎসকরা যদিও অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তাদের বেশিরভাগ চিকিৎসাই সফলতার মুখ দেখেনি। অনেক ওষুধ মূলত কার্যকরও ছিল না। তাদের কথিত ওষুধ সেবনের কিছুদিন পর আপনা-আপনি রোগ সেরে গেলে তারা ধরে নিত ওষুধের মাধ্যমেই রোগ সেরেছে। তবে তাদের সময়েও বেশ কিছু উপকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছিল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরা ব্যথার উপশম করতে ব্যবহার করত আফিম। প্রাচীন মিশরীয়রা কোষ্ঠ

কাঠিন্যের নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করত ভেন্নার তেল (castor oil)। রক্তস্বল্পতার চিকিৎসায় চীনারা কলিজা খাওয়ার পরামর্শ দিত।[১৯৪]

মানুষের এই করুণ অবস্থা দেখে মুসলিম চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যগত বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। প্রকৃত ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে তারা উদ্যোগী

---

১৯৩. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩০৬

১৯৪. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যা*, http://www.mawsoah.net

হন। পবিত্র কুরআনে কিছু প্রতিষেধকের দিকে ইঙ্গিতও রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

﴿وَ اَوۡحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِیۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعۡرِشُوۡنَ ۙ﴿۶۸﴾ ثُمَّ کُلِیۡ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُکِیۡ سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا ؕ یَخۡرُجُ مِنۡۢ بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِیۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ﴾

তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এই নির্দেশ সঞ্চার করেন যে, পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে নিজ ঘর তৈরি করো। তারপর সব রকম ফল থেকে নিজ খাদ্য আহরণ করো। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেই পথে চলো। (এভাবে) তার পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয়, যার ভেতর মানুষের জন্য আছে শেফা। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সকল ব্যক্তির জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে।

[সুরা নাহল : ৬৮-৬৯]

এই চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে মূলত মুসলিম মন-মানস আগ্রহী হয়ে ওঠে ওষুধ ও প্রতিষেধকের গবেষণায় এবং বিভিন্ন রোগের সমাধানে।

বিভিন্ন হাদিসে ওষুধ গ্রহণের ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তখন থেকেই মুসলিমদের জন্য জরুরি হয়ে গেছে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করা। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক বেদুইন জিজ্ঞাসা করেছিল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি ওষুধ গ্রহণ করব? নবীজি উত্তর দিয়েছিলেন,

«تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ»

তোমরা ওষুধ গ্রহণ করো। কারণ আল্লাহ প্রতিটি রোগের জন্যই ওষুধ দিয়েছেন। তবে বার্ধক্য এমন একটি রোগ যার কোনো ওষুধ নেই।

আসেম ইবনে উমর রহ. বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর মুখে শুনেছি, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যদি তোমাদের কোনো ওষুধে কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে, তাহলে তা

আছে শিঙা লাগানোর মধ্যে, কিংবা মধুপানে অথবা আগুন দিয়ে দাগ লাগানোর মধ্যে। তবে আমি আগুনে দাগ দেওয়া পছন্দ করি না।[১৯৫]

বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে এই হাদিস মুসলিমদের প্রেরণার বাতিঘর। প্রতিটি রোগের জন্য আল্লাহ তাআলা যে প্রতিষেধক নির্ধারণ করেছেন, তা আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় কোনো কমতি ছিল না মুসলিমদের।

❁❁❁

১৯৫. *সহিহ বুখারি*, ৫৩৫৯; *সহিহ মুসলিম*, ২২০৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ফার্মাকোলজিতে মুসলিমদের অবদান

মুসলিমরা পূর্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্চয় ছাড়াই ফার্মাকোলজিতে যাত্রা শুরু করেননি। ফার্মাকোলজি বিষয়ে গ্রিক চিকিৎসকগণ যা লিখে গিয়েছেন, তারা সেগুলো আত্মস্থ করেছেন। কিন্তু সেগুলো বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং এর বিকাশ ও বিবর্তনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ফার্মাকোলজির অভিনব রূপ দিয়েছেন। তারা গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন ডায়োসকোরাইডস লিখিত *আল-মাদ্দাতুত তিব্বিয়া ফিল হাশাইশ ওয়াল আদভিয়াতিল মুফরাদা*। বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে *On Medical Material* নামে। এই বইয়ের একাধিক অনুবাদ করেছিলেন আরবরা। প্রসিদ্ধ দুটি অনুবাদ হলো, বাগদাদের হুসাইন ইবনে ইসহাকের অনুবাদ এবং কর্ডোভায় আবু আবদুল্লাহ সিকিল্লির অনুবাদ।

পরবর্তীকালে মুসলিম চিকিৎসকগণ নিজেদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই বইটি পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছেন। যুগের সীমাবদ্ধতার দরুন এতে ডায়োসকোরাইডস যা তুলে আনতে পারেননি, সেগুলো মুসলিমগণ তুলে এনেছেন বিবর্তিত যুগের প্রেক্ষাপটে। প্রচুর লেখালেখি হয় ফার্মাকোলজি ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে। আবু হানিফা দিনাওয়ারি (মৃ. ২৮২ হি./৮৯৫ খ্রি.) লেখেন *মুজামুন নাবাত* নামক বিশ্বকোষ, ইবনে ওয়াহশিয়া (মৃ. ৩১৮ হি./৯৩০ খ্রি.) লেখেন *আল-ফিলাহাতুন নাবাতিয়া* (*The Nabataean Agriculture*), ইবনুল আওয়াম ইশবিলি লেখেন *আল-ফিলাহাতুল আন্দালুসিয়া*। আধুনিক যুগের উদ্ভিদবিজ্ঞানের রচয়িতাগণ এসব গ্রন্থ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে।[১৯৬]

ফার্মাকোলজি বিজ্ঞানের জনক মুসলিমগণ। এর পেছনে মুসলিমদের স্থানীয় প্রচেষ্টার ভূমিকা ছিল। কেননা গ্রিক, হিন্দি ও পারসিক গ্রন্থাবলি থেকে বিভিন্ন

---

১৯৬. ফাজিল আব্বাসি, *আত-তুরাসুল আরবি* ম্যাগাজিন, শিরোনাম *আস-সাইদালানিল আন্দালুসি আবুল আব্বাস আন-নাবাতি*, জুলাই ১৯৮৪, দামেশক।

ওষুধি গাছের নাম অনুবাদের সময় তারা অধিকাংশ ভেষজ গাছের পরিচয় ভালোভাবে জানতে পারেননি। আর যেসব ওষুধের পরিচয় জানতে পেরেছেন, সেগুলোর বিস্তারিত কার্যকারিতা ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারেননি। এজন্য স্থানীয়ভাবে তাদের বিকল্প ওষুধ ও ভেষজ গাছ খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যার মাধ্যমে এই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। তারা বিকল্প ওষুধি উদ্ভিদ আবিষ্কার করেন এবং নতুন নতুন ওষুধ সামনে আনেন। তারা নতুন নতুন এমন ওষুধের ব্যাপারে গ্রন্থনা করেন, যা গ্যালন ও ডায়োসকোরাইডস প্রমুখ চিকিৎসক আলোচনা করেননি। এ ক্ষেত্রে পারস্য ও হিন্দুস্তানের ওষুধগুলো থেকে তারা বেশ উপকৃত হয়েছেন। তবে স্থানের বিবেচনায় বিকল্প ওষুধের প্রয়োজনীয়তা ছিল একটি অর্থনৈতিক—এমনকি সামাজিক প্রয়োজনও বটে। অবশ্য আরব ফার্মাকোলজিস্টদের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করে আল-বিরুনি বলেছেন, কোনো ডায়োসকোরাইডস যদি আমাদের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করত তাহলে নতুন নতুন ওষুধের খোঁজে আমাদের মরু-পাহাড় চষে শেষ করে ফেলত। দেখা যেত প্রতিটি ঘাস-লতা-পাতা-গুল্মই হয়ে উঠেছে ওষুধের উৎস।[১৯৭]

এমন অভিযোগ অনেক আরব ফার্মাকোলজিস্টের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হানে। তারা আঞ্চলিক গাছ-লতা-পাতা নিয়ে আরও গভীরভাবে গবেষণা শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে তারা বিভিন্ন গাছের নাম সংকলন করেন। এখান থেকেই মূলত গড়ে ওঠে বড় বড় ওষুধি বিশ্বকোষ, যেগুলোর মধ্যে প্রায় প্রতিটি গাছের ওষুধি গুণাগুণগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলোর নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে আরবি, গ্রিক, ফার্সি ও বার্বারি ভাষায়।

এ ক্ষেত্রে প্রায়োগিক প্রচেষ্টা করেছেন রশিদুদ্দিন সুরি (মৃ. ৬৩৯ হি./১২৪১ খ্রি.)। তিনি গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে যেতেন। তার সাথে থাকত একজন চিত্রশিল্পী। রশিদুদ্দিন চিত্রকরকে প্রথমবার দেখাতেন উদ্ভিদের প্রাথমিক অবস্থা, যা মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছে, দ্বিতীয়বার দেখাতেন উদ্ভিদের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, যখন ফল বা বীজ বেরিয়েছে এবং তৃতীয়বার দেখাতেন ফলে যাওয়া অবস্থায়। চিত্রকর তিনবারই উদ্ভিদটির ছবি এঁকে নিতেন।[১৯৮]

---

১৯৭. *আস-সাইদালাতু ইনদাল মুসলিমিন*

১৯৮. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/ ২১৯

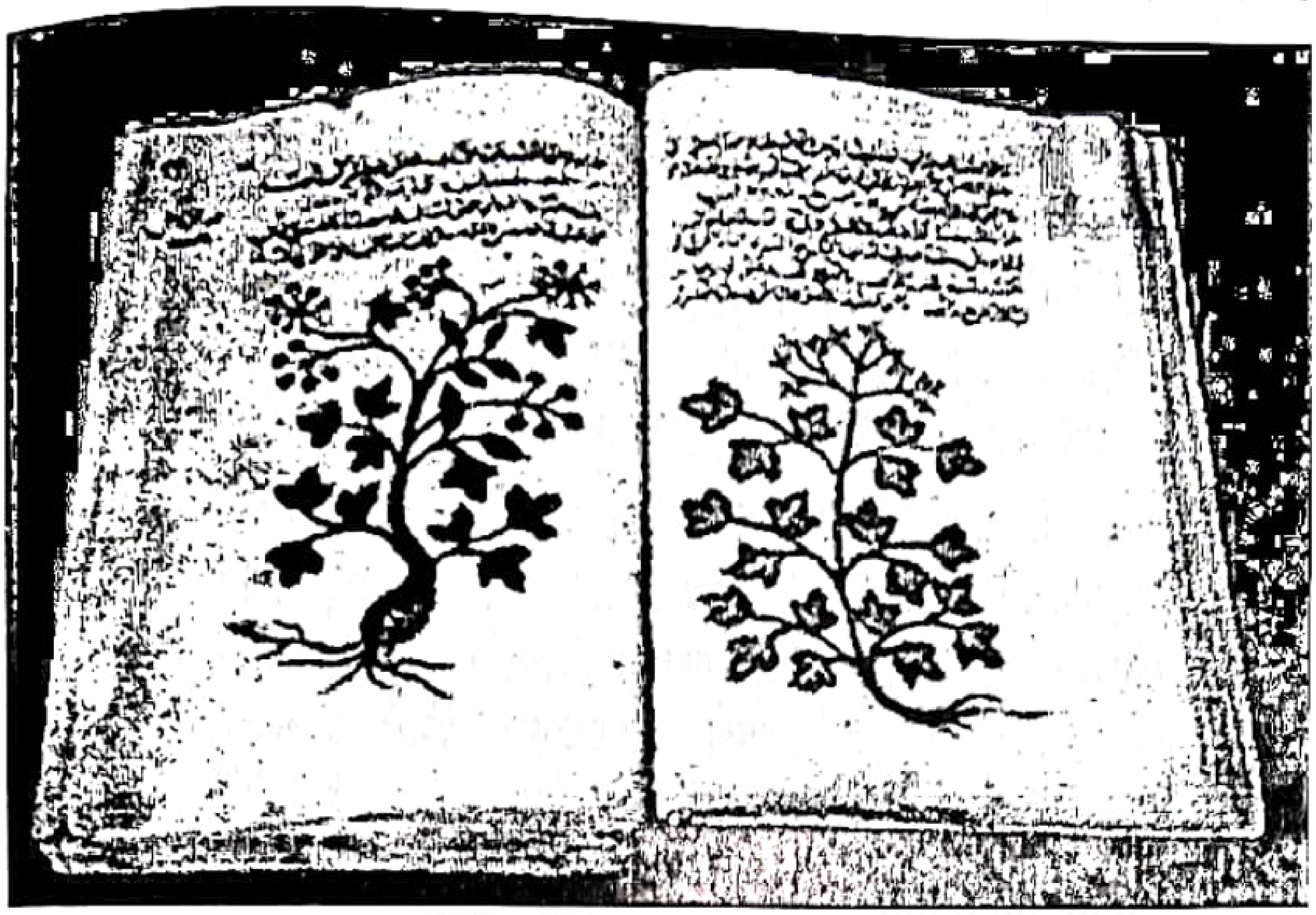
ফার্মাকোলজির সূচনায় মুসলিমদের সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, তারা এতে জবাবদিহির নীতি ও ওষুধ তত্ত্বাবধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন।[১৯৯] একসময় ফার্মাকোলজি ছিল উন্মুক্ত পেশা। যার খুশি সেই এই পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু মুসলিমগণ পেশাটিকে স্বাধীন ব্যবসা থেকে গুটিয়ে এনে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের অধীনে ন্যস্ত করেন। ফলে যে-কেউ ওষুধ তৈরি ও বিতরণের পেশায় নিয়োজিত হতে পারত না। এটা খলিফা মামুনের যুগের কথা। তিনি এই আইন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর অবশ্য যৌক্তিক কারণও ছিল। উন্মুক্ত ধারায় সুবিধার তুলনায় বেশি ছিল অসুবিধা। এমন অনেক অসৎ ফার্মাকোলজিস্ট জন্ম নিচ্ছিল যারা নকল ওষুধ তৈরি করে জনগণের সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করে যাচ্ছিল আর মানুষের অর্থসম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছিল। তাদের কেউ দাবি করত, তার কাছে সকল রোগের ওষুধ আছে! তাই যেভাবে পারত, রোগীর জন্য ওষুধ বানিয়ে দিত। আর বেচারা রোগী কি ওষুধের খবর জানে? ওষুধ সম্পর্কে রোগীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা এই কাজটি করত।

এজন্য খলিফা মামুন ফার্মাকোলজিস্টদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর খলিফা মুতাসিম (মৃ. ২২৭ হি.) এসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ফার্মাকোলজিস্টদের জন্য সার্টিফিকেটের পদ্ধতি চালু করেন। সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকত যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওষুধ তৈরি বৈধ। এভাবে ফার্মাকোলজির বিষয়টা রাষ্ট্রের অধীনে এবং তত্ত্বাবধানে চলে আসে।

এই ব্যবস্থা ইউরোপেও চলে আসে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের শাসনামলে (১২১০-১২৫০ খ্রি.)। এর ধারা এখনো বিদ্যমান। স্প্যানিশ ভাষায় বর্তমানেও ব্যবহৃত হয় 'মুহতাসিব' শব্দটি, যা মূলত আরবি। মুহতাসিব হলেন নগরের একজন সরকারি কর্মকর্তা, যিনি ঘুরে ঘুরে তার শহরের ফার্মেসিগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালি তত্ত্বাবধান করেন। প্রতিটি নগরেই একজন করে মুহতসিব থাকত।

---

১৯৯. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩১২



চিত্র নং-৪
ইবনে বাইতারের গ্রন্থ

এভাবেই ফার্মাকোলজি লোককথানির্ভর বিদ্যা থেকে রূপ নেয় স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের নেশায় তারা গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ অঞ্চলে চলে যান। সেখানে তারা কর্মের উর্বর ক্ষেত্র খুঁজে পান। ভেষজ উদ্ভিদ-লতা-পাতা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ করতে শুরু করেন। শাসকদের তত্ত্বাবধানে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট ভূমিতে তারা এসব উদ্ভিদের চাষাবাদ করেন। এজন্য প্রয়োজনীয় বীজ ফার্মাকোলজিস্টদের তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ মহৎ কাজটি করেছিলেন কর্ডোভার শাসক প্রথম আবদুর রহমান।

ফার্মাকোলজির ব্যবস্থাপনাগত শৃঙ্খলার জন্য প্রতিটি বড় শহরে একজন পরীক্ষক থাকতেন। তিনি ফার্মাকোলজিস্টদের পরীক্ষা নিতেন। যেমন কায়রোয় পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ইবনে বাইতার। মূলত পরীক্ষা হতো রোগীর জন্য ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লেখাকে কেন্দ্র করে। এই পরীক্ষার কাগজের নাম শামে ছিল 'দস্তুর', মরক্কোয় 'নুসখা' আর ইরাকে বলা হতো 'ওয়াসফা'। এভাবেই মুসলিমগণ প্রথম ফার্মাকোলজিকে স্থাপিত করেছিলেন নিরেট

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানির্ভর পদ্ধতির ওপর। সরকারিভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল।[২০০]

ফার্মাকোলজির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় সিনান ইবনে সাবিতের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর ওষুধের মান-পরিমাণ, গঠন-উপকরণ নিয়মিত পরীক্ষার অধীনে নিয়ে আসেন। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার প্রতিটি ফার্মেসি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন।

ওষুধের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। যেমন আগুনে পোড়ানো, গুঁড়ো করা, বিভিন্নভাবে রং, ঘ্রাণ ও স্বাদের পরীক্ষা করা ইত্যাদি। নতুন ওষুধ প্রস্তুতের পর অনেক চিকিৎসক মানুষের দেহে প্রয়োগের আগে পশুপাখির দেহে এর পরীক্ষা চালাতেন। যেমন চিকিৎসক আবু বকর রাযি পারদের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন বানরের ওপর। ইবনে সিনা প্রত্যেক ওষুধের সাথে ওষুধের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দিতেন। এটি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই আবুল মিনা কোহেন আত্তার রচিত *মিনহাজুদ দুক্কান ওয়া দাসতুরুল আয়ান ফি আমালি ওয়া তারাকিবিল আদভিয়াতিন নাফিয়াতি লিল আবদান* গ্রন্থে। ইবনে সিনা ওষুধের গুণাগুণ একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। অধ্যায়টির নাম 'ইমতিহানুল আদভিয়াতিল মুফরাদা ওয়াল মুরাক্কাবা ওয়া যিকরু মা ইউসতামালু মিনহা ওয়ামা লা ইউসতামালু' (মৌলিক ও যৌগিক ওষুধের পরীক্ষা ও ব্যবহারযোগ্য ও অযোগ্য ওষুধের বর্ণনা)। এই অধ্যায়ে কোহেন আত্তার ওষুধের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ পরীক্ষার নীতিমালা, ওষুধের মেয়াদ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন ওষুধে কীভাবে ভেজাল দেওয়া হয় এবং ওষুধের ভেজাল বের করার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও রাসায়নিক পদ্ধতি কী।[২০১]

ফার্মাকোলজি বিকাশের সাথে সাথে মুসলিম চিকিৎসকগণ ওষুধের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেন। স্থানীয় পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ওষুধি গাছের পরিমিত মিশ্রণে তারা তৈরি করেন যৌগিক ওষুধ। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারে রসায়নবিজ্ঞানের কল্যাণে তারা উৎকর্ষে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এই ওষুধগুলো ছিল বিভিন্ন রোগের আরোগ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। যেমন অ্যালকোহল নিঃসারণ, পারদের মিশ্রণ, অ্যামোনিয়া লবণের নিষ্কাশন এবং

---

২০০. *আস-সাইদালাতু ইনদাল মুসলিমিন*

২০১. *আস-সাইদালাতু ইনদাল মুসলিমিন*

পানীয়, ইমালসন এবং ছত্রাকের নির্যাস আবিষ্কার ইত্যাদি ছিল ওষুধবিজ্ঞানের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর পাশাপাশি বিস্তর গবেষণা তাদের নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। একইসাথে তারা নতুনভাবে অনেক পরিচিত গাছের ওষুধি গুণাগুণ আবিষ্কার করেছিলেন, যা পূর্বে জানা ছিল না। যেমন কর্পূর, তরমুজ ও মেহেদির ওষুধি গুণাগুণ।[২০২]

ফার্মাকোলজি বিষয়ে ব্যাপক লেখালেখি, নতুন ওষুধ আবিষ্কারের নিরলস অনুসন্ধান বিদ্যমান ওষুধ-সহ অন্যান্য ওষুধের উপাদানগত মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এই মানদণ্ড মূলত লেখক ও ফার্মাকোলজিস্টরা বিবেচনা করেছেন। যার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই আবু বকর রাযি রচিত *আল-হাবি*, আল-বিরুনির *আস-সাইদালাতু ফিত তিব*, আলি ইবনে আব্বাসের *কামিলুস সিনাআ*, ইবনে সিনার *আল-কানুন* গ্রন্থগুলোয়।

একটি উদাহরণ দিই। আবু বকর রাযি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন ফার্মাসিউটিক্যাল বিজ্ঞানের মূলনীতি। তিনি বিভিন্ন ওষুধের বিবরণ তুলে ধরেছেন। প্রস্তুতপ্রণালি উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন ওষুধের ভেজাল নিরূপণ পদ্ধতি ও কার্যকারিতা জানার পদ্ধতি। কাঙ্ক্ষিত ওষুধ না পাওয়া গেলে বিকল্প ওষুধের কথা তিনি বলে দিয়েছেন। এমনকি ওষুধ সংরক্ষণের মেয়াদকালও তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন।

আবু বকর রাযি ওষুধকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. খনিজ পদার্থসমূহ দুই. উদ্ভিদজাত উপকরণ তিন. প্রাণিজ উপকরণ চার. বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি যৌগিক ওষুধ। প্রথম ভাগের অধীনে আবার সাতটি প্রকার এনেছেন।

আবু বকর রাযির মতো আল-বিরুনি, ইবনে সিনাও এ বিষয়ে লিখে গিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান।

ওষুধ প্রস্তুত ও সংশ্লেষণে মুসলিম চিকিৎসকগণ সৃজনশীল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিছু মূলনীতি এখনো প্রচলিত। রাযির পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ :

১. **পাতন :** কোনো তরল পদার্থ শোধনের জন্য তাপ প্রয়োগ করে বাষ্পে পরিণত করার পর ঠান্ডা করে পুনরায় তরল পদার্থে পরিণতকরণ।

---

২০২. *উলামাউল আরব ওয়ামা আতাওহু লিল হাযারা*, পৃ. ২৭

২. **সংমিশ্রণ** : অন্যান্য খনিজ পদার্থের সাথে পারদ মিশ্রিত করার প্রক্রিয়া।

৩. **পরিশোধন** : ভেজাল অপসারণের প্রক্রিয়া।

৪. **ঊর্ধ্বপাতন** : কঠিন পদার্থ তরল না করে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তর করা। তারপর তাপ রহিত করে পুনরায় কঠিন অবস্থায় পরিণত করার প্রক্রিয়া।

৫. **সম্প্রসারণ** : স্ফীতিশীল বস্তু ঘনীভূত করা।

৬. **ধাতু নিষ্কাশন** : খনিজমল থেকে অপদ্রব্য অপসারণ করে ধাতু নিষ্কাশন করা।

৭. **তাশমি (ceration)** : গলনের মাধ্যমে একাধিক পদার্থের সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া।

৮. **ভস্মীকরণ** : পদার্থ থেকে জল অপসারণ ও পরিশোধন করে গুঁড়োয় রূপান্তর করা।

৯. **স্ফটিকীকরণ** : দ্রবীভূত পদার্থ থেকে স্ফটিক আলাদা করার কৌশল।

১০. **পরিস্রাবণ** : তরল পদার্থে থাকা অপদ্রব্য অপসারণ করে বিশুদ্ধ তরল পদার্থ প্রাপ্তির কৌশল।[২০৩]

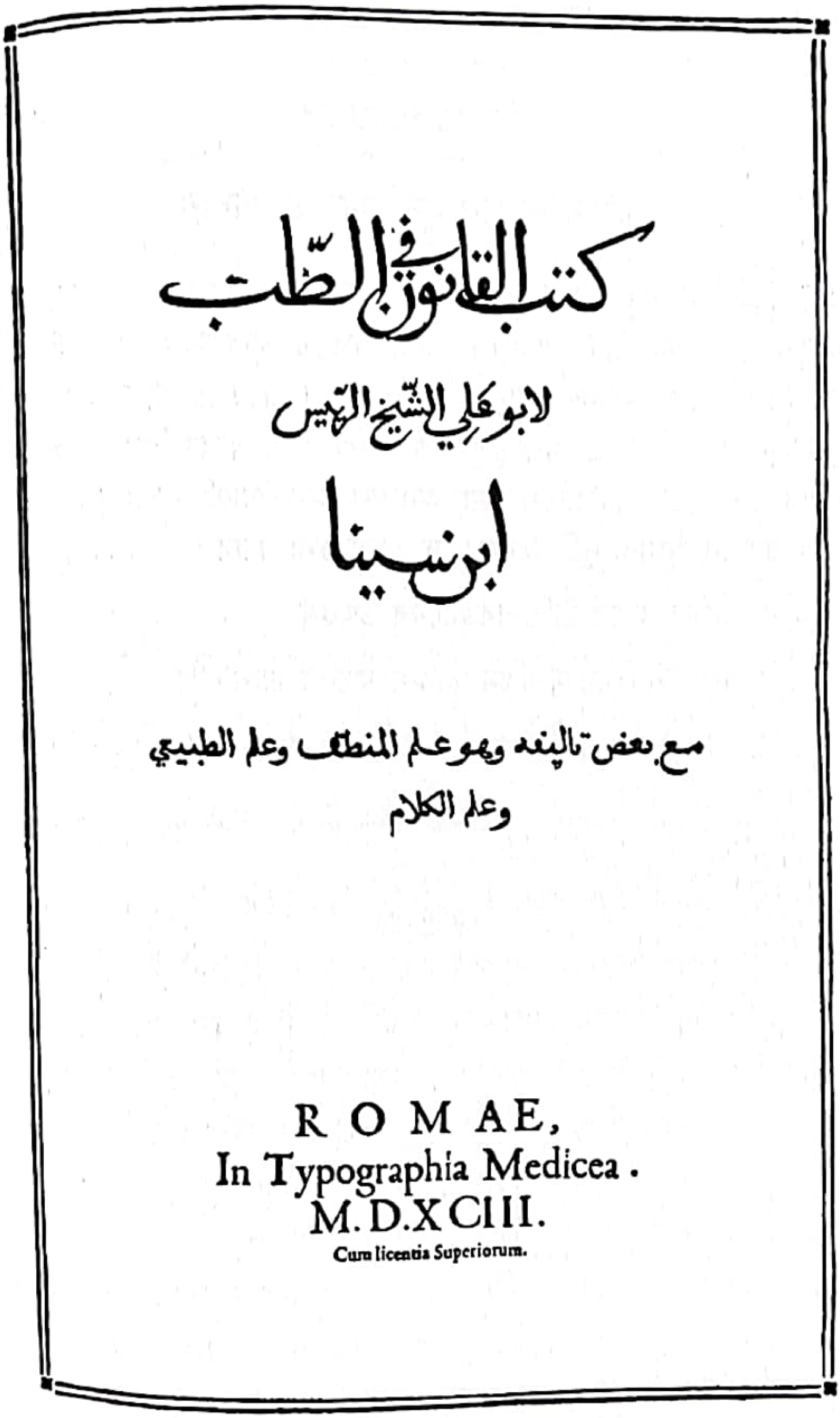
ওষুধ মিঠে করা ছিল মুসলিম চিকিৎসকদের অন্যতম এক উদ্ভাবন। ওষুধ সাধারণত তেতো বা পানসে হয়। কিন্তু একে মিঠে করতে ইবনে সিনা-সহ অন্য ফার্মাসিস্টরা ওষুধের সাথে মধু, চিনি অথবা মিঠাইজাতীয় পদার্থ মিশিয়ে দিতেন, যেন তা উপাদেয়রূপে গ্রহণ করা যায়।

এগুলোকে তারা ট্যাবলেট আকারে তৈরি করতেন এবং ওষুধের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে ব্যবহার করতেন মোড়ক। বর্তমানে প্রচলিত ক্যাপসুলের ধারণার সূচনা বলতে গেলে ইবনে সিনার হাতেই। তিনিই প্রথম ওষুধ দানাকারে সংরক্ষণের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য দিয়ে মোড়ানোর পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। জাহরাবি প্রথম বিশেষ ছাঁচে মেডিসিন থেকে ট্যাবলেট তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিলেন।[২০৪]

---

২০৩. *উলামাউল আরব ওয়ামা আতাওহু লিল হাযারাহ*, পৃ. ২৭

২০৪. *আল-উলুম ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৭৬



كتب القانون في الطب

لابو علي الشيخ الرئيس

ابن سينا

مع بعض تاليفه وهو علم المنطق وعلم الطبيعي
وعلم الكلام

ROMAE,
In Typographia Medicea.
M.D.XCIII.
Cum licentia Superiorum.

চিত্র নং-৫

ইবনে সিনার রচিত *আল-কানুন ফিত তিব*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায় প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন। তাদের এই অবদান ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এজন্যই তাদের কর্মপ্রচেষ্টা থেকে সকল মানুষ উপকৃত হয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান ছিল মুসলিমদের মাঝে চর্চিত গুরুত্বপূর্ণ এক বিজ্ঞান। ব্যবহারিক চিকিৎসায় ও মেডিসিন তৈরিতে উদ্ভিদবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। তাই উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কে এখানে আমরা দুটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

- মুসলিমদের হাতে উদ্ভিদবিজ্ঞানের উৎকর্ষ
- উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে মুসলিম চিকিৎসকদের রচনাবলি

❁❁❁

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুসলিমদের হাতে উদ্ভিদবিজ্ঞানের উৎকর্ষ

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে মুসলিমগণ উদ্ভিদবিজ্ঞানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাজিলকৃত কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্ভিদের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, প্রকার ও শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে। পৃথিবীতে বিদ্যমান গাছগাছালির আলোচনা যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে আখেরাতে বিদ্যমান গাছগাছালির আলোচনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِيٓ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّ
جَنّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا إِلٰى
ثَمَرِهٖٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾

আর আল্লাহ তিনিই, যিনি (তোমাদের জন্য) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গত করেছি, তারপর তা থেকে সবুজ গাছপালা জন্মিয়েছি, যা থেকে আমি থরে থরে বিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের মাথি থেকে (ফল-ভারে) ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং জাইতুন ও আনারও। তার একটি অন্যটির সদৃশ ও বিসদৃশও। যখন সে বৃক্ষ ফল দেয়, তখন তার ফলের প্রতি ও তার পাকার অবস্থার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করো। এসবের মধ্যে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে। [সুরা আনআম : ৯৯]

জান্নাতের উদ্ভিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۝ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۝ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾

আর ডানদিকের দল; কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! (তারা আয়েশে থাকবে) কাঁটাবিহীন কুলগাছের মাঝে এবং কাঁদিভরা কলাগাছ, সুদূর বিস্তৃত ছায়া, প্রবহমান পানি এবং প্রচুর ফলমূলের ভেতর, যা কখনো শেষ হবে না এবং যাতে কোনো বাধাও দেওয়া হবে না।

[সুরা ওয়াকিআ : ২৭-৩৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্ভিদগত বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন মুসলিমদের। ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ»

একধরনের গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। আর সেই গাছটি হলো মুমিনের উদাহরণ। আমাকে বলো, সেই গাছটির নাম কী?

এই কথা শুনে সাহাবিগণ মরুভূমির বিভিন্ন গাছ নিয়ে ভাবতে থাকল। ইবনে উমর রা. বলেন, আমার মনে হলো, উদ্দিষ্ট গাছটি আসলে খেজুর গাছ। কিন্তু জনসম্মুখে সেটা বলতে আমার লজ্জা হলো। এরই মধ্যে সম্মিলিতভাবে সবাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবদার করে বসল, আমাদেরকে বলে দিন, সেটা কোন গাছ? তিনি বললেন,

«هِيَ النَّخْلَةُ»

খেজুর গাছ।[২০৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের বিভিন্ন উদ্ভিদের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّامِ»

কালোজিরা সাম ছাড়া সকল রোগের ওষুধ।

---

২০৫. *সহিহ বুখারি*, ৬২; *সহিহ মুসলিম*, ২৮১১

আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, সাম কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«اَلْمَوْتُ»

মৃত্যু।[২০৬]

এখান থেকে আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারি, উদ্ভিদ নিয়ে মুসলিমদের আগ্রহ এবং ইসলামের পক্ষ থেকে অনুপ্রেরণা কেমন ছিল। মুসলিমদের স্বাভাবিক একটি প্রবণতা ও অভ্যাস হলো, জ্ঞানবিজ্ঞানের যে ময়দানেই তারা পদচারণা করেছেন, সে ময়দানের পূর্ববর্তীদের সকল জ্ঞান-গবেষণা ও লেখাপত্র নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন। তারা উপকৃত হয়েছেন পূর্বসূরিদের থেকে। তারপর পূর্ববর্তীদের অসমাপ্ত কাজ তারা শুরু করেছেন। কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং পূর্ণতা দিয়েছেন। যেন বিশ্বের বিজ্ঞানীদের যৌথ অবদান থেকে যুগ যুগ ধরে মানবতা উপকৃত হতে পারে।

এজন্যই উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার একেবারে শুরুতে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ গ্রিক উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলি অনুবাদের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। তারা অনুবাদ করেছেন অ্যারিস্টোটল ও তার শিষ্য থিওফ্রাস্টাসের গ্রন্থাবলি। থিওফ্রাস্টাস উদ্ভিদজগৎকে বৃক্ষ (Trees), গুল্ম (Shrubs), উপগুল্ম (Undershrubs) এবং বীরুৎ (Herbs) এই চার ভাগে বিভক্ত করেন। তার যুগে বিদ্যমান সিংহভাগ উদ্ভিদের নাম তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন *আসবাবুন নাবাত* গ্রন্থে। এজন্য থিওফ্রাস্টাসকে উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। মুসলিমরা আরও অনুবাদ করেছেন রোমান বিজ্ঞানী প্লিনি দ্য এল্ডারের *ন্যাচারাল হিস্ট্রি*। এটি ২৭ খণ্ডের বিশাল বিশ্বকোষ। মুসলিমদের হাতে আরও অনূদিত হয়েছে বিখ্যাত গ্রিক পণ্ডিত ডায়োসকোরাইডস লিখিত *মেডিসিনাল ম্যাটারিয়াল*; অনুবাদ করছিলেন *আল-হাশাইশ* নামে। আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (শাসনকাল : ২৩২-২৪৭ হি.) আদেশে এই অনুবাদটি করেছিলেন বাগদাদের খ্রিষ্টান পণ্ডিত ইসতিফান ইবনে বাসিল।

আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি, সকল ক্ষেত্রে সভ্যতার রূপান্তরে কতটা অনুরাগী ছিল ইসলামি রাষ্ট্র। এমনইভাবে মুসলিমগণ অমুসলিমদের উপকারী জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণে ছিলেন উদারচিত্ত। অমুসলিম বিজ্ঞানীর সঙ্গেও তারা

---

২০৬. *সহিহ বুখারি*, ৫৩৬৩

মার্জিত ও ভদ্রোচিত আচরণ করেছেন। তাদের পারস্পরিক লেনদেন ছিল সহজ ও বোঝাপড়া ছিল অকৃত্রিম। অমুসলিমরা লেখক বা অনুবাদক যা-ই হোক না কেন, মুসলিম শাসকবৃন্দ উদারচিত্তে তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন।

স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে ইসতিফান ইবনে বাসিল *মেডিসিনাল ম্যাটারিয়াল*-এর কিছু পরিভাষা অনুবাদ করেননি। এরপর প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও অনুবাদকর্মটি পরিপূর্ণতা পায়নি। অবশেষে এই বইটির পরিপূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল আন্দালুসীয় খলিফা আবদুর রহমান নাসিরের আমলে। তার শাসনকাল ছিল ৩০০ হিজরি থেকে ৩৫০ হিজরি। কনস্টান্টিনোপলে রোমের সম্রাট কনস্টান্টাইন সপ্তম এই বইটির একটি অনুলিপি মুসলিম খলিফাকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই মুসলিম খলিফা বিখ্যাত ছিলেন বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে। এই অনুবাদ কাজের জন্য আবদুর রহমান নাসির নিযুক্ত করেছিলেন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে, যারা আরবি ও গ্রিক উভয় ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল *মেডিসিনাল ম্যাটারিয়াল* নামক মূল্যবান গ্রন্থটির বিশুদ্ধ অনুবাদ করা। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন হয় ৩৩৭ হিজরিতে। মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা লাভ করে।[২০৭]

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যে কেবল অনুবাদ আর অনুলিপিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি তা বলাই বাহুল্য। বরং অনুবাদ ও রূপান্তর ছিল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক একটি পর্যায় মাত্র। এর পরবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থগুলোর ওপর টীকাভাষ্য, ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হতে থাকে। প্রতিটি বিষয়ে গবেষণা হয়। বারবার পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কিছু তথ্য-উপাত্ত সঠিক হিসাবে বিবেচিত হয় আর কিছু ভুল প্রমাণিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচনা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। একইসাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাখাগত জ্ঞান রচনা করেন যা ইতিপূর্বে রচিত হয়নি।

মজার বিষয় হলো, আরব সভ্যতায় উদ্ভিদ সম্পর্কিত লেখালেখি শুরু হয় মূলত ভাষাতাত্ত্বিক ও অভিধানবেত্তাদের মাধ্যমে। অভিধান রচনা করতে তো একটি ভাষার সকল শব্দ নিয়েই কাজ করতে হয়। আর তাতে উদ্ভিদ ও

২০৭. *ইলমুন নাবাত ইনদাল আরব, মাওসুআতুল হাযারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়া লি আবদিস সালাম মুহাম্মাদ নুওয়াইহি*, পৃ. ১৫৪-১৫৫

উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকারের নাম তো অবশ্যই থাকে। কাজের এই জায়গা থেকেই তারা মূলত উদ্ভিদবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। উদ্ভিদের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা সম্ভবত প্রথম সম্পন্ন হয়েছে মুসলিম ভাষাতাত্ত্বিক আবদুল মালিক ইবনে জুরাইজ বসরির হাতে, ১৫৫ হিজরিতে। এরপর এই ধারায় অবদান রাখেন প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ খলিল ইবনে আহমাদ। তিনি স্বরচিত *আল-আইন* অভিধানে প্রচুর উদ্ভিদের নাম একত্র করেছেন। পরবর্তী সময়ে এই ধারায় আরও গবেষণা করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক ইবনুস সিক্কিত, *আস-সিহাহ* অভিধানের লেখক জাওহারি, *আল-মুখাসসাস* গ্রন্থের লেখক ইবনে সিদা, *লিসানুল আরব* গ্রন্থের লেখক ইবনে মানযুর।[২০৮]

এই ধারায় নতুন সংযোজন এনেছেন ভাষাতাত্ত্বিক হিশাম ইবনে ইবরাহিম কারমানি (২১৬ হি.)। তিনি উদ্ভিদজগৎ নিয়ে *আন-নাবাত* নামে স্বতন্ত্র একটি অভিধান রচনা করেছেন । অভিধান রচনা করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জাহিয। নিঃসন্দেহে জাহিয ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আর ভাষা ও সাহিত্যের বিবেচনায় তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। প্রাণিবিজ্ঞানেও তার বিশেষ দখল ছিল। তবে উদ্ভিদবিজ্ঞানে তিনি বেশ কিছু অবদান রেখেছেন। উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে তিনি *আয-যারউ ওয়ান নাখল* নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২০৯]

সময়ের সাথে সাথে উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখিতে মুসলিমগণ আরও একধাপ অগ্রসর হলেন। এই ধারায় এগিয়ে এলেন আবু হানিফা দিনাওয়ারি (২৮২ হি.)। তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে বিবেচিত। তার গ্রন্থের নাম *আন-নাবাত ওয়াশ শাজার*। এই গ্রন্থে তিনি ১১২০টিরও অধিক উদ্ভিদের পরিচয় দিয়েছেন। উদ্ভিদ সম্পর্কে তার বর্ণনাগুলো খুবই গভীর ও সূক্ষ্ম।

এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। 'ইসহিকান' নামে অপরিচিত একটা গাছের বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে, লতাজাতীয় এই গাছটি মাটির ওপরে রশির মতো প্রসারিত হয়ে ছেয়ে যায়। এর রয়েছে তিক্ত রাখালশসার মতো পাতা। তবে পাতাগুলো আরও চিকন। রয়েছে মটরশুঁটির মতো ধারালো আঁশের চামড়া। তবে আঁশগুলো তুলনামূলক ছোট। এই গাছে লাল

[২০৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬২

[২০৯]. *মিন মাআলিমিল হাযারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২২০-২২১

রঙের গোল গোল দানা হয়। সাইয়াটিকা রোগের চিকিৎসায় গাছটি ব্যবহৃত হয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি অপরিচিত একটা উদ্ভিদের পরিচয় তুলে ধরছেন শসা ও মটরশুঁটির মতো পরিচিত গাছের মাধ্যমে যেন পাঠক ও শিক্ষার্থীদের জন্য চিনতে সুবিধা হয়। পাশাপাশি তিনি তুলে ধরছেন গাছের ভেষজ গুণাগুণ। যেমন তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন ইসহিকান গাছটি সাইয়াটিকা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এভাবে আলোচনার ফলে তার গবেষণা নিছক তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, যে তাত্ত্বিকতা মানুষের বাস্তব জীবনে কাজে আসে না। বরং তার গবেষণা হয়ে উঠেছে চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও কার্যকরী একটি গ্রন্থ।[২১০]

চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে সিনা। পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক, ফকিহ ও রসায়নবিদ। এসবের পাশাপাশি তিনি উদ্ভিদের—চাই তা বইয়ের পাতায় হোক কিংবা পৃথিবীর বুকে—অবস্থা নিয়েও পড়ালেখা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। বিশেষত সেসব উদ্ভিদ নিয়ে, যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়। কেননা এর মাধ্যমেই কেবল তার পেশাদারি পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

ইবনে সিনা ভেষজ উদ্ভিদের সূক্ষ্ম বিবরণ দিয়েছেন, যা চিকিৎসাশাস্ত্রে তার জ্ঞানগভীরতা ও পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত বহন করে। তিনি উদ্ভিদের শিকড়, পাতা, ফুল, ফল এবং সমশ্রেণির অন্যান্য উদ্ভিদের সাথে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা দিয়ে কয়েকটি তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন।

পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলির অধ্যয়নে নিজেকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখেননি। আতর প্রস্তুতকারক ও ফার্মাসিস্টদের সংগ্রহে থাকা শুষ্ক উদ্ভিদগুলোর গবেষণাতেও সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তিনি নিজে সজীব উদ্ভিদের অনুসন্ধানে ছুটে গিয়েছেন বনজঙ্গলে। উদ্ভিদের উৎপাদনস্থলে তিনি গিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে ফলাফল বের করার চেষ্টা করেছেন। কখনো তিনি গিয়েছেন মরুভূমিতে এবং দূরদূরান্তের বনবাদাড়ে। এর মধ্য দিয়ে তিনি উদ্ভিদের উৎপাদনস্থলে

২১০. *মাওসুআতু আবাকিরাতিল ইসলাম লি মুহাম্মাদ আমিন ফারুখ*, ৫/১৯৭

গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন এবং উদ্ভিদজগৎ সম্পর্কে অতি স্পষ্ট একটি ধারণা নিতে সক্ষম হয়েছেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইবনে সিনার অবদান প্রকাশিত হয়েছে তার লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। *আল-কানুন ফিত তিব* তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অনেক উদ্ভিদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি একটি চমৎকার আলোচনা করেছেন *আশ-শিফা* গ্রন্থে। যদিও তিনি চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়েই আলোচনা করেছেন, তবে এখানে তিনি এমন বিভিন্ন উদ্ভিদের নামও এনেছেন, যেগুলোর সাথে চিকিৎসার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন লেটুস পাতা, পাট গাছ, বাঁশ ইত্যাদি।[২১১]

পঞ্চদশ শতকের সূচনায় আত্মপ্রকাশ ঘটে বিখ্যাত আন্দালুসীয় চিকিৎসক জলিল ইবনে জুলজুলের। তিনি ডায়োসকোরাইডসের 'মেডিসিন ম্যাটারিয়াল' গ্রন্থে বেশ কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করেছিলেন, যে বিষয়গুলো ছেড়ে গিয়েছিলেন মহান গ্রিক চিকিৎসক ডায়োসকোরাইডস।

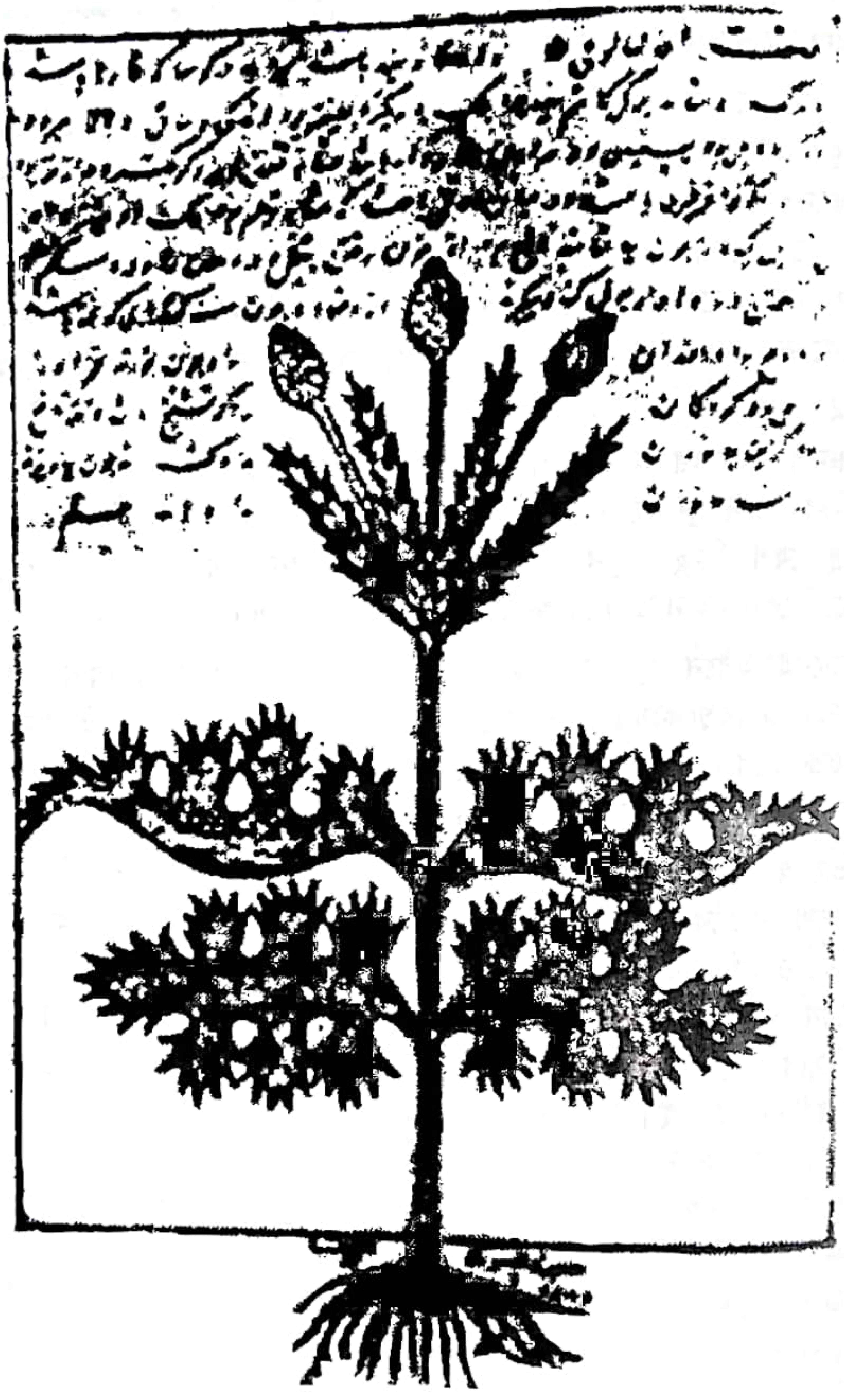
এভাবেই ইবনে জুলজুলের সংযোজিত গ্রন্থটি হয়ে ওঠে মূল্যবান একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ। তিনি অতুলনীয় এই প্রামাণ্য গ্রন্থকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ওষুধ তৈরিতে তার ব্যবহারবিধি উল্লেখ করেছেন।[২১২]

এভাবেই ধীরে ধীরে উদ্ভিদবিজ্ঞানে মুসলিম বিশ্বে নয়া বিপ্লব সৃষ্টি হয়। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলামি সভ্যতায় জন্মগ্রহণ করেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী উদ্ভিদবিজ্ঞানের দিকপাল ইবনে বাইতার। তিনি জন্মগ্রহণ করেন আন্দালুসে। কিন্তু জীবনের দীর্ঘ একটি সময় যাপন করেছেন মিশরে আইয়ুবি সাম্রাজ্যের অধীনে। তার জীবনী আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

২১১. *মাওসুআতু আবাকিরাতিল ইসলাম লি মুহাম্মাদ আমিন ফারুখ*, ৫/১৬৮

২১২. *আত-তুরাসুল আরাবি* ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ : ইলমুস সাইদালাতি ইনদাল আরব, ফেব্রুয়ারি ২০০২ খ্রি.



চিত্র নং-৬

ভেষজগুণসম্পন্ন গুল্মজাতীয় একটি উদ্ভিদ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে মুসলিম চিকিৎসকদের রচনাবলি

আমাদের সভ্যতার ইতিহাস জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের উন্নতি, অগ্রগতি ও আবিষ্কারের সাক্ষ্য দেয়। যেসব ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে সংকলন তৈরি। উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেই মুসলিমদের সেরা অবদান বলে মনে করা হয়। মুসলিমদের রচনাবলি পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি, তারা উদ্ভিদবিজ্ঞানকে গভীরভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন। অনুধাবন করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক দিক।

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদবিজ্ঞানের আলোচনার সূচনা করেছেন ভাষাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই ভাষাবিদ খলিলের লেখা *আইন*, নজর ইবনে শুমাইলের লেখা *আস-সিফাত ফিল লুগাহ* এবং আবু উবাইদা বসরি রচিত *আয-যারউ* গ্রন্থে। উদ্ভিদের নাম ও পরিচয় রচনা ও সংকলন নিছক তাত্ত্বিক কোনো কাজ ছিল না বরং তা নির্ভরশীল ছিল পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর। এটি আমরা ভাষাবিদ খলিলের লেখা *আইন* অধ্যয়ন করলেও বুঝতে পারি। এক স্থানে তিনি বলেছেন, বড় এলাচ হলো একধরনের মসলা। দেখতে আরবদেশে উৎপন্ন তুরনুসের মতো। গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুতে বৃষ্টি হলে উৎপন্ন হয়। প্রথমদিকে দেখতে ছোট খিরার মতো। তবে বড় এলাচ লাল ও গন্ধযুক্ত হয়।[২১৩]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা আরেকটি ধারা তৈরি করেন উদ্ভিদবিষয়ক ভাষাতাত্ত্বিক রচনার প্রেক্ষিতে। এই ধারার প্রধান ছিলেন ভাষাবিদ আসমায়ি। তিনি পরিবেশভিত্তিক গাছের নাম, পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি বর্ণনা করেছেন। *আন-নাবাত ওয়াশ শাজার* গ্রন্থে বিভিন্ন গাছকে অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিবিন্যস্ত করেছেন এভাবে—

২১৩. *আল-আইন লিল খলিল ইবনে আহমাদ*, ২/২৭৮

১. হিজায অঞ্চলের গাছপালা : গরকাদ, কুল ও আওসাজ[২১৪]

২. নজদ অঞ্চলের গাছপালা : সাগাম[২১৫], হুম্মাদ[২১৬] কাতাদ[২১৭] টার্পিন গাছ ইত্যাদি

৩. বালুময় অঞ্চলের গাছপালা : ঝাউ, অ্যামোডেন্ড্রন, ক্যালিগনাম, উমতি, ডিপেটেরিজিয়াম, মুসাস প্রভৃতি

৪. জলজ গাছপালা : কারমাল, ইকরিশ, সারকোকর্নিয়া ইত্যাদি

৫. পর্বতাঞ্চলীয় গাছপালা : শাস, আরআর (Juniperus), তাবাচি ও বুনো জুঁই।[২১৮]

উদ্ভিদবিজ্ঞানে বিস্তারিত গ্রন্থ রচনাতেও মুসলিমগণ সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যেমনটি আমরা দেখতে পাই ইবনে সিনার গ্রন্থে। তিনি উদ্ভিদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। এক. কাণ্ডবিশিষ্ট গাছ, দুই. লতাজাতীয় গাছ, যা ছড়িয়ে যায় বালু ও মাটির ওপরে। তিন. সবজিজাতীয় গাছ। এগুলোর সাধারণত শক্ত কাণ্ড হয় না। চার. কোমল কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ। তবে সেগুলো মাটিতে ছড়িয়ে থাকে না। এ জাতীয় উদ্ভিদের গোড়া থেকে নতুন চারা উৎপন্ন হয়। যেমন আখ। আর কিছু আছে যেগুলো গোড়া থেকে একক ধারায় বড় হয় এবং সেগুলোর পাতা গজায়। কিন্তু সেগুলোর কাণ্ড অতি সরু। যেমন পাটগাছ।[২১৯]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে যারা ঘাস ও গাছ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে আছেন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম গাসসানি (১০১৯ হি.)। তিনি মরক্কোর ফাস অঞ্চলের মানুষ। তার রচনাবলির মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে *হাদিকাতুল আযহার ফি মাহিয়্যাতিল উশবি ওয়াল আকার*। গাসসানি তার এই গ্রন্থটি সাজিয়েছেন মরক্কোর রীতি অনুযায়ী আবজাদি বর্ণক্রম অনুসারে। অর্থাৎ আলিফ দিয়ে শুরু হয়ে সমাপ্ত হয়েছে শিন দিয়ে। তিনি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ

---

২১৪. **আওসাজ :** বিভিন্ন রঙের ফুলবিশিষ্ট একপ্রকার কাঁটাগাছ।

২১৫. **সাগাম :** সাদা ফুলবিশিষ্ট একপ্রকার পাহাড়ি গাছ।

২১৬. **হুম্মাদ :** টকস্বাদের পাতাযুক্ত গুল্ম।

২১৭. **কাতাদ :** কাঁটাদার উদ্ভিদবিশেষ।

২১৮. *মাআলিমুল হাযারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২২১-২২২

২১৯. *মাওসুআতু আবাকিরাতিল ইসলাম লি মুহাম্মাদ আমিন ফারগুখ*, ৫/১৮২

করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন এর উপাদান, সংজ্ঞা, ওষুধি গুণাগুণ, এর ফুল-ফল ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়। প্রায়ই তিনি উদ্ভিদের একাধিক নাম উল্লেখ করেন। ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ হলে উৎপাদনস্থলও উল্লেখ করে দেন। মরক্কোয় প্রচলিত আঞ্চলিক নামের পাশাপাশি তিনি সাধারণত বার্বারদের ভাষায় উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করেন।

আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম গাসসানির বিন্যাসপদ্ধতিও চমৎকার। প্রথমে তিনি উদ্ভিদ, প্রাণী ও পদার্থের মূল পরিচয় উল্লেখ করেন। এরপর উদ্ভিদের প্রকৃতি এবং সর্বশেষ উল্লেখ করেন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, চিকিৎসাগত উপকার বা অনিষ্ট। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত ওষুধ তৈরির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালি নিয়ে সাধারণত আলোচনা করেন না। যদি নির্দিষ্ট ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ হাতের নাগালে না থাকে তাহলে বিকল্প পন্থা কী হবে তাও তিনি উল্লেখ করে দেন।[২২০]



চিত্র নং-৭

মুসলিম চিকিৎসকদের ব্যবহৃত ভেষজগুণবিশিষ্ট গাছগাছড়া

২২০. **নাজমি খলিল আবুল আতা রচিত প্রবন্ধ :** *হাদিকাতুল আযহার ফি মাহিয়্যাতিল উশবি ওয়াল আকার লিল গাসসানি*, ওয়েবসাইট : *মাওসুআতুল ইজাজিল ইলমিয়্যি ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ*

গাসসানি তার গ্রন্থে ৩৮৫ প্রকার উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে আমরা সিট্রন ফলের কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, সিট্রন কাঁটাযুক্ত একপ্রকার গাছ। আরবি আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'তুরুঞ্জ'। শুদ্ধ আরবিতে বলা হয় 'উতরুজ'। আর বার্বারদের ভাষায় বলা হয় 'তুরাঞ্জ'। এই ফলের ছোট, বড়, লম্বা বিভিন্ন জাত আছে। এর প্রকৃতি হলো, এটি প্রথমে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু পরে শরীর শীতল করে। এর যদিও বিভিন্ন ধরন আছে, সবগুলোর সাধারণ উপকার ও বৈশিষ্ট্য হলো, ফলের ছিলকার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র ও পাকস্থলী শক্তিশালী হয়। মূর্ছা যাওয়া ও হৃৎকম্প উপশম করে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। কাপড়ে দিলে সেই কাপড় পোকা কাটে না। একে পুড়িয়ে শ্বেতরোগে মেখে দিলে উপকার পাওয়া যায়। এই ফলের বীজের মাধ্যমে বিষের চিকিৎসা করা হয়, বিশেষত বিচ্ছুর বিষ। এজন্য দুই মাশা পরিমাণ খেতে হবে গরম পানির সাথে এবং ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করতে হবে। এই গাছের পাতার মাধ্যমে শ্বাসবদ্ধতা ও শ্বাসকষ্ট দূর হয়। সংজ্ঞাহীনতা নিরাময় হয়। তবে এই পাতা কিডনির ক্ষতি করে। মধু খেলে এই ক্ষতি পুষিয়ে যায়।[২২১]

উদ্ভিদবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান প্রচুর। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। এই প্রবন্ধে আমি মুসলিম বিজ্ঞানীদের স্থান ও কালগত বৈচিত্র্য আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি মুসলিম ভাষাবিদদের অবদান। উল্লেখ করেছি ইবনে সিনা ও মরক্কোর গাসসানির অবদান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে গাসসানির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের পরিচিতি খুবই কম।

সারকথা হলো মুসলিমগণ উদ্ভিদবিজ্ঞানের রচনা ও লেখালেখিতেও স্বতন্ত্র অবদান রেখে গেছেন। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা উদ্ভিদবিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে স্বতন্ত্র ধারার লেখালেখির দরুন সারা বিশ্বের উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণ যারপরনাই উপকৃত হয়েছেন। মুসলিমদের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও সাধনাই ছিল বিজ্ঞানীদের উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান। প্রার্থনা করি আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পুনরায় জ্ঞানে-গুণে, নেতৃত্বে ও শ্রেষ্ঠত্বে সম্মানিত করুন।

---

২২১. প্রাগুক্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাণিবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সারা বিশ্বে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ও উৎকর্ষের মাত্রা যোগ করেছিলেন তা ঐতিহাসিক পরম সত্যকথন। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস তো বটেই, বরং সমগ্র মানব-ইতিহাস এর সাক্ষী। মুসলিম শাসকগণ একটানা প্রায় সাত-আট শতাব্দীকালব্যাপী শাসন করেছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের কত শাখাপ্রশাখা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন পেয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। প্রাণিবিজ্ঞান ও তার আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানেও তাদের অবদান ভাস্বর হয়ে আছে।

আমরা এখানে দেখব যে প্রাণিবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এমন অনেক বিষয় সংযোজন করেছেন, যা পৃথিবীতে পরিচিত ছিল না। প্রাণীর আলোচনা করতে গিয়ে তাদের জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন পশুর চিকিৎসা, প্রাণিসম্পদের বিপ্লব এবং প্রাণীর বিকাশ নিয়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্রাণীর আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় তারা পূর্বের সকল জাতিকে ছাড়িয়ে গেছেন।[২২২]

মুসলিমদের নিকট চর্চিত প্রাণিবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় তাশ কুপরি যাদা *মিফতাহুস সাআদা* গ্রন্থে বলেছেন, এটি এমন বিজ্ঞান, যেখানে প্রাণীর প্রকার, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, উপকার ও অপকার সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো জলচর, স্থলচর, উভচর, উড়ন্ত, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী ইত্যাদি সকলপ্রকার প্রাণী। প্রাণিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো, প্রাণী থেকে উপকৃত হওয়া, ওষুধ তৈরি

---

২২২. *আল-ওয়াফি ফিস সাকাফাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২১২; *আল-উলুম ওয়াল ফুনুন ইনদাল আরব ওয়া দাওরুহুম ফিল হাযারাতিল আলামিয়্যা*, পৃ. ৯৪

করা, তার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা এবং প্রাণিজগতের আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া।[২২৩]

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ প্রাণিবিজ্ঞানে পূর্ববর্তীদের লেখাজোখা পড়ে দেখেননি, এ কথা বলা ঠিক হবে না; বরং সত্যের অপলাপ হবে। মুসলিম মনীষীগণ পূর্ববর্তীদের প্রাণিবিজ্ঞানের গ্রন্থাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রাচীন চীন, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রিক-রোমান শহরে প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি তারা অনুবাদ করেছিলেন আরবি ভাষায়। তাদের গ্রন্থাবলি গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন। গবেষণা করেছিলেন তাদের বিভিন্ন মতামত নিয়ে। তারা অনেক তথ্য সংশোধন এবং সংযোজন করেছিলেন। প্রাণিবিজ্ঞানের এই ধারায় অবদান রেখেছেন অনেক বিজ্ঞ মুসলিম প্রাণিবিজ্ঞানী।[২২৪] আমরা এখানে কয়েকটি আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের অবদান তুলে ধরব :

- মুসলিমদের মাঝে প্রাণিবিজ্ঞানের অবস্থান
- ভেটেরিনারিতে মুসলিমদের অবদান
- শিকারি পাখিবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

❁❁❁

২২৩. *মিফতাহুস সাআদা লি তাশ কুপরি যাদা*, পৃ. ৪০১
২২৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬-২৬

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুসলিমদের মাঝে প্রাণিবিজ্ঞানের অবস্থান

অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো প্রাণিবিজ্ঞানেও ছিল মুসলিমদের অবদান। কিন্তু মুসলিমগণ প্রাণিবিজ্ঞানের বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা দিয়েছেন অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তবে অবশ্যই প্রাণিবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের বেশ কিছু যুগান্তকারী চিন্তাভাবনা ছিল। বলা যায় তারা অনেক আধুনিক বিজ্ঞানীদের থেকে চিন্তা-চেতনায় এগিয়ে ছিলেন। যেমন সিমবায়োসিস ধারণার আবিষ্কারক মনে করা হয় জার্মান দার্শনিক গ্যাটেকে (মৃ. ১৭৪৯ খ্রি.)। সিমবায়োসিস অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসরত প্রাণীদের মিথোজীবিতা। প্রতিটি প্রাণী টিকে থাকার জন্য অপর প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। এতে পরস্পরের মাঝে যেমন হৃদ্যতা তৈরি হয় তেমনই তারা যৌথভাবে উপকৃত হয়। যেমন একপ্রকার পাখি গরুর ওপর বসে পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্লোভার পাখি কুমিরের মুখের ভেতর বসে কুমিরের দাঁতের ফাঁকে জন্মানো কীট খেয়ে থাকে। এটিই সিমবায়োসিস।[২২৫]

মজার বিষয় হলো, এ নিয়ে আমরা জাহিয, কাযবিনি, দামিরির গ্রন্থে আলোচনা দেখতে পাই। জাহিয বলেছেন, বিচ্ছু ও গুবরেপোকার মধ্যে একধরনের অনুরাগ আছে। কাক শিয়ালের সাথে বন্ধুত্ব করে। শিয়াল আবার সম্পর্ক রাখে সাপের সাথে। আর স্বাভাবিকভাবেই শত্রুতা থাকে ঈগল ও সাপের মাঝে। দামিরি বলেছেন, গুঁইসাপজাতীয় প্রাণী দব ও বিচ্ছুর মধ্যে হৃদ্যতা রয়েছে। শত্রুর হাত থেকে দবকে রক্ষা করার জন্য দবের গর্তে থাকে বিচ্ছু। দবকে তাড়া করে কেউ তার গর্তে ঢুকলে বিচ্ছুকে সেখানে উপস্থিত পাবে। দবের শত্রুকে দংশনের জন্য বিচ্ছু উদ্যত হয়ে থাকে।[২২৬]

দামিরির আরও আগে কাযবিনি বলেছেন, বিশাল ভারতীয় বাঘ, যা শক্তিতে সিংহের চেয়েও শক্তিশালী, সে বন্ধুত্ব করে ওই বিচ্ছুর সাথে, যা বাসা বাঁধে

---

২২৫. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ৫/৩৫৬

২২৬. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ৫/৩৫৬

তার চুলে। এমনইভাবে বন্ধুত্ব রয়েছে নেকড়ে ও হায়েনার মাঝে, বাঘ ও সাপের মাঝে।[২২৭]

কাযবিনির মতে পরিবেশের প্রভাব কোনো অংশে কম নয়। তিনি মনে করেন, প্রাণীর বংশবিস্তারে পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। *আজাইবুল মাখলুকাত* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, হাতি পৃথিবীর দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে অধিক বংশবিস্তার করে। হিন্দুস্তানের হাতিগুলো অন্যান্য অঞ্চলের হাতির তুলনায় দীর্ঘজীবী হয়। দাঁতগুলোও হয় তুলনামূলক বড়।

আবিসিনিয়া তথা পূর্ব আফ্রিকায় জিরাফ অধিকহারে জন্ম নেয়। মহিষ জন্মগ্রহণ করে সাধারণত উষ্ণ দেশগুলোয়, যেখানে জলাশয় বেশি। শীতল দেশগুলোয় মহিষ বসবাস করে না। কাঠবিড়ালি, বিবর, কস্তুরী হরিণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোয় জন্মগ্রহণ করে। বাজপাখি, ইগল বাচ্চা দেয় উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। উটপাখি আর কাতা পাখি ডিম পাড়ে উন্মুক্ত বালুময় স্থানে। হাঁস-সহ অন্যান্য জলজ পাখি বাগান, ঘাস, ঝোপঝাড়ে ডিম পাড়ে। তিতির পাখি কেবল ডিম পাড়ে পাহাড়ের চূড়ায়।

এখানে প্রাণী-বিষয়ে যেমনটি উল্লেখ করা হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেমনটিই দেখা যায়। এর বিপরীত উদাহরণও রয়েছে। কিন্তু তা অল্প।[২২৮]

দার্শনিক ইখওয়ানুস সফা সংঘ প্রাণী সম্পর্কে এমন মতামত দিয়েছেন, যার উপমা পূর্বে দেখা যায় না। যদিও সেটা যতটা না বৈজ্ঞানিক মতামত ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল দার্শনিক মতামত।

প্রাণিজগতে আল্লাহর যে কুদরত লুকিয়ে রয়েছে, সেটা তুলে ধরতে গিয়ে তারা দুটি প্রাণীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। এক. বিশাল আকৃতির হাতি দুই. ক্ষুদ্রতর প্রাণী উকুন। অধিকাংশ মানুষ সাধারণত হাতির বিশাল দেহ দেখে অবাক হয়, কিন্তু উকুন দেখে কেউ অবাক হয় না। অথচ উকুন একটি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি। আমরা গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাই, হাতির বিশালত্বের পরও তার রয়েছে মাত্র চারটি পা, একটি শুঁড়, আর সামনের দুটি বড় দাঁত। অন্যদিকে উকুনের দেহের ক্ষুদ্রতাসত্ত্বেও তার রয়েছে ছয়টি পা, মুখ, কণ্ঠনালি, কিডনি ইত্যাদি। রয়েছে আরও অন্যান্য অঙ্গ, যা আমরা খালি চোখে

---

২২৭. *আজাইবুল মাখলুকাত*, পৃ. ৩১৮

২২৮. *আজাইবুল মাখলুকাত*, পৃ. ৩০৯, ৩৪৬

দেখতে পাই না। ক্ষুদ্র প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও উকুন বিভিন্নভাবে হাতিকে কষ্ট দিতে পারে। কিন্তু হাতি কখনোই নিজেকে উকুন থেকে বাঁচাতে পারে না।[২২৯]

প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ ছিল মুসলিমদের প্রাণিবিজ্ঞানের এক মহৎ কৃতিত্ব। তাদের শ্রেণিবিন্যাস একক ছিল না; বরং সামগ্রিক ছিল। প্রথমদিকে তারা প্রাণীকে গৃহপালিত, হিংস্র বন্য, শিকারি ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক এই বর্ণনার পর তারা আধা-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণিবিন্যাস করেন। যেমন, স্থলচর, খেচর, জলচর, সরীসৃপ।

কেউ কেউ আবার প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করেছেন প্রাণের বিবেচনায় পরিপূর্ণ ও অপরিপূর্ণ হিসাবে। উদাহরণস্বরূপ, কাযবিনি বিশ্বজগতের পদার্থের তৃতীয় স্তরে রেখেছেন প্রাণীকে। তার মতে প্রথম হলো জড় উপাদান, দ্বিতীয় হলো উদ্ভিদ।

প্রাণীর মধ্যেও তিনি বিভিন্ন ভাগ তৈরি করেছেন তাদের কর্ম ও সক্ষমতার ভিত্তিতে। মানুষকে তিনি এ ক্ষেত্রে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত ও শ্রেষ্ঠ প্রাণী। প্রাণীকে তিনি ভাগ করেছেন সাতটি শ্রেণীতে। **এক.** মানুষ, **দুই.** জিন, **তিন.** ভারবাহী প্রাণী। যেমন ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, বন্য ঘোড়া ইত্যাদি। তিনি এগুলোর বিস্তারিত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। **চার.** গৃহপালিত পশু। এগুলো অত্যন্ত উপকারী এবং মনিবের বেশ অনুগত। হিংস্রতা বা পলায়নপর মনোভাব নেই। যেমন গরু, মহিষ, উট, মেষ ইত্যাদি। **পাঁচ.** হিংস্র শিকারি পশু। যেমন নেকড়ে, বেজি, খরগোশ, শূকর, হায়েনা, চিতাবাঘ, হাতি, বাঘ, কুকুর ইত্যাদি। **ছয়.** পাখি। এর মধ্যে আছে তোতা, বুলবুল, কবুতর, টিয়া, শালিক ইত্যাদি। **সাত.** পোকা। এগুলোর গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো সাপ, বিচ্ছু, পঙ্গপাল, গিরগিটি, শামুক, ব্যাঙ ইত্যাদি।[২৩০]

শ্রেণিবিন্যাসের পারঙ্গমতায় জাহিয অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যান। তিনি প্রাণীদের দল হিসাবে ভাগ করেছেন। খুরবিশিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন হরিণ, ছাগল, গরু, বন্য গরু, মহিষ, মেষ ইত্যাদির কথা। এই দল সম্পর্কে তার একটি জ্ঞানগত বিশ্লেষণ এমন—বুনো গরু সাধারণত গৃহপালিত গরুর চেয়ে বেশি মিল রাখে মেষের সাথে। এজন্য এগুলোকে দুম্বাও বলা হয়।[২৩১]

---

২২৯. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৬

২৩০. *আজাইবুল মাখলুকাতের সূচিপত্র*

২৩১. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ৭/২৩৯

জাহিয সামগ্রিকভাবে প্রাণীদের চার ভাগে বিভক্ত করেন। **এক.** হাঁটতে পারে **দুই.** উড়তে পারে **তিন.** পানিতে ভাসতে পারে **চার.** সরীসৃপ। প্রত্যেক পাখিই হাঁটতে পারে। আর যেসব প্রাণীর পাখা আছে, কিন্তু তারা উড়তে পারে না, কেবল হাঁটতে পারে, সেগুলোকে তাত্ত্বিকভাবে পাখি বলা হবে না, যেমনভাবে উড়তে সক্ষম সকল প্রাণীকে পাখি বলা হয় না। মাছি, মৌমাছি, ফ্লাইং এন্টস, ঝিঁঝি পোকা উড়তে পারে। কিন্তু সেগুলোকে পাখি বলা হয় না।

পানির মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক প্রাণীই আবার মাছ নয়। যদিও অন্যান্য জলজ প্রাণীর সাথে মাছের বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্ন মিল পাওয়া যায়। যেমন ব্যাঙ, কচ্ছপ, কুমির, ডলফিন, কেঁচো, জলকুকুর, জলহস্তী ইত্যাদি।[২৩২]

দার্শনিক ইখওয়ানুস সফার নিকট প্রাণী দুই প্রকার—

এক. সৃষ্টিগতভাবে পরিপূর্ণ। **দুই.** সৃষ্টিগতভাবে অপূর্ণ।

সৃষ্টিগতভাবে পরিপূর্ণ প্রাণী হলো, যাদের যৌনমিলনের ফলে গর্ভধারণ হয়, তারপর বাচ্চা প্রসব করে।

সৃষ্টিগতভাবে অপূর্ণ হলো ওই সব প্রাণী, যারা জন্মগ্রহণ করে ময়লা ও আর্দ্র স্থান থেকে। যেমন ছোট ছোট বিভিন্ন পোকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া। এ দুইয়ের মধ্যবর্তী হলো ওই সকল প্রাণী, যাদের যৌনসংগমের পর ডিমের প্রক্রিয়ায় সন্তান প্রসব হয়।

ইখওয়ানুস সফা প্রাণীর সৃষ্টিক্রম পরিবর্তনের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টিগতভাবে অপূর্ণ প্রাণীর ধারাবাহিক ক্রম পরিপূর্ণ প্রাণীর পূর্বে। কারণ অপূর্ণ প্রাণী খুবই অল্প সময়ে জীবনের অস্তিত্ব লাভ করে। আর পরিপূর্ণ প্রাণীর লাগে দীর্ঘ সময়।

তারা পরিবেশ অনুযায়ীও প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যেমন **এক.** বাতাসে উড়ন্ত প্রাণী। এর মধ্যে আছে অনেক পাখি ও পোকামাকড় **দুই.** পানিতে বসবাসকারী। এর মধ্যে আছে এমন প্রাণী যারা পানিতে ভেসে বেড়ায়। যেমন মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, চিংড়ি ইত্যাদি **তিন.** স্থলচর প্রাণী। এর মধ্যে আছে চতুষ্পদ প্রাণী, হিংস্র প্রাণী ইত্যাদি **চার.** মাটিতে গর্ত করে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ।[২৩৩]

---

২৩২. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ১/৩০

২৩৩. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যা* (ইবুক সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ভেটেরিনারিতে মুসলিমদের অবদান

প্রাণিবিজ্ঞানের একটি দিক হলো প্রাণীর চিকিৎসাবিজ্ঞান। এ ক্ষেত্রেও মুসলিমগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। প্রাণিবিজ্ঞানে মুসলিমদের কৃতিত্বের বড় প্রমাণ এটি। ইসলামের ছায়ায় বিকাশ লাভ করেছে এই বিজ্ঞান। তা ছাড়া প্রাণীর প্রতি যত্নবান হওয়া ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। ইসলাম প্রাণীর প্রতি সদাচার ও সহানুভূতির নির্দেশ দেয়। নির্দেশ দেয় খানাপিনা ও চিকিৎসার। বহনক্ষমতার অতিরিক্ত ভার চাপাতে নিষেধ করে। নিষেধ করে কোনো উপকার অথবা মানবিক প্রয়োজন ছাড়া প্রাণী হত্যা করতে।

ইসলামি শরিয়তের রাষ্ট্রীয় একটি আইন হলো, দ্রুত ছোটার জন্য পশুকে যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা না হয়। পশুকে বেঁধে রাখার জন্য পশুর নাক ফুটো করা যাবে না। কারণ তা পশুর জন্য কষ্টদায়ক। পশুর শরীরে উলকি আঁকা যাবে না। কারণ এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি। পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করে দিয়েছে। জবাইয়ের সময় ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে ও কোমল আচরণ করতে হবে, যেন পশুর কষ্ট না হয়। আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করতে হবে। ইসলামের আইন মেনে জবাই না করলে পশুর মাংস খাওয়া হারাম হবে।[২৩৪]

তিরন্দাজি শিখতে ইসলামে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তিরন্দাজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে পশুপাখিকে চাঁদমারি বানানো যাবে না। খেলার ছলে অথবা মজা নেওয়ার জন্য পশুকে জখম করা যাবে না। অথবা প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই লাগিয়ে খেলা উপভোগ করা যাবে না (যেমনটি ষাঁড় বা মোরগ লড়াইয়ে দেখা যায়)। প্রাণীদের পারস্পরিক লড়াই আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ইসলামি রাষ্ট্র আন্দালুসিয়ায়। কারণ এর মাধ্যমে প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হয়।[২৩৫]

---

২৩৪. *আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া*, ৫/২৮৮

২৩৫. *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪/২১৬

ইসলামের এসব শিক্ষা বিশেষভাবে মুসলিমদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে প্রাণিবিজ্ঞান ও প্রাণীদের চিকিৎসার ব্যাপারে সচেতন হতে। মুসলিমদের বিশেষ সচেতনতা ও গুরুত্ব ছিল ঘোড়া নিয়ে। কারণ ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানের অন্যতম সঙ্গী। তাই মুসলিমগণ ঘোড়ার প্রকার, বৈশিষ্ট্য, দোষ-গুণ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। লেখালেখি করেছেন এগুলোর রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকার নিয়ে। তেমনইভাবে তারা বাজপাখির ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ বাজপাখি দিয়ে বিভিন্ন পশুপাখি শিকার করা হতো এবং প্রশিক্ষণের কাজেও ব্যবহৃত হতো বাজপাখি।

জাহিযের লেখা *আল-হায়াওয়ান* গ্রন্থে যদিও সাহিত্যের প্রাধান্য বেশি, কিন্তু তাতে উঠে এসেছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক বিষয় বিশ্লেষণ। ফলে এটি বিজ্ঞানের একটি গ্রন্থ হওয়ার দাবি রাখে।[২৩৬]

পশুর খোজাকরণ (castration) নিয়েও তিনি লিখেছেন। তুলে ধরেছেন এর ক্ষতি ও উপকারিতার বিভিন্ন দিক। জাহিয স্পষ্টভাবে বলেছেন, খোজাকরণের মাধ্যমে পশুর দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বাহনের উপযোগী হয়, দৌড় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায় এবং আওয়াজ নিচু হয়। এজন্যই সাধারণত যুদ্ধের ঘোড়া খোজা করা হয়। এসব ঘোড়ার আওয়াজ নিচু হওয়ার ফলে আক্রমণকারীর উপস্থিতি সম্পর্কে শত্রুদল সতর্ক হতে পারে না।[২৩৭]

জাহিয দুই প্রকারের পশুর মধ্যে দৈহিক মিলন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। যেমন কুকুর ও নেকড়ে[২৩৮], ঘোড়া ও গাধা[২৩৯], বুনো কবুতর ও গৃহপালিত কবুতরের মাঝে মিলন।

তিনিই প্রথম বলেছেন যে, একটি অণ্ডকোষ থাকলেই পশুদের বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। যে পশুর একটি অণ্ডকোষ নেই, সেই পশু স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক জীবনযাপন করতে পারে।

মুসলিমগণ প্রাণীর দেহব্যবচ্ছেদ নিয়েও গবেষণা করেছেন। পশুর দেহব্যবচ্ছেদের জন্য প্রথম মর্গ তৈরি হয় বাগদাদে দজলা নদীর তীরে। এর প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য ছিল :

---

২৩৬. *আজাইবুল মাখলুকাত*, পৃ. ৩০৩, ৩৪৭; *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ৬/৪৭৮

২৩৭. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ১/১৩০-১৩২

২৩৮. প্রাগুক্ত, ১/১৮৩

২৩৯. প্রাগুক্ত, ১/১৩৭

এক. তুলনামূলক অ্যানাটমির মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের মানবদেহ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। এ ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করা হতো নুবা অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা একধরনের বানর, যার দেহ-গঠন অনেকটা মানুষের মতো ছিল।

দুই. প্রাণীর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পশুর যত্ন শিক্ষা দেওয়া।

জর্জ সার্টন তুলে ধরেছেন, প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের গুরুত্ব ছিল অসামান্য। এ পেশায় পেশাদারির জন্য অনেক পরিবারের উপাধি পড়ে গিয়েছিল পশুচিকিৎসক-পরিবার। এখান থেকেই প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী জিয়াউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন ইবনুল বাইতার বা পশুচিকিৎসকের সন্তান নামে। এ জাতীয় নাম থেকে পশুর চিকিৎসায় তাদের অনুরাগের বিষয়টিই ফুটে ওঠে। ইসলামি সভ্যতার সূচনাপর্বেই প্রাণীর চিকিৎসা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য শাখা।

প্রাণীর চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমগণ কতটা উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, তা এখানে বিস্তারিত তুলে ধরা সম্ভব না। তবে ধারণা দেওয়ার জন্য আহমাদ ইবনে হাসান ইবনে আহনাফ বাইতারের (৫৯৬ হি./১২০০ খ্রি.) লেখা *আল-ফুরুসিয়্যা* গ্রন্থের কিছু অধ্যায়ের নাম তুলে ধরা যায়। এতে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থটি মূলত ঘোড়া সম্পর্কে লেখা। ঘোড়ার রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকারের বর্ণনা, কীভাবে ঘোড়া লালনপালন করতে হবে ইত্যাদি। (গ্রন্থটি কায়রোর তাইমুরিয়া লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।)

প্রথম অধ্যায় : ঘোড়ার দুধদাঁত ও স্থায়ী দাঁতসংক্রান্ত আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের বাহ্যিক পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় অধ্যায় : বহিঃস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম।

চতুর্থ অধ্যায় : ঘোড়ায় আরোহণের পদ্ধতি।

পঞ্চম অধ্যায় : ঘোড়দৌড়।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ঘোড়ার বংশগত রোগ।

সপ্তম অধ্যায় : মন্দ স্বভাব ও শারীরিক খুঁত।

অষ্টম অধ্যায় : উদরের শ্রেণিবিন্যাস।

নবম অধ্যায় : মাথার রোগ ও জন্মগত খুঁত। যেমন গলা ও কণ্ঠনালি, হাত, বুক, পিঠ, লেজ, উরু, পায়ের গোছা, শিরা-উপশিরা, হাড়ভাঙা ও জোড়া ইত্যাদির চিকিৎসা ও প্রতিকার।

এ ছাড়া ঘোড়ার বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ রোগ নিয়ে আলোচনা আছে। আরও আছে ঘোড়ার বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ নিয়ে আলোচনা। যেমন ব্রণ, দাদ, একজিমা, সোরিয়াসিস, গুটিবসন্ত, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি।[২৪০]

এ বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন আজ থেকে হাজার বছর আগে ষষ্ঠ হিজরি মোতাবেক দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, মুসলিমগণ প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ও প্রাগ্রসর ছিলেন।[২৪১]

❁❁❁

২৪০. *আল-ফুরুসিয়্যা লি আহমাদ ইবনে হাসান*, পৃ. ২৮৭; তাইমুরিয়া গ্রন্থাগারে এটি পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে।

২৪১. *আল-মুনাজ্জামাতুল আলামিয়া লিল উলুমিল ইসলামিয়া*, www.islamset.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

শিকারি পাখিবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

আরব ও ইসলামি সভ্যতার দীর্ঘ সময়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে শিকারি পাখি নিয়ে। যেমন ইগল, বাজ ও ফ্যালকন পাখি। এগুলোর কথা আলোচিত হয়েছে উপমা, চিত্র, লোককথা ও কবিতায়। শিকারি পাখি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আছে। আগ্রহের বিন্দু থেকেই শিকারি পাখি জায়গা করে নেয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও গবেষণার পাতায়। শিকারি পাখিকে ঘিরে তৈরি হয় নতুন মূলনীতি ও তত্ত্ব। কীভাবে একে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কী খাওয়াতে হবে, রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা কী হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলাদা আগ্রহ লক্ষ করা যায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের মাঝে। শিকারি পাখিসংক্রান্ত বিদ্যাকে তারা অভিহিত করেছিলেন 'বাইজারা' নামে। ধীরে ধীরে এই শাস্ত্রের পরিভাষা, গ্রন্থাবলি ও জ্ঞানী-গুণীর প্রকাশ ঘটেছে। এই বিদ্যায় তারা তুলে এনেছিলেন শিকারি পাখিসংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভিন্ন বিষয়।

শিকারি পাখিদের সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞান, সুস্থতা-অসুস্থতা, শক্তি-দুর্বলতা বোঝার শাস্ত্র মুসলিমদের নিকট প্রচলিত ছিল 'বাইজারা' নামে। এই নামের উৎস খুঁজতে গেলে আমরা পাই বাজপাখির কথা। এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত, বাজ থেকেই এই শাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে 'বাইজারা'। এই পাখির নামে কেন এই শাস্ত্রের নামকরণ করা হলো, অন্য কোনো নামে কেন করা হলো না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, শিকারি পাখিগুলোর মধ্যে বাজপাখিই অধিক দক্ষ ও প্রসিদ্ধ। আবু আবদুল্লাহ কাযবিনি *আজাইবুল মাখলুকাত ওয়া গারাইবুল মাওজুদাত* গ্রন্থে বাজপাখি সম্পর্কে বলেছেন, এর রাগ বেশি, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, দেহ-গড়ন মজবুত। এ পাখিগুলো তুর্কিতে পাওয়া যায়।[২৪২]

আর শিকারিকে আরবিতে বলা হয় 'বাইজার'। তিনিই শিকারি পাখিকে শিকার করার প্রশিক্ষণ দেন। 'বাইজার' শব্দের উৎসমূল ফারসি 'বাজিয়ার'

---

২৪২. *আজাইবুল মাখলুকাত*, পৃ. ৩৩৭

অথবা 'বাজদার'। ফার্সিতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি বাজপাখিকে পরিচালনা করেন, বাজ দিয়ে শিকার করেন।

সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, কার হাতে শিকারি পাখিসংক্রান্ত বিজ্ঞানের সূচনা। কেউ বলেন, হিন্দুস্তানিদের হাতে এর সূচনা। কেউ বলেন, টলেমিদের হাতে এর উৎপত্তি।

কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরবদের নিকট পাখি দিয়ে শিকার করা একটা পেশা ও শখের কাজ ছিল। ইসলাম একে গণ্য করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি নেয়ামত হিসাবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۭ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۡ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾

মানুষ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কোন জিনিস হালাল। বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত উপাদেয় জিনিস হালাল করা হয়েছে। আর যে শিকারি পশুকে তোমরা আল্লাহর শেখানো পন্থায় শিখিয়ে শিখিয়ে (শিকার করার জন্য) প্রশিক্ষিত করে তুলেছ, তারা যে জন্তু (শিকার করে) তোমাদের জন্য ধরে আনে, তা থেকে তোমরা খেতে পারো। আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। [সুরা মায়েদা : ৪]

এই শিকারি পাখি বা পশুকে শিকার শিক্ষা দেওয়া, তারপর শিকারকাজে সাহায্য নিতে পারা মূলত বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার একটি মহানেয়ামত। এর তাৎপর্য কেবল তারাই জানে, যারা এই বিদ্যায় পারদর্শী। এই বিদ্যার একটি উপকারী দিক হলো, এর মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উপার্জনের পথ খুঁজে পায়। এজন্যই বিখ্যাত শিকারি আযিয বিল্লাহ ফাতেমি *আল-বাইজারা* গ্রন্থে বলেছেন, শিকার সাধারণত একেবারে ভিন্ন দুই মেরুর ব্যক্তি পছন্দ করে। কিন্তু তাদের দুজনেরই রয়েছে উচ্চাভিলাষ। **এক.** সম্পদশালী কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি। **দুই.** দুনিয়াবিমুখ, উচ্চাভিলাষী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো দরিদ্র ব্যক্তি, যে একদিকে যেমন অন্যের

অধীনে চাকরি করতে চায় না, তেমনই অন্যদিকে নিম্নমানের পেশা থেকেও বেঁচে থাকতে চায়।[২৪৩]

'বাজিয়ার' বা শিকারিকে উমাইয়া ও আব্বাসি খেলাফতের সময় বলা হতো 'সাহিবুস সাইদ'। ধীরে ধীরে শিকার হয়ে ওঠে খলিফাদের জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ। অন্যান্য খাতের মতো এ খাতেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিপুল অর্থ জোগান দেওয়া হয়। ফাতেমি খলিফা নিযারের সময় সরকারি শিকারিদের ভাতা ছিল ৫০ হাজার দিনার। এই ভাতা কেবল তাদের খাওয়াদাওয়া ও শিকারি পশুদের পালনের জন্য। এ ছাড়াও প্রতি বছর তাদের বাহনের জন্য আরও বাজেট ছিল।

এ ক্ষেত্রে মুসলিম আলেমদের অবদান অসংখ্য ও বহুমুখী। একেকজন একেক দিক থেকে অবদান রেখেছেন। কেউ ভাষাগত দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন সিজিস্তানির লেখা *আত-তাইর*, আসমায়ির লেখা *আল-উহুশ*। আরও আছে আবু উবাইদার *আল-বাজি*, *আল-হামাম*, ও *আল-উকাব* গ্রন্থ। কেউ আবার শিকারি পাখির ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ির *আস-সাইদ ওয়ায যাবাইহ* ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানির *আস-সাইদ ওয়ায যাবাইহ*।

আবার অনেকেই সামগ্রিকভাবে পাখির মাধ্যমে শিকার নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ বালাদির লেখা *আল-কাফি ফিল বাইজারা*, ঈসা আজদির লেখা *আল-জামহারা ফিল বাইজারা*, আযিয বিল্লাহ ফাতেমির লেখা *আল-বাইজারা*, এক অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা *নুযহাতুল মুলুক ওয়াস সাদাত বিতত্বয়ুর ওয়াল জাওয়ারিহ ওয়াল জিয়াদিস সাফিনাত*—গ্রন্থটি এখন মুদ্রিত হয়েছে, গিতরিফ ইবনে কুদামা গাসসানির রচিত দুটি বই *আল-বাইজারা* ও *দাওয়ারিত তাইর* ইত্যাদি।[২৪৪]

বিখ্যাত সাহিত্যিক জাহিযও তার *আল-হায়াওয়ান* গ্রন্থে শিকারি পাখি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে রচনা করেছেন স্বতন্ত্র অধ্যায়। অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'জাওয়ারিহুল মুলুক'। তিনি সেখানে বলেন, রাজাদের শিকারের প্রাণী হলো বাজপাখি, চিতাবাঘ, ফ্যালকন (Peregrine falcon),

---

২৪৩. *আল-বাইজারা*, পৃ. ২-৩

২৪৪. *দায়েরাতু সাফিরিন লিল মাআরিফিল ইসলামিয়া, মাদখালুল বাইজারা লি আহমাদ ফুআদ পাশা*, পৃ. ৩৯-৪০

সাকর (Falcon), যুরাক শকুন, ছোট বাজপাখি (Merlin) ইত্যাদি। কোনো অভিজাত ব্যক্তি বাজপাখি পোষা ভালো মনে করেন না, কারণ তা শিকারির কাজ। অন্যদিকে শাহিন বা সাকর পোষা তারা খারাপ মনে করেন না। এর কারণ হয়তো এটিই যে, বাজপাখি মূলত অনারব পাখি আর সাকর আরবের পাখি।[২৪৫] জাহিযের পূর্বের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি, তার যুগে একধরনের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। এমনকি এর প্রভাব শিকারি পাখি পছন্দ করা বা না করার মধ্যেও পড়েছিল। আরবীয়-অনারবীয়, জাতিগত এ বিষয়টি তাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করেছে।

জাহিযের বক্তব্য থেকে জাতীয়তাবাদের গন্ধ যদিও আসছে, তবুও এটা আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে যে, সেই তৃতীয় শতকেও মুসলিম জ্ঞানীগণ শিকারি পাখি সম্পর্কে আগ্রহ রাখত। এজন্য তিনি শিরোনাম দিয়েছেন 'জাওয়ারিহুল মুলুক' বা রাজাদের শিকারী প্রাণী। আমরা দেখতে পাই, জাহিয একপ্রকার শিকারি পাখির কথা বলেছেন, যেগুলো অতি দ্রুত প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে। একইসাথে তিনি এসব পাখির মন্দ গুণের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কিছু প্রাণী আছে, যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা সাড়া দেয় ও ক্রমশ বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। যেমন ম্যাগপাই (magpie) পাখি। বাজপাখির মতো এরাও শিকারির ডাকে সাড়া দেয় এবং শিস দেওয়ার পদ্ধতি থেকে শিকারির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। মালিকের গহনা সে লুকিয়ে রাখে। তারপর তাকে শিস দিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে খুব সহজে মালিককে লুকানো স্থানে নিয়ে উপস্থিত করে। এ ক্ষেত্রে খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হয় না। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ম্যাগপাই পাখি প্রায়ই নিজের বাচ্চা আর ডিম নষ্ট করে ফেলে।[২৪৬]

মুসলিম সভ্যতার একজন বিখ্যাত শিকারি পাখি বিশেষজ্ঞ হলেন আযিয বিল্লাহ ফাতেমি। মনে করা হয়, তার প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লাহ হাসান ইবনে হুসাইন। চতুর্থ হিজরি শতকে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার লিখিত *আল-বাইজারা* ৬০ পৃষ্ঠার ছোট কলেবরের একটি গ্রন্থ। এই ছোট্ট গ্রন্থটিতেই তিনি শিকারি পাখি ও পশু সম্পর্কে বিচিত্র আলোচনা তুলে এনেছেন। বেশি আলোচনা করেছেন শিকারি পাখি নিয়ে। শিকারি পাখির নাম, পরিচয়, গুণ-

২৪৫. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ৬/৪৭৮
২৪৬. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ৬/৪৭৮

বৈশিষ্ট্য, রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এবং সর্বোচ্চ উপকৃত হওয়ার কৌশল ইত্যাদি নিয়ে।

গ্রন্থটির শেষে তিনি একটা সুন্দর অধ্যায় এনেছেন। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন, কীভাবে জোছনারাতে শিকারি পাখি দিয়ে শিকার ধরা যায়। এর আগে এ বিষয়ে আর কেউ আলোচনা করেননি। আলোচ্য বিষয় ছাড়াও এই গ্রন্থে উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তীদের কবিতা, গদ্য, নীতিকথা, রাজাবাদশা ও খলিফাদের বিভিন্ন জীবনাচার। শিকারই ছিল তাদের প্রধান শখ।

আল-বাইজারা গ্রন্থে ফুটে উঠেছে আযিয বিল্লাহ ফাতেমির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। লেখকের ছিল দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা। ২০ বছরের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে তিনি লিখেছিলেন এ গ্রন্থটি। খলিফা নিযার ফাতেমির নিকট সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন। একপর্যায়ে খলিফা তাকে মন্ত্রিসভার সদস্য করে নেন। দেড় বছর পরেই তাকে প্রধান শিকারি পদে নিযুক্ত করেন। বেতন নির্ধারণ করেন ২০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা! এই মোটা অঙ্কের বেতন থেকেই বোঝা যায়, খলিফা, বাদশাহ ও গণ্যমান্য লোকদের নিকট তার অবস্থান কত উচ্চ ছিল।

আযিয বিল্লাহর *আল-বাইজারা* গ্রন্থে দেখতে পাই, তিনি শাহিনের (Peregrine falcon) চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন সাকরকে (Falcon)। তবে অধিকাংশ শিকারি পাখি গবেষক এর বিপরীত মত পোষণ করেন। আযিয বিল্লাহ তার মতের পক্ষে সাকরের দেহের সৌন্দর্য ও শিকারের দক্ষতার কথা তুলে ধরেছেন, যা শাহিনের মধ্যে পাওয়া যায় না।[২৪৭]

মুসলিম সভ্যতায় আরও যারা শিকারি পাখিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আছেন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ বালাদি। তিনি মৃত্যুবরণ করেন সপ্তম শতাব্দীতে। তিনি শিকারি পাখি নিয়ে *আল-কাফি ফিল বাইজারা* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এখানে তিনি এই শাস্ত্রের মৌলিক নিয়মকানুন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শিকারি পাখিবিজ্ঞান চার ভাগে বিভক্ত। আর প্রতিটি ভাগে রয়েছে চারটি করে অধ্যায়।

২৪৭. *আল-বাইজারা*, পৃ. ৫০

প্রথম ভাগ : শিকারি পাখির বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে।

প্রথম অধ্যায় : বিভিন্ন প্রকার শিকারি পাখির শ্রেণি সম্পর্কে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : একপ্রকার থেকে অন্য প্রকারের পার্থক্য সম্পর্কে।

তৃতীয় অধ্যায় : বিভিন্ন শিকারি পাখির উপকারী প্রজাতি।

চতুর্থ অধ্যায় : শিকারি পাখিদের রঙের বৈচিত্র্য।

দ্বিতীয় ভাগ : উপকারী প্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিকারি পাখি ও মন্দ পাখি।

প্রথম অধ্যায় : উপাদানগত দিক বিবেচনায় ভালো ও মন্দ শিকারি পাখি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আকার ও আকৃতির বিবেচনায় ভালো ও মন্দ শিকারি পাখি।

তৃতীয় অধ্যায় : রঙের বিবেচনায় ভালো ও মন্দ শিকারি পাখি।

চতুর্থ অধ্যায় : গুণ ও কর্মের বিবেচনায় ভালো ও মন্দ পাখি।

তৃতীয় ভাগ : শিকারি পাখি প্রশিক্ষণের পদ্ধতি।

প্রথম অধ্যায় : শিকারি পাখির মাধ্যমে খেলা ও শিকার।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শিকারি পাখিবিদ্যার শিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ।

তৃতীয় অধ্যায় : প্রশিক্ষণের পদ্ধতি।

চতুর্থ অধ্যায় : শিকারি পাখির প্রকৃতির বিবেচনায় স্বাদের বৈচিত্র্য নির্ণয়।

চতুর্থ ভাগ : শিকারি পাখির রোগের চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায় : শিকারি পাখির গুণ ও প্রকৃতি ক্রয়ের সময় পরীক্ষার পদ্ধতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রোগের কারণ ও রোগের উপসর্গ নির্ণয়।

তৃতীয় অধ্যায় : চিকিৎসাপদ্ধতি।

চতুর্থ অধ্যায় : শিকারি পাখির জীবৎকাল ও মৃত্যুর লক্ষণ।

গ্রন্থকার বালাদি যেভাবে তার বই সাজিয়েছেন, বিন্যস্ত করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, শিকারি পাখিবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিভিন্ন জ্ঞানেরও

সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আসবে প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞান। শিকারি পাখির চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে, তা তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পেটে কৃমি হলে শিকারি পাখি শিকারে দুর্বল হয়ে পড়ে। পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শিকারি পাখির পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ হলো, পাখিটি সর্বদা কোনো বস্তুর সাথে পশ্চাদ্ভাগ ঘষতে থাকবে, শরীরে বিষ্ঠা লেপটে থাকবে। চেহারার ঔজ্জ্বল্য থাকবে না। বিষ্ঠার সাথে কৃমি বের হতেও দেখা যাবে।

শিকারি পাখিকে কত ধরনের পোকামাকড় ক্ষতি করতে পারে, সেটাও তিনি তুলে ধরেছেন। এ আলোচনায় উকুন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, উকুন দুই প্রকার। ছোট ও বড়। বড়গুলোর চেয়ে ছোটগুলোই অধিক পীড়াদায়ক। ছোট উকুন পাখির শরীর অসুস্থ করার জন্য যথেষ্ট। ছোট উকুন সবসময় দেহে লেগে থাকার কারণে পাখি ঠিকভাবে খানাপিনা করতে ও ঘুমাতে পারে না। আর বড় উকুন সাধারণত দেহে এক স্থানে সবসময় থাকে না। সারা দেহে হেঁটে বেড়ায়। ফলে পাখি তুলনামূলক স্বস্তি পায়। তা ছাড়া বড় উকুনগুলো ছোট উকুনগুলোকে খেয়ে ফেলে। উকুন দেহের রস চুষে খায়। চিকিৎসা করা না হলে একপর্যায়ে আক্রান্ত পাখি হাড্ডিসার হয়ে যায়।[২৪৮]

আবদুর রহমান ইবনে বালাদির অভিজ্ঞতা গ্রন্থের পরতে পরতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কোন রঙের পাখি অধিক শিকারি হয়ে থাকে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আমাদের কাছে সে তথ্যও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, আমার মতে, বাজপাখি, শাহিন, ইগল, সাকরের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ও শিকারে দ্রুতগামী হলো হলুদ রঙের পাখিগুলো। এ ছাড়াও তিনি শিকারি পাখির চোখে সুতা লাগানো সম্পর্কেও কথা বলেছেন। এর পদ্ধতি যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনইভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভুল হলে শিকারি পাখির চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। আমি শুধু এই ভুলের কারণেই অনেক শিকারি পাখির চোখ অন্ধ দেখেছি।

আবদুর রহমান ইবনে বালাদির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো গ্রন্থে এসেছে মূলত দুইভাবে—

২৪৮. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু*, পৃ. ৮৪-৮৫

এক. জনশ্রুতি ও সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে।

দুই. শিকারি পাখিবিজ্ঞান নিয়ে পূর্ববর্তীদের লিখিত গ্রন্থ থেকে।

তিনি পাখিবিজ্ঞানে সামসময়িক অনেক অভিজ্ঞজন থেকে উপকৃত হয়েছেন। যেমন গুনাইম ইমাদি, ইউসুফ বাজিয়ার প্রমুখ।

তার গ্রন্থে ফিরিঙ্গি শিকারির থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা দেখতে পাই। কখনো তিনি বলেন, আমি ফিরিঙ্গি শিকারবিদকে বলতে শুনেছি...। আবার মাঝে মাঝে বলেন, ফিরিঙ্গি শিকারবিদ বলেছেন...। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি যখন প্রথম বর্ণনার ধরন অবলম্বন করেন, তখন কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়া কোনো ফিরিঙ্গি শিকারির কথা হুবহু উল্লেখ করেন। আর যখন দ্বিতীয় ধারায় উদ্ধৃতি দেন, তখন হয়তো নির্দিষ্ট কোনো লেখক বা অনির্দিষ্ট কোনো লেখকের উদ্ধৃতির সারকথা তুলে ধরেন। তার রচিত *আল-বাইজারা* গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে পরবর্তী যুগের। তাই তিনি পূর্ববর্তীদের বিশাল জ্ঞানভান্ডার থেকে উপকৃত হয়েছেন। এমনকি এ নিয়ে রচিত জনশ্রুতিও তিনি উল্লেখ করেছেন।

তিনি এই গ্রন্থে যেসব উৎস থেকে উপকৃত হয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে সাধারণত কারও গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নাম উল্লেখ করেন। যেমন আদহাম ইবনে মুহরিয বাহেলি, গিতরিফ ইবনে কুদামা গাসসানি, মাহদি ইবনে আসরাম (*কিতাবুস সাইদ* গ্রন্থের লেখক), মুহাম্মাদ ইবনে উমর বাজিয়ার, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইস্পাহানি, বাজিয়ার ফিরিঙ্গি, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দি প্রমুখ।

এই বিষয়ে যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম গিতরিফ ইবনে কুদামা গাসসানি। তিনি রচনা করেছেন শিকারি পাখিবিজ্ঞান নিয়ে *যাওয়ারিত তাইর* নামক একটি গ্রন্থ। এখানে তিনি সূক্ষ্ম বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন, যা থেকে তার চিন্তার গভীরতা ও জ্ঞানের বিস্তৃতি বুঝে আসে। পাকস্থলীর কৃমি সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি দেখেন, শিকারি পাখি খাদ্যের অর্ধেক খেয়ে ফেলে দিচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে, পেটে কৃমি আছে।[২৪৯]

---

২৪৯. *দাওয়ারিত তাইর লি-গিতরিফ ইবনে কুদামা গাসসানি*, ফ্রাংকফুর্ট, ১৯৮৪ খ্রি.

তেমনইভাবে তিনি অন্ত্রের কৃমি সম্পর্কে বলেন, যদি দেখেন, পাখির কাঁধের দিকে ফুলে উঠেছে, তাহলে জেনে রাখুন, তার পেটে বড় চওড়া কৃমি রয়েছে, যা শিশুদের পেটে মাঝে মাঝে জন্ম নেয় । দেখতে লাউয়ের বিচির মতো চ্যাপটা। তিনি আরও বলেন, যদি দেখেন, পাখি নিজের নিতম্বের পালক কোনো কিছুর সাথে ঘষে তুলে ফেলতে চাচ্ছে কিংবা উরুর পালক তুলে ফেলছে তাহলে বুঝে নিতে হবে, তার কৃমি হয়েছে।

গিতরিফের অমূল্য পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, স্বর্ণযুগে মুসলিমগণ অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই পৌঁছেছিলেন শ্রেষ্ঠ ফলাফলে। প্রথমদিকে পাখির মাধ্যমে শিকার করা কেবল একটা সহজাত শখ ছিল মুসলিম সমাজে। তারপর সেই শখের মৌলিক নীতিমালা প্রণীত হলো। সেখান থেকে উৎকর্ষ লাভ করে এটি পরিণত হলো স্বতন্ত্র এক বিজ্ঞানে। এই সবকিছু পাখিবিজ্ঞানে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়। একইসাথে পাখিবিজ্ঞানে অন্য সকল জাতি থেকে মুসলিমজাতির এগিয়ে থাকারও জানান দেয়। এজন্যই তো আমরা লক্ষ করি যে, ইউরোপের রেনেসাঁস যুগে মুসলিমদের পাখিবিজ্ঞানবিষয়ক অনেক গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই অনূদিত গ্রন্থগুলো সারা ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ছড়িয়ে গিয়েছিল শিকারি পাখি দিয়ে শিকার করানোর বিদ্যা।

❁❁❁

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা

মুসলিমগণ অনেক জ্ঞানেই উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তাদের জ্ঞানগত অর্জন নিছক ভাসাভাসা ছিল না। তাদের চর্চা থেমে ছিল না জ্ঞানসাগরের তীরে। বরং তারা ছিলেন জ্ঞানসাগরের ডুবুরি। সিন্ধু সেঁচে তারা মুক্তো তুলে এনেছেন। অথচ পাশ্চাত্যের কিছু গবেষক মুসলিমদেরকে ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী বলে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে!

এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, বংশগতিবিদ্যা আদতে একটি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। প্রতিনিয়তই এ সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আমাদের সামনে আসছে। এতৎসত্ত্বেও কুরআন-হাদিসের অনেক উদ্ধৃতি দেখে আমরা বুঝতে পারি, বংশগতিবিদ্যা আসলে উৎপত্তি ও বিকাশগত দিক থেকে মুসলিমদের অবদান। বংশগতিবিদ্যায় পশ্চিমাদের তুলনায় মুসলিমগণ ১৩০০ বছর এগিয়ে আছে। গুপ্ত এই রহস্য আমরা এখনই জানতে পারব। এখানে বংশগতিবিদ্যায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে আমরা দুটি শিরোনামে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

- বংশগতিবিদ্যায় মুসলিমদের অবদান
- ভ্রূণবিদ্যায় মুসলিমদের অবদান

❁❁❁

প্রথম অনুচ্ছেদ

বংশগতিবিদ্যায় মুসলিমদের অবদান

ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মানবতার জন্য রহমত ও আশীর্বাদ হয়ে। ইসলাম তার অনুসারীদের অগ্রগামিতা ও নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করে। বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের জগতে সৃজনশীলতা ও নতুন আবিষ্কারে আগ্রহ জোগায়। এজন্যই মানবতার পথে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সভ্যতাগত অবদানের স্বীকৃতি দেয় ইনসাফগার প্রতিটি জাতি।

সম্ভবত বর্তমান পৃথিবীতে এটাই প্রচলিত ইতিহাস যে, জেনেটিক্স একটি নতুন ও আধুনিক বিজ্ঞান। অন্যান্য জীবনঘন অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের মতো এটিরও উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে আধুনিককালে; যেমন ফিজিয়োলজি, ভ্রূণবিদ্যা, কোষবিদ্যা, প্রজনন জীববিজ্ঞান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিনগত উন্নয়নের বিজ্ঞান ইত্যাদি। সকল স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে এই ইতিহাসই পড়ানো হচ্ছে। অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে (১৮২২-১৮৮৪ খ্রি.) এই বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। বলা হয়, তিনি এটি আবিষ্কার করেছেন। প্রণয়ন করেছেন এর মৌলিক নীতিমালা। পরবর্তীকালে এর বিকাশ ঘটে পশ্চিমা জীববিজ্ঞানী হিউগো মারি ডি ভ্রিস, উইলিয়াম বেটসন, টমাস হান্ট মর্গান প্রমুখের হাতে।

তবে জেনেটিক্সের সঠিক ইতিহাস যদি আমরা খুঁজতে যাই, তাহলে দেখি, কুরআন ও সুন্নাহে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের বহু পূর্বে এমনসব ইঙ্গিত রয়েছে, যা আধুনিক আবিষ্কারের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন ইঙ্গিতের মাধ্যমে মানুষের জিনগত প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক গঠনের জন্য বর্তমানে একেই দায়ী করা হয়।

ইতিহাস সাক্ষী, আধুনিক বংশবিদ্যা বিকাশের বহুপূর্বে মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞানীদের হাতে বিকশিত হয়েছিল 'কিয়াফা'[২৫০]-এর বিজ্ঞান।

তারা ইউজেনিক্স[২৫১] ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। জেনেটিক নির্বাচনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন আরবীয় ঘোড়ার ওপরে। মানুষ, প্রাণী ও পাখির মধ্যে সংকরায়ণ নিয়ে তারা গবেষণা করেছিলেন। ইসলাম কেন আত্মীয়স্বজনকে বাদ দিয়ে অপরিচিত মানুষের সাথে বিবাহবন্ধনের কথা বলে, এর রহস্যও তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।[২৫২]

বলে রাখা উচিত, বংশগতিবিদ্যা মূলত জীববিজ্ঞানের একটি শাখা। এখানে গবেষণা করা হয় জিনতত্ত্ব নিয়ে। পিতামাতার থেকে সন্তানদের দেহে স্থানান্তরিত জিনগত বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোজোমের পার্থক্যের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, দুই প্রজন্মের মধ্যে মিল ও অমিলের কারণ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা হয় বংশগতিবিজ্ঞানে।

পরবর্তী সময়ে এই বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। মানবজীবন ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিভক্ত হয়েছে। যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারা ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নতকরণ। কারণ এগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হলে মানবজাতিরই উপকার হবে।

আমরা যদি সূচনায় চলে যাই, তাহলে দেখতে পাব, মূলত মুসলিমদের মাঝে বংশগতিবিদ্যার সূচনা হয়েছে 'কিয়াফা'-র মাধ্যমে। ইসলামি সভ্যতার বিভিন্ন গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনাও এসেছে। এর আলোচ্য বিষয় হলো, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে মিল-অমিলের গবেষণা। কাযবিনি তার বিখ্যাত *আজাইবুল মাখলুকাত ওয়া গারাইবুল মাওজুদাত* গ্রন্থে বলেছেন, কিয়াফা দুই প্রকার—

এক. কিয়াফাতুল বাশার

দুই. কিয়াফাতুল আসার

---

২৫০. **কিয়াফা :** কিয়াফার শাব্দিক অর্থ চিহ্ন ধরে অনুসরণ। কায়েফ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখে পিতা-সন্তানের সম্পর্ক নির্ণয় করে দিতে পারেন। এই বিদ্যাকে আরবিতে কিয়াফা বলা হয়।

২৫১. **ইউজেনিক্স :** বিজ্ঞানের যে শাখায় পরিণামদর্শী প্রজননপদ্ধতি দ্বারা সুজাত ও উন্নত গুণসম্পন্ন মানবসন্তান লাভের উপায় বর্ণিত হয়ে থাকে, তাকে ইউজেনিক্স বলে।

২৫২. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি, শাইয়ুম মিনাল মাযি আম যাদুন লিল আতি*, পৃ. ৬৯-৭০

কিয়াফাতুল বাশার হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি দেখে মানুষের পরিচয় বের করা। আর কিয়াফাতুল আসার হলো, মানুষের পায়ের ছাপ, মোজা বা জুতার মধ্যে পায়ের চিহ্ন দেখে পরিচয় চিহ্নিত করা।[২৫৩]

আরব সভ্যতায় বনু মুদলিজ[২৫৪] 'কিয়াফা' বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। এমনকি মুদলিজ বংশের কারও সামনে শিশু ও তার মা-সহ ২০জন নারী উপস্থিত করা হলে শিশুর প্রকৃত মা তারা নির্ণয় করে দিতে পারত।

এ নিয়ে বিখ্যাত একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি ঘটেছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে। উসামা ইবনে যায়দ রা.-এর ঘটনা। তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের। কিন্তু তার পিতা ছিলেন গৌরবর্ণের। এরপরও মুদলিজ বংশের কিয়াফা বিশারদ মুজাযযিয রা. তাদের বংশীয় সম্বন্ধ বের করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি আম্মাজান আয়েশা রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন। বললেন, হে আয়েশা, মুজাযযিয মুদলিজি এসেছিল। উসামা আর যায়দের মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল। কিন্তু তাদের পা খোলা ছিল। সে পা দেখেই বলে দিলো, তাদের পরস্পরের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।[২৫৫]

পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ কুরআন-হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান জিনগত তথ্য প্রথমবারের মতো শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. (মৃ. ১৩৫০ খ্রি.) *তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ* গ্রন্থে লিখেছেন, জীবের গঠনের মূল উৎস হলো স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে পুরুষের শুক্রাণুর মিলন।[২৫৬] এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

২৫৩. *আজাইবুল মাখলুকাত লি কাযবিনি*, পৃ. ২০৪
২৫৪. বনু মুদলিজ : কিনানা বংশের একটি গোত্র। এ গোত্রে অনেক কিয়াফা পারদর্শী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *লিসানুল আরব*, ২/২৭২
২৫৫. *সহিহ বুখারি*, ৬৩৮৯; *সহিহ মুসলিম*, ১৪৫৯
২৫৬. *তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ*, ১/২৭৮

তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। তার কোনো সন্তান হবে কী করে, যখন তার কোনো স্ত্রী নেই? তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। [সুরা আনআম : ১০১]

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, সন্তান জন্ম হয় নারী-পুরুষের সমন্বিত উপাদান থেকে। কুরআন আমাদের অবহিত করছে যে, ভ্রূণ সৃষ্টির মূল হলো মিশ্রিত শুক্রবিন্দু। এটি মানব প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক জেনেটিক ফ্যাক্টর। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

[সুরা দাহর : ২]

মিশ্র শুক্রবিন্দু গঠিত হয় নারীর ডিম্বাণু ও পুরুষের শুক্রাণুর সংমিশ্রণে। আধুনিক বিজ্ঞান এটাকে বলে জাইগুট (zygote)। এটি স্থিত হয় নারীর গর্ভে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾

অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। [সুরা মুমিনুন : ১৩]

ড. আহমাদ ফুআদ পাশা বলেছেন, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব। কারণ আধুনিক বিশ্বে মানুষ নারী ও পুরুষের সম্মিলিত শুক্রবিন্দু বা জাইগুট সম্পর্কে মাত্র কিছুদিন আগে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি ও মাইক্রোস্কোপ প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর—জানতে পেরেছে। অন্যদিকে ইসলাম এ সম্পর্কে বলে গিয়েছে হাজার বছর আগে।

ভ্রূণগঠন ও বিকাশ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে পাশ্চাত্য বহু বছর ডুবে ছিল অজ্ঞতার ঘোরে। কেউ মনে করত, শিশুর জন্ম হয় কেবল নারীর ডিম্বাণু থেকে। কেউ আবার মনে করত, জীব কেবল শুক্রাণু থেকে উদ্ভূত হয় এবং বিকাশ লাভ করে। তাদের একজন হলো নিকোলাস হার্টসোকার।

বীর্যকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষাকালে নিকোলাসের মনে হয়েছিল, শুক্রাণুর মাথার মধ্যে একটি ছোট জীব আছে, যা মানুষের বাহ্যিক গড়নের মতো। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট এই জীবটিই উপযুক্ত পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং বিকাশ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে নারীর কোনো ভূমিকা নেই। নারী কেবল ওই শুক্রাণু বেড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেয়।[২৫৭]

এখান থেকে বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্যের গবেষকদের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ১৩ শতাব্দী পূর্বেই ইসলাম এ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেছে এবং মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সেটাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

❁ ❁ ❁

২৫৭. *আমালু নাদওয়াতিত তুরাসিল ইলমিয়্যিল আরাবিয়্যি*, ডিসেম্বর ১৯৯০ খ্রি.। লেখক বর্ণনা করেছেন *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু, শাইয়ুম মিনাল মাযি আম যাদুন লিল আতি* থেকে, পৃ. ৭১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ভ্রূণবিদ্যায় মুসলিমদের অবদান

ভ্রূণসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ইতিহাসের দিকে। আমরা দেখতে পাই, খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলে গিয়েছেন যে, পুরুষের বীর্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন উপাদান আছে, যা মূলত মানবদেহের একেকটি অংশ। তেমনইভাবে তা নারীর বীর্যতেও বিদ্যমান।[২৫৮] ড. আহমাদ ফুআদ পাশা বলেছেন, ইমাম ইবনুল কাইয়িমের এই অল্প কটি কথাই ভ্রূণতত্ত্বের ভিত্তি, যা আমরা আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ববিদদের গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারি।[২৫৯]

ইবনুল কাইয়িম যা বলে গিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞান তার নাম দিয়েছে জিন (Genes)। সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে এই জিনগুলো জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় বহন করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছে যে, এই ক্রোমোসোম ও জিনগুলো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, শারীরিক, মানসিক বিভিন্ন গঠনের জন্য দায়ী।[২৬০]

ভ্রূণবিদ্যায় মুসলিমগণ আরও গভীরে পৌঁছেছিলেন। জিনগত বৈশিষ্ট্যে উৎসগত প্রবণতা (Atavism) সম্পর্কে তারাই প্রথম জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেটি আমরা বুঝতে পারি তবারির লেখা *ফিরদাউসুল হিকমা* গ্রন্থ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক নারীর বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণ হাবশি পুরুষের সাথে। তাদের একটি মেয়ে জন্ম নিয়েছিল, সে ছিল ফরসা। এই মেয়ে যখন বড় হয়, তখন তার বিয়ে হয় এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সাথে। কিন্তু তাদের এক ছেলেসন্তান হয়, যে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ। কারণ হিসাবে তবারি বলেন, ছেলেটি তার কৃষ্ণাঙ্গ নানার জিনের অধিকারী ছিল।[২৬১]

---

২৫৮. *তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ*, পৃ. ২৭৭

২৫৯. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু, শাইয়্যুম মিনাল মাযি আম যাদুন লিল আতি*, পৃ. ৭

২৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

২৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

জিনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে উৎসগত প্রবণতা লাভ করার বিষয়টি আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকেও বুঝতে পারি। নবীজির কাছে এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার স্ত্রী কৃষ্ণাঙ্গ শিশু প্রসব করেছে। নবীজি বললেন, তোমার কি কোনো উট আছে? সে বলল, জি। নবীজি বললেন, সেটার রং কী? সে বলল, লাল। নবীজি বললেন, সেটার বাচ্চাদের মধ্যে কি ছাইবর্ণের কোনো উট নেই? সে বলল, আছে। নবীজি বললেন, লাল উট থেকে ছাইবর্ণের বাচ্চা কীভাবে এলো? সে বলল, হয়তো পূর্ববর্তী বংশের দৈহিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। নবীজি বললেন, হয়তো তোমার ছেলেটিও তার পূর্বের কোনো পুরুষের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে।[২৬২]

এই হাদিসে স্পষ্টভাবে জিনতত্ত্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। বংশগতির ধারক ও বাহক ক্রোমোজোমসংক্রান্ত এই আলোচনা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় করা হয়।

আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সন্তান ও পিতামাতার মাঝে সাদৃশ্য কখনো কখনো স্পষ্ট থাকে না। কারণ আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলি আদম ও হাওয়া আ. থেকে চলমান।[২৬৩] আমাদের মা-বাবার বিপরীতমুখী দুটি বৈশিষ্ট্যের একটি আমাদের শরীরে প্রকটভাবে প্রকাশিত হলে অন্য বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। পরবর্তী প্রজন্মের কারও না কারও ক্ষেত্রে এই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি প্রকট হয়ে প্রকাশিত হতে পারে। এজন্যই উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নিকটাত্মীয়ের মাঝে বিয়ে করতে নিরুৎসাহিত করেছেন, যেন বংশ দুর্বল না হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, তোমরা দূরের মানুষকে বিয়ে করো। বংশ দুর্বল করো না।[২৬৪]

---

২৬২. *সহিহ বুখারি*, ৬৪৫৫; *সহিহ মুসলিম*, ১৫০০

২৬৩. **প্রকট (Dominant) ও প্রচ্ছন্ন (Recessive) :** একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবে সংকরায়ণ ঘটলে প্রথম অপত্য বংশে সংকর জীবে ওই বৈশিষ্ট্যদুটির যেটি প্রকাশিত হয় তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্য সুপ্ত থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন বাবা যদি লম্বা হয় আর মা যদি খাটো হয় এবং তাদের সন্তান যদি লম্বা হয়, এ ক্ষেত্রে বাবার লম্বা বৈশিষ্ট্যকে প্রকট ও মায়ের খাটো বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলা হবে। প্রকট-প্রচ্ছন্ন জিনগুলো হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থান করে।

২৬৪. *আল-ইজাযুল ইলমিয়্যু ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা লি যগলুল নাজ্জার*, পৃ. ২৮৬

ইসলাম মুসলিমদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে অপরিচিত ব্যক্তিদের বিয়ে করতে।[২৬৫] কারণ এতে সন্তান হয় বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান। সেটা তাদের এই প্রবাদবচন থেকেও স্পষ্ট হয়—চাচাতো বোন ধৈর্যশীলা, ভিন বংশীয় মেয়ের সন্তান জন্মদানক্ষমতা বেশি, আর অপরিচিত মেয়ের সন্তান শত্রুর ওপর আঘাত হানতে অধিক সক্ষম।[২৬৬]

এজন্যই আরবের এক কবি লিখেছেন, আমি চাচাতো বোনকে এড়িয়ে গিয়েছি—যদিও সে আমার প্রেমাস্পদ—এই ভয়ে যে, আমার বংশধর হয়তো দুর্বল হয়ে পড়বে।[২৬৭]

অপরিচিত ব্যক্তিকে বিয়ে করার প্রতি ইসলামের এই যে উদ্‌বুদ্ধকরণ, এর সাথে পুরোপুরি একমত আধুনিক জেনেটিক্স ও জেনেটিক ইমপ্রুভমেন্টতত্ত্ব। বংশের আত্মীয়দের সাথে ক্রমাগত বৈবাহিক মিলনের ফলে জন্মক্ষমতা হ্রাস হয়। কখনো এটিই কারণ হয়ে দাঁড়ায় বন্ধ্যাত্বের। এ ছাড়াও এটি দুর্বল করে দেয় বংশধারা। প্রতিটি বংশের কিছু নৈতিক ও দৈহিক রোগ থাকে। বংশের অভ্যন্তরে বিয়ের ফলে এই মন্দ বংশগত বৈশিষ্ট্য ও রোগগুলোর উত্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। শারীরিক রোগের মধ্যে আছে, জিনগত কুষ্ঠরোগ, কালো প্রস্রাব, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মানসিক রোগ, রেটিনার রোগ, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা, এ ছাড়াও জন্ম ও অভ্যাসগত অন্যান্য ত্রুটি।[২৬৮]

জেনেটিক্সে বর্তমানে যাকে বলা হয় সংকর, তাতেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। জীববিজ্ঞানের ভাষায়, দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজননের ফলে উদ্ভূত নতুন প্রজন্মকে ওই দুই প্রজাতির সংকর (হাইব্রিড বা ক্রসব্রিড) বলে। সংকরজীব তাদের নিজস্ব গুণাবলির অধিকারী হতে পারে।

---

২৬৫. নিকটাত্মীয়কে বিয়ের ফলে সন্তানের মধ্যে নানা বংশগত রোগের ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বিশেষত জিনবাহিত বংশধারার রোগগুলোর প্রকোপ অনেক বেড়ে যায়। অসুস্থ জিনগুলোর কার্বন কপি যখন মা-বাবা দুই বাহক থেকে সন্তানে বাহিত হয়, তখন তা তীব্র আকারে প্রকাশ পায়।-সম্পাদক

২৬৬. *আল-মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, ৪/২৭৭; *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, ৮/২৩০

২৬৭. *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন*, পৃ. ১৭৩

২৬৮. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু*, পৃ. ৭৫

অনেক ক্ষেত্রে সংকরটি তার পিতামাতা থেকে ভিন্ন এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যও দেখাতে পারে।

এই পদ্ধতিতে মুসলিমদের অগ্রগামিতা রয়েছে। বিশেষত প্রাণীদের মধ্যে। মুসলিমদের জ্ঞানগত বিশাল ভান্ডারে এই ধরনের ক্রসব্রিডিংয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়। কাযবিনি তার গ্রন্থে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সংকর প্রাণী উৎপন্ন হয় দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর আন্তঃপ্রজননের ফলে। দুই ধারার প্রাণীর আকৃতি সংমিশ্রিত হয়ে তৈরি হয় অদ্ভুত আরেক প্রজাতি। যেমন খচ্চর। খচ্চরের প্রতিটি অঙ্গই ঘোড়া ও গাধা, দুটোর সাথে কিছুটা মিল রাখে।[২৬৯] সংকর পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে গবেষক জাহিয বিশুদ্ধ জ্ঞানগত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্ট যৌগিক প্রাণী কখনো কখনো মূলধারার চেয়ে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়।[২৭০]

কিছু জিনগত বৈশিষ্ট্য বাছাই করে ইউজেনিক্সেও মুসলিমরা দুর্দান্ত ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে এটি জেনেটিক উন্নতির বিজ্ঞান (Eugenics) নামে পরিচিত। তারা নির্দিষ্ট জিনগত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৌলিক বংশোদ্ভূত ঘোড়ার মধ্যে প্রজনন করাতে আগ্রহী ছিল। ঘোড়ার এলোমেলো প্রজনন তাদের পছন্দ ছিল না। যেন তারা ঘোড়াগুলোর দুর্দান্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য যেমন তৎপরতা, সৌন্দর্য, স্বচ্ছ অনুভূতি, চৌকশ বুদ্ধি ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল আরবীয় ঘোড়ার অনবদ্য বৈশিষ্ট্য।[২৭১]

ইসলাম ভ্রূণতত্ত্বের আলোচনায় নিছক বাহ্যিকতা ও বস্তুবাদিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইসলাম সাব্যস্ত করেছে যে, মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্যের সাথে আদর্শিক গুণাবলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের সামাজিক আচরণ ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির পেছনেও জিনগত বৈশিষ্ট্য দায়ী। একটি বর্ণনায় এসেছে, মানুষ বিভিন্ন বংশে বিভক্ত। বংশীয় গুণ প্রবাহিত হয়। মানুষ হলো সোনা-রুপার খনির মতো। বংশ প্রভাব বিস্তারকারী। অসদ্‌গুণের ক্ষেত্রে বংশেরও দায় আছে।[২৭২] এই কথার সমর্থন আমরা একটি সহিহ হাদিসেও

---

২৬৯. *আজাইবুল মাখলুকাত*, পৃ. ২০৪
২৭০. *আল-হায়াওয়ান লিল জাহিয*, ১/১৩৭
২৭১. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু*, পৃ. ৭৪
২৭২. *শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি*, ৭/৪৪৫; *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া*, ২/১২৭

দেখতে পাই। আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

> তোমাদের বীর্যের জন্য উত্তম ক্ষেত্র নির্বাচন করো। বিয়ে করো সমপর্যায়ে এবং বিয়ে দাও উপযুক্তের কাছে।[২৭৩]

ড. যগলুল নাজ্জার এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, উপযুক্ততা কেবল পাত্রপাত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ না। বরং নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকটিও বিবেচনায় রাখা হবে। কারণ জিনতত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি, পূর্ববর্তী দূর প্রজন্মের ব্যক্তির প্রভাবও মানুষের মধ্যে পড়তে পারে। মানুষ যে বংশধারায় বড় হয়, সেটা তার নৈতিক গঠন, আচার ও শিষ্টাচারে অন্যতম ভূমিকা রাখে।[২৭৪] এজন্য বলা হয়, ব্যবহারে বংশের পরিচয়।

এভাবে আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আধুনিক আবিষ্কৃত ভ্রূণতত্ত্বের কিছু বিষয় সম্পর্কে মুসলিমগণ ধারণা পেয়েছিলেন, যদিও তা আংশিক। এই ধারণা যেমন এসেছে কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে, তেমনই এসেছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। আমরা প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে পূর্বসূরিদের সেই মর্যাদা ও উচ্চতর সভ্যতা ফিরিয়ে দিন। যেন মুসলিমজাতি তাদের পূর্বপুরুষদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে বর্তমান বিশ্বসভ্যতার নেতৃত্ব দিতে পারে।

❁❁❁

---

২৭৩. *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ১৯৬৮; *আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম*, ২৬৮৭

২৭৪. *আল-ইজাযুল ইলমিয়্যু ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, পৃ. ২৯৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরজীবীবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

পরজীবীবিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের আগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করেছেন, এ কথা শুনে আমাদের কেউ কেউ ভুল ভাবতে পারে। ভুল ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কেননা পরজীবীবিজ্ঞান হচ্ছে পরজীবী, তাদের বাহক এবং উভয়ের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আলোচিত বিজ্ঞান।[২৭৫] এখানে ছোট্ট ও সূক্ষ্ম জীবাণু, কৃমির ডিম, শূককীট ও তার বিকাশ এবং এসবের কারণে সৃষ্ট রোগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আমাদের ভুল ভেঙে যাবে এ কথা শুনে যে, মুসলিমগণ এ ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাই নয়, বরং এই বিজ্ঞানের ছোট-বড়, সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রায় সকল বিষয়েই তারা বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন। তারা পরজীবীবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই, এর মধ্য দিয়ে ইসলামি সভ্যতার উচ্চমার্গীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ কেবল ধর্মীয় উদ্ধৃতিনির্ভর জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বসে থাকেননি—ধর্মীয় জ্ঞানের তাৎপর্য অনস্বীকার্য—বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পরীক্ষানিরীক্ষানির্ভর জ্ঞানের অঙ্গনেও তাদের সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। আমরা পরজীবীবিজ্ঞানে মুসলিমদের কৃতিত্ব তুলে ধরব দুটি আলোচনার মাধ্যমে—

- মুসলিমগণই পরজীবীবিজ্ঞানের প্রথম আবিষ্কারক
- পরজীবীবিজ্ঞানে মুসলিম চিকিৎসকদের অবদান

---

২৭৫. জীববিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা—যেমন কোষ জীববিজ্ঞান, জৈব তথ্যবিজ্ঞান, জৈবরসায়ন, আণবিক জীববিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব, বিবর্তন এবং বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদির সাথে পরজীবীবিজ্ঞানের গভীর সংযোগ রয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুসলিমগণই পরজীবীবিজ্ঞানের প্রথম আবিষ্কারক

মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনায় কারও ধারণা হতে পারে যে, বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান নিছক অতীতের অভিজ্ঞতা, যার গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতা সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে। আধুনিক সভ্যতায় সেসবের কোনো মূল্য নেই।

অথচ বাস্তবিকপক্ষে ইনসাফের কথা হলো, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের ধারায় আমরা যত উন্নতি-অগ্রগতি চারদিকে দেখতে পাই, তা প্রাচীন বিজ্ঞানের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই না, যার অনেকটা মুছে গিয়েছে কালের বিবর্তনে। যদি প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিক কোনো অভিজ্ঞতা, বিশেষভাবে মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের অবদান আধুনিক সভ্যতার সামনে না থাকত, তাহলে এমন অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

মুসলিমদের হাতে যেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরজীবীবিজ্ঞান (parasitology)। এই জ্ঞানকে বর্তমানে আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে মনে করা হয়। অথচ এই বিজ্ঞানের সূচনা মুসলিমদের হাতেই।

জীবজগতের জীবনধারণের জন্য প্রথম প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। তারপর খাদ্য। কোনো কোনো জীব নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে পারে। আবার অনেক জীব খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এমনইভাবে কোনো কোনো জীবের নিজস্ব পরিবেশ রয়েছে এবং বিপরীতক্রমে অনেক জীব অন্য জীবের অনুকূল পরিবেশকে নিজের পরিবেশ হিসাবে গ্রহণ করে।

জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনযাপন করে থাকে। এ ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় একটি জীব জীবনধারণের জন্য অন্য জীবের ওপর নির্ভর করে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দুটি জীবের মধ্যে যে জীবটি জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য জীবের ওপর নির্ভর করে তাকে পরজীবী (parasite) বলা হয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে

পরজীবী বলতে পরের ওপর নির্ভর করে জীবনধারণকারী প্রাণীকে বোঝায়। আশ্রয়দাতা জীবটি হলো বাহক। দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে জীবনযাপনের এ বিশেষ ধরনের সম্পর্ককে পরজীবীতা (parasitism) বলা হয়।

কোনো সন্দেহ নেই, শুরুতে এই বিজ্ঞান অনেকটা সরল প্রকৃতির ছিল। বর্তমানের মতো এতটা বিস্তৃতি তখন ছিল না। মুসলিম চিকিৎসকগণ কীট নিয়ে গবেষণা করেছেন বটে, তবে তাদের গবেষণা ছিল খালি চোখে দেখা যায় এমন কীটপতঙ্গের ওপর। তাদের কাছে তো আর আমাদের যুগে প্রচলিত মাইক্রোস্কোপ ছিল না, যার মাধ্যমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুও দেখা সম্ভব।[২৭৬]

মুসলিমদের নিকট আধুনিক সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও তারা কৃমি সম্পর্কে আলোচনা করতে পেরেছেন। সূক্ষ্মভাবে এর উপসর্গ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। কৃমি সাধারণত শিশু-কিশোরদের পেটে উৎপন্ন হয়। সন্ধ্যায় ও ঘুমের সময় বেশি বিরক্ত করে। কৃমির লক্ষণগুলোও মুসলিমগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন খাদ্যের ব্যাপারে অনীহা, প্রচণ্ড অস্থিরতা, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, পেট ফেঁপে ওঠা ইত্যাদি। অসুস্থতা তীব্র হলে রোগী বিছানায় পড়ে যায়। খিঁচুনিও দেখা দেয়। কখনো রোগী এমনভাবে মুচড়ে যায় যেন কেউ তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। কৃমি ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি থাকার কারণে ফুসফুস ও হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণে শুষ্ক কাশি এবং বুক ধড়ফড়ানি হতে পারে। লালা ঝরা কৃমির অন্যতম লক্ষণ। আর ছোট কৃমির লক্ষণ হলো, পায়খানার রাস্তায় অধিক চুলকানি অথবা সুড়সুড়ি অনুভব করা। এজন্য কখনো অস্থিরতায় কাতর হয়ে রোগী চিৎকার করে উঠতে পারে।[২৭৭]

মুসলিম চিকিৎসকগণ এই কৃমির অনেক প্রতিকারও বলে দিয়েছেন। তবে কৃমি চিকিৎসার সাধারণ নীতি ছিল, কৃমির জন্ম হয় এমনসব আর্দ্র চটচটে খাবার থেকে বিরত থাকা। যেমন বিভিন্ন ফল, মটরশুঁটি, দুধ, কাঁচা মাংস ইত্যাদি। এ ছাড়া পাকস্থলীতে এমন কফ তৈরি হতে দেওয়া যাবে না, যা থেকে কৃমি জন্ম নেয়। কৃমি মেরে ফেলার জন্য এমন খাবাবের উপদেশ দেওয়া হতো, যা কৃমির জন্য বিষ হিসাবে কাজ করে। কৃমি মরে যাওয়ার পর, নিজে নিজেই প্রাকৃতিকভাবে ঝরে যেত। কখনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়

---

২৭৬. *আল-মুওজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতি ইনদাল আরব*, পৃ. ৭১

২৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৯৩-২৯৪

ঝরে না গেলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বের করা হতো। পেটে মৃত কৃমি রেখে দেওয়া উচিত না। কেননা তা থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাস মানুষের ক্ষতি করতে পারে।[২৭৮]

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এর বিভিন্ন ওষুধও বলে গেছেন। যেমন ওয়ার্মউড (wormwood) লুপিন, সেলারি বীজ, রসুন, আনারের খোসা, পিচ পাতা ইত্যাদি। ক্লান্তি, কঠোর শরীরচর্চাও কখনো কখনো কৃমি বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহজ করে তোলে।[২৭৯]

ড. আহমাদ ফুআদ পাশার আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেউ যদি মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করে, তাহলে তার সামনে বরাবরের মতো দুঃখজনক একটি সত্য স্পষ্ট হবে। তা এই যে, পরজীবীবিজ্ঞানে মুসলিমদের আবিষ্কৃত অনেক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত আবিষ্কারকের নামগন্ধও তুলে ধরা হয়নি। এটা একে তো চুরি তার ওপর সিনাজুরি। ড. আহমাদ ফুআদ পাশা আরও বলেন, মুসলিমদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই, তারা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছিলেন, মানবদেহের অভ্যন্তরের পরজীবী (Endoparasites) ও শরীরের পৃষ্ঠে বসবাসরত পরজীবী (Ectoparasites) সম্পর্কে। এটা সত্য যে, তারা খালি চোখে সেগুলোর পর্যবেক্ষণ করতেন। কিন্তু এতে তাদের আবিষ্কারের গুরুত্ব কমে যায় না। কারণ তারা রোগের যে লক্ষণগুলো আবিষ্কার করেছিলেন এবং যে প্রতিকার নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল নির্ভুল।

মুসলিম সভ্যতার কিছু গ্রন্থে প্রোটোজোয়া (Protozoa)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বৃহৎ অন্ত্রের প্রাচীর ও গহ্বরে বাস করে এমন অ্যামিবার বিভিন্ন প্রকার। এর ফলে আমাশয় (Dysentery) হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো কিছু রোগের লক্ষণ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি, এই রোগের পরজীবী হলো প্লাজমোডিয়াম।[২৮০]

২৭৮. *আল-মুওজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতি ইনদাল আরব*, পৃ. ৭২

২৭৯. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ৪/১৮৯

২৮০. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু*, পৃ. ৮৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পরজীবীবিজ্ঞানে মুসলিম চিকিৎসকদের অবদান

আবু বকর রাযি (মৃ. ৩১১ হি./৯২৩ খ্রি.) মুসলিম সভ্যতার একজন মহান চিকিৎসক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার অনেক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা সামনে এসেছে। তিনি বর্তমানে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের কিংবদন্তি হিসাবে বিবেচিত। *আল-হাবি ফিত তিব* গ্রন্থে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তদের সম্পর্কে তার ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। ছেড়ে ছেড়ে জ্বর আসা, প্লিহা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া এই রোগের লক্ষণ। তিনি বলেন, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে মনে করবে এই জ্বর কয়েক বারে আসবে। এর মধ্যে দুই ধরনের জ্বর আছে। একধরনের জ্বর একদিন পরপর আসে। আরেক ধরনের জ্বর দুইদিন পরপর ছেড়ে ছেড়ে আসে। প্রথম প্রকার জ্বর প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে আসে। আর দ্বিতীয় প্রকারের জ্বরের শুরুতে কাঁপুনি দেখা দেয় কি না আমার জানা নেই। প্রতিদিন জ্বর আসার ক্ষেত্রে পাকস্থলীর অসুস্থতা দায়ী। আর চারদিন পরপর জ্বর এলে প্লিহা দায়ী।(২৮১)

অন্ত্রের পরজীবী কৃমি নিয়েও মুসলিম বিজ্ঞানীগণ লেখালেখি করেছেন। কৃমির মধ্যে গবেষণা করে তারা চার প্রকারের কৃমির সন্ধান পেয়েছেন। যথা : **এক.** ফিতাকৃমি, **দুই.** বড় কৃমি; বর্তমানে যাকে বলা হয় অ্যাস্কারিস। **তিন.** গুঁড়ো কৃমি। এটি দেখতে পচে যাওয়া পানিতে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার মতো। এর কারণে ক্যালভারিয়াসি রোগ দেখা দেয়। **চার.** বক্রকৃমি বা হুকওয়ার্ম। এগুলোর মধ্যে আছে বিশেষভাবে অ্যানসাইলোস্টোমা প্রজাতি।(২৮২)

এই শাস্ত্রে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা (মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৭ খ্রি.) নতুন নতুন বিষয় সামনে এনেছেন। এই শাস্ত্রে বর্তমান যুগের আবিষ্কৃত অনেক কিছুর কৃতিত্ব মূলত ইবনে সিনার। অ্যানসাইলোস্টোমা পরজীবী তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছেন। *আল কানুন ফিত তিব* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে পাকস্থলীর কৃমিসংক্রান্ত আলোচনায় তিনি বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টি

---

২৮১. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৪/২৮৪

২৮২. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যা*, *শাইয়ুম মিনাল মাযি আম যাদুন লিল আতি*, পৃ. ৮৭-৮৮

বর্ণনা করেছেন। এর নাম দিয়েছিলেন তিনি 'আদ-দুদাতুল মুসতাদিরা'। প্রথম ব্যক্তি হিসাবে তিনিই এ রোগের কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তুলে ধরেছেন এর প্রতিকারও।[২৮৩]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের এ বিশাল অর্জন নিয়ে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ খলিল আবদুল খালিক 'আর-রিসালাহ' ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, ১৯২১ সালে ইবনে সিনার 'আল-কানুন ফিত তিব' গ্রন্থটি ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইবনে সিনাই প্রথম বড়শি-কৃমি আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে আমরা বর্তমানে হুকওয়ার্ম বলি। ইবনে সিনার এই মহান আবিষ্কারের প্রায় ৯০০ বছর পর ১৮৩৮ সালে ইতালীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী অ্যাঞ্জেলো দুবিনি পুনরায় হুকওয়ার্ম আবিষ্কার করেন। অথচ আবিষ্কারক হিসাবে ইবনে সিনার নাম ঢেকে দুবিনির নাম সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বইপুস্তকে দুবিনি হুকওয়ার্মের জনক বনে যায়। এমনকি আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশনও দুবিনিকে হুকওয়ার্মের জনক বলে আখ্যায়িত করে। অথচ রকফেলার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে হুকওয়ার্মসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে! এজন্যই আমি ইবনে সিনার অবদান তুলে ধরলাম, যেন মানুষ তার আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করে। তিনি এমন ক্ষতিকর রোগ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন, যা বর্তমান পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।[২৮৪]

আমরা যদি কৃমি নিয়ে মুসলিমদের লেখালেখির দিকে তাকাই তাহলে আরও দেখতে পাই, তারা এমন পরজীবী কীটের কথাও তুলে ধরেছেন, যাদের বসবাস অন্ত্রে নয়, বরং অন্ত্রের বাইরে। যেমন চোখের পরজীবী, ফাইলেরিয়া কৃমি, যা গোদ রোগের কারণ। ফাইলেরিয়া কৃমি সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেছেন, এই কৃমি পায়ের চামড়ার ভেতরে জন্মায়। ফলে পা হাতির পায়ের মতো ফুলে উঠতে থাকে।[২৮৫]

হিজরি চতুর্থ শতকের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইয়াকুব কাশকারিও এ সম্পর্কে বর্ণনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একধরনের রোগে পায়ের ভ্যারিকোস ভেইনস পচা রক্তে ভরে যায় এবং পা ফুলতে ফুলতে হাতির পায়ের মতো

---

২৮৩. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ৪/ ১৮৬
২৮৪. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু*, পৃ. ১৮০-১৮১
২৮৫. *আল-কানুন ফিত তিব লি ইবনি সিনা*, ৪/৪২৮

বড় হয়ে যায়। এমনকি রোগী হাঁটাচলা করতে পারে না। এই রোগটির নাম গোদ রোগ।[২৮৬]

এখন আসি 'দুদাতুল মাদিনা' রোগের কথায়। প্রাচীন আরবিতে এই রোগের নাম এমনই। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে বলা হয় ড্রাকুনকুলিয়াসিস (Dracunculiasis) যাকে গিনি-ওয়ার্ম ডিজিজও বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই এ সম্পর্কে আলোচনা থাকে। কিন্তু আধুনিক যুগেও এ সম্পর্কে আবু বকর রাযির মতো ভালো বিশ্লেষণকারী পাওয়া দুষ্কর হবে। আরবরা এর নাম রেখেছে মদিনা মুনাওয়ারার (ইয়াসরিব) নামে অথবা নিদেনপক্ষে আরব উপদ্বীপের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে।[২৮৭] আবু বকর রাযি বলেন, গিনি কৃমির রোগ সাধারণত উষ্ণপ্রধান দেশগুলোয় বেশি দেখা দেয়। দূষিত পানির ব্যবহারে এটি সৃষ্ট হয়। উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্ম নেয় এবং অত্যধিক আর্দ্র দেহে বেশি বিস্তার লাভ করে। এই কৃমি বেশি দেখা যায় হিন্দুস্তান ও মিশরে। বড় বড় অঙ্গে এর প্রভাব দেখা দেয়। যেমন কবজি, পা, উরু। আর বাচ্চাদের পার্শ্বদেশে কখনো কখনো এই রোগ দেখা দেয়।[২৮৮]

এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন জাহরাবি (১০৩৬ খ্রি.)। তার আলোচনাটা দেখলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। তিনি বলেন, উষ্ণ দেশগুলোয় এই রোগ সাধারণত পায়ের গোছায় দেখা দেয়। যেমন হিজায-সহ অন্যান্য আরব দেশ। এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয় আর্দ্র দেহের অধিকারী মানুষ। দু-পা ছাড়াও দেহের অন্যান্য অঙ্গেও এই রোগ হতে পারে। এর লক্ষণ হলো আক্রান্ত স্থানে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং পেকে পুঁজ জমে যায়। তারপর গিনি কৃমি ধীরে ধীরে দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। দেখতে গাছের শিকড়ের মতো। তাই যখন সেটা বের হতে থাকবে, তখন সিসার কোনো ছোট কাঠিতে সেটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। এভাবে বেঁধে ফেললে সেটা ধীরে ধীরে বের হতে থাকবে। যখনই একটু বের হবে, সেটা সিসার কাঠিতে পেঁচিয়ে ফেলতে হবে। যদি এভাবে বের হতে হতে বেশি হয়ে যায়, তাহলে বহিরাংশ থেকে খানিকটা কেটে ফেলে দেবে। কিন্তু

২৮৬. ইয়াকুব কাশকারি, *কুন্নাশুন ফিত তিব*, প্রকাশক : মাহাদু তারিখিল উলুমিল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়া, ফ্রাংকফুর্ট, ১৯৮৫ খ্রি.; *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু শাইয়ুম মিনাল মাযি আম যাদুন লিল আতি*, পৃ. ৮৮

২৮৭. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৯৫

২৮৮. *আল-হাবি ফিত তিব লি রাযি*, ৩/৫২৩, ৫২৫

পুরো কৃমি বের হওয়ার আগে গোড়া থেকে কাটা যাবে না। কারণ পুরোটা বের হওয়ার আগেই কেটে ফেললে সেটা মাংসের ভেতর ঢুকে ইনফেকশন তৈরি করবে। এর ফলে গন্ধময় পুঁজ জমে উঠবে দেহে।

এজন্যই এই কৃমির চিকিৎসা ধীরস্থিরভাবে করতে হবে। যেন সম্পূর্ণ কৃমি বেরিয়ে আসে, কৃমির কোনো অংশ ভেতরে না থাকে। এই কৃমি অনেক লম্বা হয়। কখনো কখনো এর দৈর্ঘ্য আড়াই থেকে পাঁচ হাত লম্বা হয়।

কৃমি বের করার সময় যদি সেটা কোনো কারণে গোড়া থেকে ছিঁড়ে যায়, তাহলে অপারেশনের মাধ্যমে সেটা সম্পূর্ণ বের করে আনতে হবে। আক্রান্ত স্থান ওষুধ দিয়ে ফোড়ার মতো পাকিয়ে পুঁজ-পানি বের করে দেবে। মাঝে মাঝে একস্থানে একাধিক কৃমি হয়। বিশেষত যখন পা ও পায়ের জোড়ায় তা প্রকাশ পায়। এগুলোর অনেক মুখ দেখা দেয়। প্রত্যেক মুখেই একটা কৃমি থাকে। এর চিকিৎসাও ঠিক সেভাবে করতে হবে যেভাবে পূর্বে বললাম।[২৮৯]

বলাবাহুল্য যে, এই রোগের চিকিৎসায় জাহরাবি যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, সেটাই আধুনিক যুগে গিনি কৃমির চিকিৎসাপদ্ধতি!

চামড়ার ভেতর যেসব পরজীবী জন্ম নেয়, সেগুলো নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাহরাবি আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। যার শিরোনাম হলো, 'চামড়ার নিচে জন্ম নেওয়া ইল্লাতুল বাকার নামক পরজীবীর বিনাশ'। তিনি বলেন, এই রোগকে আমাদের বিভিন্ন শহরে ইল্লাতুল বাকার (গরুর রোগ) নামে ডাকা হয়। কারণ দেখা যায়, বেশিরভাগ সময় গরুরই এমন রোগ হয়। এই রোগে দেহের মাংস ও চামড়ার মধ্যে ছোট ছোট কৃমির মতো পরজীবী জন্ম নেয়। সেগুলো সারা দেহে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় চামড়ায় হাত দিলে এদের সঞ্চালন অনুভব করা যায়। কখনো চামড়া ফেড়ে বেরিয়েও আসে। দেহের পচে যাওয়া উপাদানে এদের জন্ম।

স্বাভাবিকভাবে এই রোগে ক্ষতির তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে যদি গায়ের মধ্যে বিচরণ করতে করতে মাথা বা চোখে চলে যায়, তাহলে শঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। কখনো কখনো এগুলো মাথায় যায় এবং চোখে যায়। এমনকি চোখ ফুটো করে বাইরেও বেরিয়ে আসে।

---

২৮৯. *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ*, পৃ. ২৯৪; *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ২৯৬-২৯৭

তাই দ্রুত এর চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এর চিকিৎসার স্বাভাবিক পদ্ধতি হলো, চামড়ার মধ্যে যেখানে চলাফেরা অনুভূত হবে সেখানে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলতে হবে, যেন সেখান থেকে ওপরে উঠতে না পারে। এরপর সেই স্থানে অস্ত্রোপচার করে পরজীবী বের করে ফেলতে হবে। যদি কেটে বের করার সময় তা মাংসের ভেতর ঢুকে পড়ে, তাহলে দ্রুত আগুনের তাপ দিয়ে সেখানেই মেরে ফেলতে হবে।[২৯০]

এসব গেল মানুষের অভ্যন্তরীণ পরজীবী নিয়ে আলোচনা। মানুষের দেহের বহিঃস্থ চামড়ায় যেসব পরজীবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেসব নিয়েও মুসলিম চিকিৎসকগণ লিখে গিয়েছেন। যেমন উকুনজাতীয় পোকা, যা চুলে ও পশমের গোড়ায় বেড়ে ওঠে।

এই আলোচনা থেকে আমাদের সামনে চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিম চিকিৎসকদের অবদানের চিত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যুগের বিচারে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ কয়েক গুণ এগিয়ে ছিলেন। অভিজ্ঞতানির্ভর গবেষণার ওপর নির্ভর করেই তারা জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক গভীরে যেতে পেরেছিলেন। মানবতাকে উপহার দিয়েছিলেন অনবদ্য চিকিৎসাসেবা। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি পুনরায় মুসলিমজাতিকে অতীতের গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিন।

পূর্বের অধ্যায়গুলোর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, মুসলিম সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিজ্ঞানেও মুসলিমগণ উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পর্যালোচনা। তাদের পর্যালোচনা ও গবেষণা থেকে উপকৃত হয়েছে পাশ্চাত্য। পশ্চিমারা মুসলিম চিকিৎসক ও গবেষকদের শিষ্যত্ব বরণ করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সবক নিয়েছে। আধুনিক ইউরোপের বিজ্ঞানগত জাগরণে মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের অনন্য ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তারা যে আধুনিক সভ্যতার বিলাসী চাদরে আয়েশি জীবনযাপন করছে তা মূলত পূর্ববর্তী মুসলিম বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগত উৎকর্ষের ফল ও ফসল। আফসোসের বিষয় হলো পরবর্তীকালের মুসলিমগণ সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেননি। এজন্য এখন আমাদের উচিত, ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও একাডেমিক পরিচয়ের নতুন বোঝাপড়ায় অবতীর্ণ হতে হবে।

---

২৯০. *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ*, পৃ. ৬০৫

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম সভ্যতার বিখ্যাত চিকিৎসকগণ

মুসলিম সভ্যতায় জন্ম নিয়েছেন অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী। জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোয় তারা সারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। জ্ঞানে-গুণে তাদের মতো কাউকে ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেনি। তারা যে সভ্যতার ক্রোড়ে বেড়ে উঠেছেন, কর্ম ও অবদানের মাধ্যমে সেই সভ্যতার সঞ্জীবনীশক্তিকে তারা তুলে ধরতে পেরেছিলেন। মেঘভরা আকাশে তারা ছিলেন উজ্জ্বল তারকা। আমরা এই অধ্যায়ে জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের কাছে বরিত এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী, কর্ম ও অবদান নিয়ে আলোচনা করব, যারা ছিলেন ইসলামি সভ্যতার উজ্জ্বল নক্ষত্র। তারা সবাই নিজ নিজ অঙ্গনে সৃজনশীলতার ছাপ রেখেছিলেন। ফলে সকলে তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো :

১. ইবনুন নাফিস : রক্তসঞ্চালনতত্ত্বের আবিষ্কারক

২. ইবনে সিনা : জীবন্ত বিশ্বকোষ

৩. আবু বকর রাযি : ইতিহাসের কিংবদন্তি চিকিৎসক

৪. আবুল কাসেম জাহরাবি : সার্জারি বিজ্ঞানের অগ্রপথিক

৫. ইবনে বাইতার : বিরল প্রতিভার অধিকারী

৬. ইবনে আবি উসাইবিয়া : ইতিহাসবিদ ও চিকিৎসক

৭. ইবনে কাহহাল : চক্ষুচিকিৎসার জনক

৮. ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ : প্রতিভাবান চিকিৎসক

৯. ইবনে যুহর : আন্দালুসের অনন্য প্রতিভা

১০. ইয়াকুব আল-কিন্দি : চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ

১১. আম্মার মাওসিলি : চক্ষুচিকিৎসার অগ্রপথিক

১২. আলি ইবনে আব্বাস মাজুসি : চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকপাল

১৩. ইবনে জাযযার কায়রোওয়ানি : চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষক

১৪. ইবনে মান্দাওয়াই ইস্পাহানি : বিস্ময়কর প্রতিভা
১৫. স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহইয়া মাগরিবি : বিচক্ষণ চিকিৎসক
১৬. বখতেশু-পরিবার : চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রগামী পরিবার
১৭. দাউদ আনতাকি : দৃষ্টিহীন এক উজ্জ্বল প্রতিভা
১৮. নাজিব সমরকন্দি : প্রাজ্ঞ চিকিৎসক
১৯. ইবনে তুফাইল : দার্শনিক চিকিৎসক
২০. ইবনে রিদওয়ান মিশরি : চিকিৎসাশাস্ত্রের বরপুত্র

(১)
ইবনুন নাফিস : রক্তসঞ্চালনতত্ত্বের আবিষ্কারক

ইবনুন নাফিস ছিলেন তার যুগের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। পুরো মধ্যযুগে মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে তিনি ছিলেন প্রথিতযশা ও সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনিই আধুনিক যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভের[২৯১] রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার গবেষণার পথ মসৃণ করে দিয়েছেন। উইলিয়াম হার্ভে সিস্টেমিক ব্লাড সার্কুলেশন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। কিন্তু মানবদেহের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া বিশেষত ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহন (পালমোনারি সার্কুলেশন) প্রক্রিয়াটি প্রথম সম্পূর্ণরূপে এবং বিস্তারিতভাবে ইবনুন নাফিসই বুঝতে পেরেছিলেন। তার আগে রক্ত চলাচল সম্পর্কে কারও সঠিক ধারণা ছিল না।

ইবনুন নাফিস ছিলেন আল্লাহভীরু ও দুনিয়াত্যাগী একজন জ্ঞানতাপস। প্রসিদ্ধ আরব মুসলিম চিকিৎসক, যার হাতে চিকিৎসাশাস্ত্রের বড় বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সাধিত হয়েছে। আজও ইসলামি সভ্যতা ও চিকিৎসাশাস্ত্র তাকে নিয়ে গর্ব করে।

---

২৯১. **উইলিয়াম হার্ভে :** একজন ইংরেজ চিকিৎসক। তিনি ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ এপ্রিল ইংল্যান্ডের ফোকস্টনে জন্মগ্রহণ করেন। শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য অবদানের অধিকারী উইলিয়াম হার্ভে ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে *ডি মটু করডিস* বা *অন দ্য মোশন অব দ্য হার্ট* প্রকাশ করেন। এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও সারাদেহে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনবদ্য কীর্তিময় এক জীবনযাপন করে তিনি ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাজুদ্দিন সুবকি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, চিকিৎসাশাস্ত্রে তার কোনো তুলনা নেই। বলা হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে সিনার পরপরই ইবনুন নাফিসের অবস্থান। এমনকি রোগ প্রতিরোধবিদ্যায় তিনি ইবনে সিনার চেয়েও এগিয়ে।

ইসনাবি বলেছেন, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিকপাল ছিলেন। অতুলনীয় মেধায় হয়ে উঠেছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের অবিসংবাদিত কিংবদন্তি।[২৯২]

গ্রিক বিজ্ঞানী গ্যালেনের কাছে রক্তসঞ্চালনের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না।[২৯৩] তিনি দাবি করেছিলেন, হৃৎপিণ্ডের ডান ও বাম অংশের মধ্যবর্তী সেপটামে

---

২৯২. *তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা*, ১/১০৭

২৯৩. শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গ্যালেনের মতবাদ দেড় হাজার বছর অপ্রতিহত প্রভাবে চিকিৎসাজগতে আধিপত্য করেছে। এই মতবাদ আংশিকভাবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ও আংশিকভাবে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রচিত। গ্যালেনের বহু পূর্ব থেকে জীবজগৎকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল—উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। উদ্ভিদের ধর্ম—বৃদ্ধি, প্রাণীর ধর্ম—বৃদ্ধি ও গতি এবং মানুষের ধর্ম—বৃদ্ধি, গতি ও মননশক্তি। স্টোইক দার্শনিকরা প্রচার করতেন যে, কসমসজাত নিউমা (pneuma) বা বায়ু উপরিউক্ত তিন প্রকার জৈবধর্মের জন্য দায়ী। এই নিউমার যে রূপান্তরের ফলে জৈবধর্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় তার নাম স্বাভাবিক শক্তি (natural spirit)। নিউমার আর এক রূপান্তরের ফলে প্রাণীরা গতিশীল হয়। রূপান্তরিত সেই নিউমার নাম Vital Spirit বা জীবনীশক্তি। নিউমা পুনরায় Animal Spirit বা চিৎশক্তিতে রূপান্তরিত হলে সেই চিৎশক্তির প্রভাবে জীবেরা মননশক্তির অধিকারী হয়। জৈবধর্ম সম্বন্ধে স্টোইকদের এই নিউমাবাদে গ্যালেন বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদের সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরীণ গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে গ্যালেন সুকৌশলে এক অতি-মৌলিক পরিকল্পনা দাঁড় করালেন। পরিকল্পনাটি হচ্ছে এমন—দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকতন্ত্র, যকৃৎ, শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন তন্ত্রের জৈবক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিউমাকে স্বাভাবিক শক্তি, জীবনীশক্তি ও চিৎশক্তিতে পরিণত করা। যকৃতে এই নিউমা স্বাভাবিক শক্তিরূপে, হৃৎপিণ্ডে জীবনীশক্তিরূপে এবং মস্তিষ্কে চিৎশক্তিরূপে বিরাজ করে। বিভিন্ন পর্যায়ে রক্ত এই তিন রকম শক্তি অর্জন করে এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে মানুষের বৃদ্ধি, পুষ্টি, গতি ও মননশীলতা সম্ভব করে থাকে। খাদ্যের সারবস্তু অন্ত্র হতে যকৃতে প্রবেশ করে সেখানে প্রথমত রক্তে পরিণত হয়। এই রক্ত আবার যকৃতের স্বভাবিক শক্তির সংস্পর্শে এসে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করার গুণ অর্জন করে। যকৃতে উৎপন্ন রক্তের কিছু অংশ এবার হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে এবং এখানে তার দূষিত পদার্থ ফুসফুসীয় ধমনিপথে ত্যাগ করে শোধিত হয়। রক্তের দূষিত পদার্থ ফুসফুসীয় ধমনি হতে ফুসফুসে প্রবেশ করে পরে শ্বাসনালিপথে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাইরে নির্গত হয়। এভাবে শোধিত হওয়ার পর শিরাগুলোর মধ্যে রক্ত ইতস্তত সঞ্চালিত হয়। শিরার রক্তের সবটুকুই শিরার মধ্যে থেকে যায় না; এটির এক ক্ষুদ্র অংশ হৃৎপিণ্ডের দুই নিলয়ের অন্তর্বর্তী সেপটাম মাংসপেশির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য ছিদ্রপথে ডান নিলয় হতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ে জীবনীশক্তিরূপে নিউমা বিদ্যমান। নিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া বায়ু বা নিউমা শ্বাসনালি হতে ফুসফুস ও ফুসফুসীয় শিরার মধ্য

অদৃশ্য কিছু ছিদ্র রয়েছে। এই ছিদ্রপথে রক্ত একপাশ থেকে অন্য পাশে যায়। আর ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের ওপর স্পন্দিত হতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ড ও রক্তের উষ্ণতা ঠান্ডা করে দেয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং এটি হৃৎপিণ্ড ও রক্তের জন্য পুষ্টি সরবরাহ করে।

ইবনুন নাফিস পরবর্তীকালে গ্যালেনের এই তত্ত্বের কঠোর বিরোধিতা করেন। তিনি সন্দেহাতীত প্রমাণিত করেন যে, গ্রিক বিজ্ঞানীরা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী রক্তনালি ও ধমনিসমূহের কার্যক্রম বুঝতে পারেননি। কিন্তু তিনি সেগুলোর কার্যরূপ বুঝতে পেরেছেন। তেমনইভাবে ফুসফুস, কৈশিকজালিকা, ধমনি ও শিরা-উপশিরার কাজ সম্যকরূপে বুঝতে পেরেছেন। তিনি ফুসফুসের ছিদ্রসমূহের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। একইসাথে তিনি করোনারি ধমনির কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। করোনারি ধমনি অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ড সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। ডান ভেন্ট্রিকলের রক্ত থেকে হৃৎপিণ্ড পুষ্ট হওয়ার প্রাচীন ধারণা তিনি অস্বীকার করেছেন।

ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহন সম্পর্কে পাঁচ জায়গায় তিনি নিজের মতামত বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি গ্যালেনের মতামতও—যার ওপর নির্ভর করেছিলেন ইবনে সিনা—উল্লেখ করে সাহসিকতার সাথে সমালোচনা করেছেন। এজন্যই জর্জ সার্টন বলেছেন, ইবনুন নাফিসই প্রথম রক্তসঞ্চালনের সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি উইলিয়াম হার্ভের পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন। অথচ উইলিয়াম হার্ভেকে বর্তমানে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক বলা হয়।[২৯৪]

দিয়ে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ে প্রবেশ করে সেইখানে জীবনীশক্তিতে পর্যবসিত হয়। রক্ত ডান নিলয় হতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করার পর Vital Spirit বা জীবনীশক্তির স্পর্শে নতুন গুণের অধিকারী হলে জীবনীশক্তিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট রক্ত ধমনির মধ্যে ইতস্তত সঞ্চালিত হয়ে বিভিন্ন দেহাংশকে ক্রিয়াশীল রাখে। ধমনিতে প্রবাহিত রক্তের কিছু অংশ আবার মহাধমনিপথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে চিৎশক্তি অর্জন করে। মস্তিষ্কে রক্তকে চিৎশক্তির গুণ অর্জন করতে rete mirabile নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবাহী নালির জাল বিশেষভাবে সাহায্য করে। চিৎশক্তিসম্পন্ন এই সর্বোৎকৃষ্ট রক্ত নার্ভের মধ্যস্থতায় দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। *চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদিকথা* (পরিমার্জিত)-সম্পাদক।

২৯৪. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫১; *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল*

এই মহান ফকিহ, চিকিৎসক ও পণ্ডিতের পুরো নাম আলাউদ্দিন আলি ইবনে আবিল হাযম (৬০৭-৬৮৭ হি./১২১০-১২৮৮ খ্রি.) কারশি[২৯৫] দামেশকি। উপনাম ইবনুন নাফিস। জন্মগ্রহণ করেন দামেশকের নিকটে কারাশ গ্রামে।[২৯৬]

ইবনুন নাফিসের প্রতিপালন ও বেড়ে ওঠা

কুরআনুল কারিম হিফজের মাধ্যমে ইবনুন নাফিসের শিক্ষার সূচনা হয়। মুসলিম সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম এমনই ছিল। এরপর তিনি অধ্যয়ন করেন আরবি ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ফিকহ, উসুল, হাদিস, যুক্তিশাস্ত্র, সিরাত ইত্যাদি। ৬২৯ হিজরি মোতাবেক ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মনোনিবেশের কারণও অবশ্য ছিল। তিনি একবার প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে অনেক কষ্ট ভোগ করেন। এর পরই তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—একবার আমার কঠিন জ্বর হয়েছিল। আমার বয়স তখন বাইশের কাছাকাছি। জ্বর থেকে সুস্থ হওয়ার পর যারা আমার চিকিৎসা করেছে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার মনে সংশয় জাগে। সেখান থেকেই মূলত মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম।

ইবনুন নাফিসের চিকিৎসার হাতেখড়ি হয় দামেশকের প্রাজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসক মুহাযযাবুদ্দিন আবদুর রহমানের হাতে। তিনি দাখওয়ার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনিও ইসলামি সভ্যতার একজন বড় চিকিৎসক। তৎকালীন সময়ের নুরি হাসপাতালের একজন উচ্চপদস্থ চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নুরুদ্দিন মাহমুদ। তিনি ওই সময়ের যোগ্য ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসকদের এই নুরি হাসপাতালে একত্র করেছিলেন।

মুসলিমিন, পৃ. ২০৫, ২০৭; *দিরাসাতুন ফি তারিখিল উলুম ইনদাল আরব*, পৃ. ১৭০; *মুসলিমুনা আল্লামুল আলাম লি মুহাম্মাদ আলি উসমান*, পৃ. ৫১-৫২; *আসারুল উলামাইল মুসলিমিন ফিল হাযারাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ১৪০

২৯৫. **কারশি** : মাওয়ারাউন্নাহারের একটি অঞ্চল।

২৯৬. *তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা*, ১/১০৭; *হাদিয়াতুল আরিফিন*, ১/৩৭৮; এডওয়ার্ড করনিলিয়াস ভেনডেইক, *ইকতিফাউল কুনু বিমা হুয়া মাতবু*, পৃ. ৭৯; *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ৭/৫৮; *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৪/২৭১; *তাতাওরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০৫

ইবনুন নাফিসের শিক্ষকদের মধ্যে আরও আছেন ইমরান ইসরায়েলি ও রাজিউদ্দিন রাজি।

ইবনুন নাফিসের সহপাঠী ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা ইবনে আবি উসাইবিয়া। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের ইতিহাস নিয়ে রচনা করেছিলেন *তাবাকাতুল আতিব্বা*। তারা উভয়ে ৬৩৩ হিজরিতে কায়রোয় সফর করতে গিয়েছিলেন। তখন নাসিরি হাসপাতালে তারা নিয়োগ পান। ইবনুন নাফিস সেখানকার আচার্য এবং *নাসিরি মেডিক্যাল কলেজের* অধ্যক্ষ ছিলেন। আর ইবনে আবি উসাইবিয়া ছিলেন সেই হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান।

ইবনুন নাফিস নুরি হাসপাতালের বড় বড় চিকিৎসক থেকে অর্জিত জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন ইবনে সিনা, গ্যালেন, হিপোক্রেটিস প্রমুখ বিখ্যাত চিকিৎসকের গ্রন্থাবলি। অনেকেই বলেন, ইবনে *সিনার আল-কানুন ফিত তিব* গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত তার মুখস্থ ছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পারঙ্গমতার পাশাপাশি তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, অলংকারশাস্ত্র, ফিকহ-সহ অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে। এমনকি তিনি চিকিৎসায় পারঙ্গমতা ও দক্ষতার পাশাপাশি কায়রোর মাসরুরিয়া মাদরাসার শাফেয়ি ফিকহের শিক্ষক ছিলেন।[২৯৭]

লুকানো মুক্তা

ইবনুন নাফিস ছিলেন তার যুগের খ্যাতিমান পুরুষ। তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক আমরি *মাসালিকুল আবসার* গ্রন্থে, সাফাদি *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত* গ্রন্থে এবং ইবনে আবি উসাইবিয়া *তাবাকাতুল আতিব্বা* গ্রন্থে। তবে ইবনুন নাফিস তার উচ্চমার্গীয় আবিষ্কারের তুলনায় তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। এর কারণ হয়তো তার প্রতি কদরের অভাব ছিল কিংবা তখন এই আবিষ্কারগুলোর মূল্য অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল।

আধুনিক প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ইবনুন নাফিসের কথা তুলে ধরেছেন। লুসিয়েন লেক্লার্ক তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন *আত-তিব্বুল আরাবি* গ্রন্থে

---

২৯৭. *তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা*, ১/১০৭; *হাদিয়াতুল আরেফিন*, ১/৩৭৮; *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ৭/৫৮; *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৪/২৭১; *মিআতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াজহাল আলাম*, পৃ. ৪১; *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০৫; *মুসলিমুনা আল্লামুল আলাম লি মুহাম্মাদ আলি উসমান*, পৃ. ৪৯

এবং জার্মান-মিশরীয় চিকিৎসা ইতিহাসবিদ ম্যাক্স মেয়েরহোফ বিভিন্ন প্রবন্ধে-নিবন্ধে তার কথা এনেছেন। ড. পল গ্ল্যাভিঞ্জি (Paul Ghalioungui) তাকে নিয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থই রচনা করে ফেলেছেন, যেটিকে ইবনুন নাফিসের জীবনীর ওপর পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়।[২৯৮]

পল গ্ল্যাভিঞ্জি লেখেন, আধুনিক যুগে ইবনুন নাফিসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন মিশরীয় চিকিৎসক ড. মুহিউদ্দিন তাতাবি। বার্লিন লাইব্রেরিতে তিনি ইবনুন নাফিসের লেখা *শারহু তাশরিহিল কানুন* গ্রন্থের সন্ধান পান। এই গ্রন্থ নিয়ে তিনি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। সেখানে *তিনি শারহু তাশরিহিল কানুন* গ্রন্থের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। সেটি ছিল 'রক্তসঞ্চালন সম্পর্কে ইবনুন নাফিসের তত্ত্ব'। এই গবেষণাপত্র তিনি রচনা করেন ১৯২৪ সালে।

এই গবেষণাপত্র দেখে তাতাবির অনেক শিক্ষকই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না! তাদের আরবি ভাষা জানা ছিল না। তাই তারা গবেষণাপত্রের এক কপি পাঠিয়ে দেন জার্মান প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মেয়েরহোফের কাছে। তখন তিনি কায়রোতেই ছিলেন। অভিসন্দর্ভে প্রদত্ত তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে মেয়েরহোফের মতামত জানতে চান অধ্যাপকগণ। মেয়েরহোফ সেই গবেষণাপত্রের তথ্য ও তত্ত্বকে সমর্থন করেন।

ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন এই থিসিসের কথা জানতে পেরে ইবনুন নাফিসের কথা তুলে ধরেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ *প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস* (Introduction to the History of Science)-এর শেষ খণ্ডে। ম্যাক্স মেয়েরহোফ এরপর ইবনুন নাফিসের জীবন-ইতিহাস ও তার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি খোঁজা শুরু করেন। এরপর গবেষণার সারনির্যাস তুলে ধরেন বিভিন্ন প্রবন্ধে-নিবন্ধে। তখন থেকেই মূলত নতুনভাবে এই মহান চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর আবিষ্কারগুলো মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকে।[২৯৯]

---

২৯৮. দেখুন, ইবনুন নাফিস, *আলামুল আরব*, পৃ. ৫৭

২৯৯. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিল ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০৮; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫১

ইবনুন নাফিসের রক্তসঞ্চালনতত্ত্ব

ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহনের আবিষ্কারের সাথে ইবনুন নাফিসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিষয়টি তিনি সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন *শারহু তাশরিহিল কানুন* গ্রন্থে। কিন্তু তার এই আবিষ্কারের কথা অনেক শতাব্দী পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ধারণামূলকভাবে এই তত্ত্বের আবিষ্কারক মনে করা হয় উইলিয়াম হার্ভেকে (মৃ. ১৬৫৭ খ্রি.)। অথচ তিনি ইবনুন নাফিসের ৩০০ বছর পর রক্তসঞ্চালনের গবেষণায় অবতীর্ণ হন। মানুষ এই ভুল ধারণাই পোষণ করে আসছিল। কিন্তু তাদের এই ধারণা প্রথম ভেঙে দেন ড. মুহিউদ্দিন তাতাবি, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

১৫৪৭ সালে ইতালীয় চিকিৎসক আলবাজু ইবনুন নাফিসের *শারহু তাশরিহিল কানুন* গ্রন্থটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি প্রায় ৩০ বছরের মতো সিরিয়ার নিকটবর্তী তুরস্কের অন্তর্গত সানলিউরফা প্রদেশে থেকে গভীরভাবে আরবি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল আরবি থেকে লাতিন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ। তার অনুবাদের মধ্যে ফুসফুস সংবহনবিষয়ক অংশটিও ছিল। কিন্তু তার এই অনুবাদটি একসময় হারিয়ে যায়।

তৎকালীন সময়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন স্প্যানিশ বিজ্ঞানী মাইকেল সার্ভেটাস। তিনি আদতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের লোক ছিলেন না। ইবনুন নাফিসের যে গ্রন্থ আলবাজু অনুবাদ করেছিলেন, সেটি তার হাতে পড়ে। ধর্মীয় বিশ্বাসগত অভিযোগে সার্ভেটাসকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি বিভিন্ন শহরে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। অবশেষে সেই অভিযোগেই তাকে ১৫৫৩ সালে পুড়িয়ে মারা হয়। সাথে পুড়িয়ে ফেলা হয় তার গ্রন্থাবলিও। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তার কিছু গ্রন্থ অক্ষত থেকে যায়। সেগুলোর মধ্যে ছিল আলবাজুর অনূদিত ইবনুন নাফিসের গ্রন্থটিও, যাতে ইবনুন নাফিসের রক্তসঞ্চালনতত্ত্ব ছিল। বর্তমানে এই স্প্যানিশ চিকিৎসককেও সম্মানের চোখে দেখা হয় ইবনুন নাফিসের তত্ত্ব সংরক্ষণের কারণে। অন্যদিকে গবেষকরা বিশ্বাস করতেন যে রক্ত-সংবহনপদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রথমত স্প্যানিশ বিজ্ঞানী সার্ভেটাসের, এরপর ব্রিটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভের। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এই ভুল ধারণাই প্রচলিত ছিল। অবশেষে মিশরীয় চিকিৎসক গবেষণার মাধ্যমে এই ভুল ধারণা দূর করেন এবং প্রাপ্য অধিকার তার প্রাপককে ফিরিয়ে দেন।

চিকিৎসক তাতাবির থিসিসের পর থেকে বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ ও গবেষক ইবনুন নাফিসের প্রতি আগ্রহী হতে থাকেন। তাদের মধ্যে আছেন জার্মান প্রাচ্যবিদ মেয়েরহোফ। তিনি ইবনুন নাফিস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, মাইকেল সার্ভেটাসের রক্তসঞ্চালন নিয়ে লেখার সাথে ইবনুন নাফিসের লেখার হুবহু মিল দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। সার্ভেটাসের কিছু কিছু মৌলিক বাক্য ইবনুন নাফিসের লেখারই আক্ষরিক অনুবাদ। অথচ মাইকেল সার্ভেটাস মূলত ছিলেন একজন অনুসন্ধিৎসু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। চিকিৎসার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা নেই। অথচ তিনি যে তত্ত্ব বর্ণনা করছেন, তা ইবনুন নাফিস অবিকল বর্ণনা করে গেছেন দেড় শতক বছর আগে।

ইতালীয় ইতিহাসবিদ অ্যালডো মেলি ইবনুন নাফিস, মাইকেল সার্ভেটাস ও উইলিয়াম হার্ভের লেখা তুলনামূলক পাঠ করে সিদ্ধান্ত দেন, ইবনুন নাফিস ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সাথে মাইকেল সার্ভেটাসের বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে। তাই সত্য কথা হলো, রক্তসঞ্চালনের আধুনিক ধারণার আবিষ্কারক মাইকেল সার্ভেটাস কিংবা উইলিয়াম হার্ভে নয়, বরং রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক ইবনুন নাফিস।[৩০০]

ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহন ইবনুন নাফিসের বহু আবিষ্কারের একটি আবিষ্কার মাত্র। আধুনিক যুগে তাকে নিয়ে যা লেখালেখি হয়েছে, তা থেকে আমরা আরও জানতে পারি, তিনি কেবল ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহনপ্রক্রিয়াই আবিষ্কার করেননি; বরং সারাদেহে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারকও তিনি। এ ছাড়া চোখ ও দৃষ্টিশক্তি নিয়েও তিনি অসাধারণ তত্ত্ব দিয়েছেন। প্রকাশ করেছেন বহু শারীরবৃত্তীয় তথ্য। তার যুগের ফার্মাসিউটিক্যাল জ্ঞানের ধারাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বহুদূর। পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়মকানুনও বর্ণনা করে গিয়েছেন তিনি।

ইবনুন নাফিসের গ্রন্থাবলি

ইবনুন নাফিস গুরুত্বপূর্ণ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে। আর কিছু এখনো আলোর মুখ দেখেনি; পাণ্ডুলিপি আকারে হয়তো কোনো গ্রন্থাগারের অন্ধকার কুঠরিতে রয়ে গেছে। এখানে তার লেখা প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের আলোচনা তুলে ধরছি :

৩০০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫১; *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়ি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০৯, ২১১; *মিআতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াজহাল আলাম*, পৃ. ৪১

১. শারহু তাশরিহিল কানুন : ইবনুন নাফিসের লেখা গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোয় প্রকাশিত হয় এটি। গ্রন্থটি নিরীক্ষণ করেছেন ড. সালমান কুতাবাহ। ফুসফুসীয় রক্ত-সংবহনের সূক্ষ্ম নিখুঁত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের মূল্যমান প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন হৃৎপেশি পুষ্টি লাভ করে হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গত ধমনি থেকে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত থেকে নয়। এই গ্রন্থে তার গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রতি ইবনুন নাফিসের আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নির্ভয়ে সময়ের সবচেয়ে বড় চিকিৎসাবিদ গ্যালেন ও ইবনে সিনার যুক্তি খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

২. আশ-শামিল ফিস সিনাআতিত তিব্বিয়্যা : এই বিশ্বকোষটি তার লেখা সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মনে করা হয়। ড. ইউসুফ যাইদান এই গ্রন্থের কয়েক খণ্ডের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সমর্থ হন। আবুধাবি কালচারাল ফাউন্ডেশনও এই বিশ্বকোষের খোঁজ পায় এবং তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষা করে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে।

ইবনুন নাফিসের ইচ্ছা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের সামগ্রিক ও বৃহত্তর একটি বিশ্বকোষ রচনা করবেন। তিনি ৩০০ খণ্ডের খসড়া তৈরি করেন। কিন্তু মাত্র ৮০ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন করার পরই তার প্রয়াণ হয়ে যায়। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে মুসলিম চিকিৎসকদের পাঁচ শতাব্দীকালের অধ্যবসায়ের এক অসাধারণ চিত্র ফুটে ওঠে।

৩. আল-মুজায ফিত তিব : চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য এই গ্রন্থটি আবশ্যক মনে করা হয়। এই গ্রন্থের পাঠ ও পর্যালোচনা চলেছে অনেক কাল। এর প্রচুর ব্যাখ্যা ও ভাষ্যগ্রন্থ রয়েছে। পল গ্যাভিঞ্জি তার *ইবনুন নাফিস* গ্রন্থে বলেছেন, ইবনুন নাফিসের *আল-মুজায ফিত তিব* গ্রন্থটি ইবনে সিনার *আল-কানুন ফিত তিব* গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। *আল-কানুন*-এর প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে সহজ বৈজ্ঞানিক ভাষায়। তবে ইবনুন নাফিসের গ্রন্থে অ্যানাটমি এবং অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থটি মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সারা বিশ্বের চিকিৎসকগণও ব্যাপকভাবে উপকৃত হন এ থেকে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, আল-মুজায ফিত তিব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্যারিস, অক্সফোর্ড, ফ্লোরেন্স, মিউনিখ এবং এল এসকোরিয়ালে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ চার খণ্ডে বিভক্ত। বিশ্বের চিকিৎসকদের কাছে এটি বেশ সমাদৃত। বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোয় আবদুল মুনয়িম মুহাম্মাদ উমরের নিরীক্ষণে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর আগে অবশ্য ম্যাক্স মেয়েরহোফ ও ইউসুফ শাখিতের নিরীক্ষণে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. শারহু ফুসুলি আবকারাত : এটি হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাগ্রন্থের ব্যাখ্যা। ১৯৮৮ সালে গ্রন্থটি বৈরুতে প্রকাশিত হয়েছে। মাহের আবদুল কাদির ও ইউসুফ যাইদান এটি নিরীক্ষণ করেছেন।

৫. আল-মুহাযযাব ফিল কাহলিল মুজাররাব : চক্ষুচিকিৎসা সম্পর্কে লিখিত এ গ্রন্থটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে মরক্কোর রাজধানী রাবাত থেকে। যাফির ওয়াফায়ি ও মুহাম্মাদ রাওয়াস কালআজি গ্রন্থটি নিরীক্ষণ করেন।

৬. আল-মুখতাসার ফি উসুলি ইলমিল হাদিস : ইউসুফ যাইদানের নিরীক্ষণে ১৯৯১ সালে কায়রোয় প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থটি।[৩০১]

কোনো সন্দেহ নেই, আরব ও পশ্চিমাবিশ্বের চিকিৎসার ইতিহাসে ইবনুন নাফিসের গ্রন্থাবলির গুরুত্ব সমানভাবে বিদ্যমান। এ ছাড়াও তিনি সিরাত, হাদিস, ব্যাকরণ, দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনুন নাফিস তার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও গবেষণা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ছিলেন নির্ভীক। তিনি সাহসের সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের দুই দিকপাল ইবনে সিনা ও গ্যালেনের মতামতের বিপক্ষে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন। তার যুগে চিকিৎসকদের চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন ছিল গ্যালেন ও ইবনে সিনার শক্ত বলয়ে। তাদের মতামতের বাইরে কোনো চিকিৎসকের অবস্থান গ্রহণ খুবই কঠিন ছিল। তবুও ইবনুন নাফিস বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কাউকে ভয় করেননি, যা সত্যিই অত্যন্ত সাহসের বিষয়।[৩০২]

৩০১. *তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা*, ১/১০৭; *হাদিয়াতুল আরেফিন*, ১/৩৭৮; এডওয়ার্ড ভেনডেইক, *ইকতিফাউল কুনু বিমা হুয়া মাতবু*, পৃ. ৭৯; *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ৭/৫৮; *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৪/২৭১; *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০৭; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৫২-৪৫৩; *তারিখুল ইলমি ওয়া দাওরুল উলামা ফি তাকাদ্দুমিহি*, পৃ. ১৩৩; *মিআতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াজহাল আলাম*, পৃ. ৪২

৩০২. *মিআতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াজহাল আলাম*, পৃ. ৪১; *তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা*, ১/১০৭

ইবনুন নাফিসের লেখালেখি সম্পর্কে ইবনে কাজি শাহবাহ বলেছেন, তিনি মুখস্থ লিখতেন। শাস্ত্রীয় গভীরতার ফলে বই দেখার প্রয়োজন ছিল না তার। সুবকি রহ. বলেন, ইবনুন নাফিস *আত-তাম্বিহ* গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। লিখেছেন উসুলুল ফিকহ, যুক্তিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ।[৩০৩]

আল-আলাম গ্রন্থকার বলেন, তিনি স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ দর্শন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতেন। অন্যের লেখা পড়া কিংবা বর্ণনার পেছনে ছুটতেন না। লেখক আরও বলেন, ইবনুন নাফিস রহ. বেশ ধনী ছিলেন। মৃত্যুর সময় কায়রোর মানসুরি হাসপাতালে তার গ্রন্থাবলি ও সম্পদ ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন।[৩০৪]

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে ইবনুন নাফিস রহ. প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকগণ মদ ব্যবহার করে তার চিকিৎসার চেষ্টা করে। কিন্তু ইবনুন নাফিস রহ. তা মুখ থেকে সরিয়ে নেন। অথচ অসুস্থতায় তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। তবুও তিনি তখন বলেছিলেন, আমার পেটে এক বিন্দু মদ নিয়ে আল্লাহর সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না!

(২)

ইবনে সিনা : জীবন্ত বিশ্বকোষ

ইবনে সিনা (মৃ. ১০৩৭ খ্রি./৪২৮ হি.) দীর্ঘ সাত শতাব্দীকালব্যাপী চিকিৎসাশাস্ত্রের অবিস্মরণীয় এক আস্থার নাম। তার লেখা চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ *আল-কানুন* সপ্তদশ শতকেও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যবই ছিল।[৩০৫]

ইবনে সিনাই প্রথম সঠিকভাবে প্রাথমিক মেনিনজাইটিস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন জন্ডিসের কারণ এবং মূত্রাশয়ের পাথরের লক্ষণ। বিশেষভাবে

---

৩০৩. *তাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যা*, ১/১০৭

৩০৪. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৪/২৭১

৩০৫. *আল-হাযারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১১

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসার প্রভাবের দিকে তিনিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৩০৬]

ইসলামি সভ্যতায় এমন কিছু মহান বিদ্বান মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে, যাদের কারণে গোটা মানবজাতি গর্ব করতে পারে। তাদেরকে মানবসভ্যতার কারিগর বললে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মানবতার ধারক এই ইসলামি সভ্যতার শিখরের প্রতিচ্ছবি তারা। সভ্যতার ইতিহাসের সাথে তাদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের আলোচনার অর্থ সভ্যতার আলোচনা এবং তাদের জীবনী পাঠের অর্থ সভ্যতারই জীবনী পাঠ!

এই মহান বিদ্বান ও মনীষীদের প্রথম সারিতে আছেন ইবনে সিনা আবু আলি হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ। আরবিতে যার উপাধি 'আশ-শাইখ আর-রাইস'। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি আভিসিনা (Avicenna) নামে পরিচিত। তিনি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার সুনাম বিশ্বজুড়ে। তিনি চিন্তা, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অত্যন্ত উঁচু স্থান দখল করেছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বরং বলা যায়, এমন কোনো তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান নেই, যেখানে ইবনে সিনার সগৌরব পদচারণা নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় আমরা তার সৃজনশীলতার ছাপ দেখতে পাই।

ইবনে সিনা বর্তমান উজবেকিস্তানের অন্তর্গত বুখারার নিকটে ৩৭০ হিজরি মোতাবেক ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান ও ইলম চর্চার পরিবেশে বড় হয়েছেন। ইবনে সিনার বাবা শৈশব থেকেই তার লেখাপড়ার যত্ন নেন; তার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ দেন। এভাবেই ইবনে সিনা পড়াশোনা ও জ্ঞানানুরাগী হয়ে বেড়ে ওঠেন। সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রতি তার অনুরাগ ছিল অসাধারণ। জ্ঞানবিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় ব্যুৎপত্তিতে তিনি সকলকে ছাড়িয়ে যান কুড়ি বছর বয়সে পদার্পণের আগেই!

ইবনে সিনা নিজেই তার জীবন সম্পর্কে বলেছেন—আমার পিতা ছিলেন বলখের অধিবাসী। তিনি বুখারায় নুহ ইবনে মানসুরের[৩০৭] রাজ্যে কিছুকাল

৩০৬. *ওয়াফায়াতুল আয়ান*, ১/১৫২; *আল-হাযারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১১

৩০৭. মানসুর সামানি (৩৫৩-৩৮৭ হি./৯৬৪-৯৯৭ খ্রি.) : আবুল কাসিম নুহ ইবনে মানসুর ইবনে নুহ ইবনে নসর সামানি। মাওয়ারাউন্নাহারের প্রশাসক। জন্ম-মৃত্যু বুখারায় (তার দেশের রাজধানী)। পিতার ইন্তেকালের পর ৩৬৬ হিজরিতে শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত বালক। তার শাসনভার গ্রহণের আগে দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছিল। তিনি

থাকেন। সেখানে বড় একটি অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করেছিলেন তিনি। সেখানে আমার মায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

আমি ও আমার ভাইয়ের জন্মের পর সেখান থেকে আমরা বুখারায় চলে আসি। নিয়মিত কুরআন ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাছে যেতে থাকি। ১০ বছর বয়সেই আমার কুরআন হিফজ ও সাহিত্যের বহু বিষয় শিক্ষা সম্পন্ন হয়, যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যেত।

আমার পিতা ছিলেন ইসমাইলি মতবাদের। মিশরীয় ইসমাইলিদের সাথে তার চলাফেরা ছিল। তাদের থেকে আকল এবং নফস সম্পর্কে অনেক আলোচনা শুনতেন। তেমনইভাবে আমার ভাইও। অনেক সময় তারা আলোচনা করতেন আর আমি বসে বসে শুনতাম। আমি তাদের কথা বুঝতে পারতাম, কিন্তু এমন কথায় বিশ্বাস স্থাপনে আমার মন সায় দিত না। তারাও আমাকে কখনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করাত। তারা আলোচনা করত দর্শন, প্রকৌশল ও গণিত নিয়ে। তারা আমার জন্য গণিত শিক্ষকও নিযুক্ত করেছিলেন।

একদিন বুখারা থেকে আমাদের এখানে দার্শনিক আবু আবদুল্লাহ নাতেলি[৩০৮] আগমন করলেন। আমার বাবা তাকে আমাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার আগমনের পূর্বে আমি ফিকহচর্চা করতাম। তখন শায়খ ইসমাইল যাহিদের নিকট গিয়ে সুলুক ও তাসাউফের চর্চা করতাম।[৩০৯]

ইবনে সিনা নাতেলির কাছে পাঠ করেন যুক্তিশাস্ত্রের বই ইসাগুজি। পারদর্শিতা অর্জন করেন যুক্তিবিদ্যায়। আরও পাঠ করেন ইউক্লিড, আলমাজেস্ট ইত্যাদি। ইবনে সিনা তার শিক্ষককে বহুগুণে ছাড়িয়ে যান। এমনকি যেসব গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা নাতেলির কাছে স্পষ্ট ছিল না, সেগুলোও উদ্ধার করতে সক্ষম হন ইবনে সিনা।

শাসনগ্রহণের পরে শক্তহাতে এর মূলোৎপাটন করেছেন। তিনি ছিলেন জনগণের নিকট সম্মানিত ও মান্যবর। তার শাসনকাল ছিল ২২ বছর। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৬/৫১৪; *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৮/৫১

৩০৮. **আবু আবদুল্লাহ নাতেলি** : আবু আবদুল্লাহ নাতেলি, ভিন্ন বর্ণনামতে নায়েলি। একজন দার্শনিক আলেম। অত্যন্ত উন্নত ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী। গণিতে বেশ পারদর্শিতা ছিল তার। তিনি চিকিৎসাবিষয়ক বেশ কিছু পুস্তিকা লিখেছেন। *তারিখুল হুকামা লি শাহরাজুরি*, পৃ. ৩০৪

৩০৯. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৭০-৭২; *তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি*, ১/৩০৫৯-৩০৬০

চিকিৎসাশাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন অল্প সময়েই। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনামতে, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ছাড়িয়ে যান। সমকালে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। এই শাস্ত্রের গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তিবর্গও তার কাছে বিভিন্ন সমাধান নিতে আসত। অথচ তার বয়স ছিল তখন মাত্র ১৬ বছর।[৩১০]

ইবনে সিনা চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করার পর মানবিক বোধ থেকেই মানুষকে চিকিৎসাসেবা দিতে শুরু করে দেন। সৌজন্যবোধ ও মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই তিনি বিনা মূল্যে চিকিৎসা দিতেন। অর্থ উপার্জন কিংবা সম্পদের স্তূপ গড়তে চিকিৎসাকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি মানুষকে উপকার করতে ভালোবাসতেন, অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে চাইতেন।

একবার শাসক নুহ ইবনে মানসুরের চিকিৎসা করার সুযোগ আসে তার। তিনি চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। অথচ তার দুরারোগ্য ব্যাধি সে সময়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তখন ইবনে সিনার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর।

এভাবেই ইবনে সিনা চারদিকে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। শাসকের পক্ষ থেকে তাকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সে সময় তিনি একটি অভাবনীয় সুযোগ লাভ করেন। শাসকের ব্যক্তিগত বিশাল পাঠাগার তার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ইবনে সিনা এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। সেখান থেকে তিনি পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করেন, যা অন্যদের সৌভাগ্য হয়নি। অথচ তার বয়স তখন ছিল মাত্র ১৮ বছর।[৩১১]

২০ বছর বয়সে তিনি মনোনিবেশ করেন লেখালেখি, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায়। গভীরে প্রবেশ করেন দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের। ২২ বছরে বয়সে পদার্পণের আগেই তিনি হয়ে ওঠেন তার যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক।

তাকে হামাদান প্রদেশের গভর্নর শামসুদ দাওলার প্রধান উজিরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরপর তিনি ইস্পাহানের গভর্নর আলাউদ্দিনের সহচর

---

৩১০. ওয়াফায়াতুল আয়ান, ২/১৫৮

৩১১. তাবাকাতুল আতিব্বা, ৩/৭৪-৭৫; ওয়াফায়াতুল আয়ান, ২/১৫৮

ছিলেন। এসব রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব তার লেখালেখি, গবেষণা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্মে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি।[৩১২]

ইবনে সিনার অনবদ্য গবেষণাপদ্ধতি

গবেষণা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে ইবনে সিনার পদ্ধতি বহুলাংশেই পূর্ববর্তীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। বিশেষত গ্রিক চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের থেকে। তিনি স্বাধীনভাবে লিখতে শুরু করেন। অযৌক্তিক চিন্তাভাবনা গ্রহণ থেকে মুক্ত থাকেন। পূর্ববর্তীদের কোনো কথা তিনি যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ করেননি। পূর্ববর্তীদের কোনো মত তার সামনে এলে তিনি বিবেকবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সেটি যাচাই করে দেখতেন। সঠিক বলে বিবেচিত হলে গ্রহণ করতেন। সঠিক না হলে গ্রহণ করতেন না; বরং ত্রুটি ব্যাখ্যা করে দিতেন।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই ইবনে সিনা অনেক ক্ষেত্রে প্লেটো, এরিস্টটলসহ অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকের বিভিন্ন মতামতের বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতবাদের শিকলে আবদ্ধ থাকেননি। তার গবেষণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়ই তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, সকল মানুষের মতো দার্শনিকদের কথাও ভুল-শুদ্ধ হতে পারে। তারা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। এতটা সাহসের সাথে স্পষ্টভাবে তার যুগে অন্য কেউ পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতামত গ্রহণের মূলনীতি তুলে ধরতে পারেনি।[৩১৩]

এর চেয়েও বড় বিষয় হলো ইবনে সিনা তার লেখালেখি ও গবেষণায় পরীক্ষাভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষত চিকিৎসাসংক্রান্ত গবেষণায়। এর মাধ্যমে তিনি রোগ নির্ণয়, প্রতিষেধক আবিষ্কার ও ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত ও অভিনব ফলাফলে পৌঁছতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি অনেক রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি। ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ চিকিৎসাপদ্ধতি আমার সামনে বর্ণনাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে।[৩১৪]

---

৩১২. *উলামাউল আরব ওয়া মা আতাওহু লিল হাযারা*, পৃ. ১৫৮; *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১২০

৩১৩. *উলামাউল আরব ওয়া মা আতাওহু লিল হাযারা*, পৃ. ১৬০

৩১৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৭৩

অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষণমূলক চিকিৎসাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইবনে সিনা চিকিৎসাশাস্ত্রকে জাদু-টোনা ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্ত করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, প্রত্যেক রোগের পেছনে একটা বস্তুনিষ্ঠ কারণ আছে।

আল্লাহর সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক ছিল ইবনে সিনার জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার অসাধারণ এক বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, প্রতিটি প্রামাণিক গবেষণায় আমি আগে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো স্থির করি এবং সেগুলোর সুবিন্যস্ত রূপ দান করে ফলাফল লাভের চেষ্টা করি। নতুন জ্ঞান লাভের অত্যাবশ্যক শর্তাবলিও লক্ষ করি। অবশেষে নতুন জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ আমি জানতে পারি। যদি কখনো শত চেষ্টা করেও সমস্যার সমাধান করতে না পারি তাহলে আমি মসজিদে চলে যাই। নামাজ পড়ে আল্লাহর নিকট দোয়া এবং কান্নাকাটি করি। অবশেষে সকল অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়। এমনকি জটিল বিষয়গুলোও আমার নিকট সহজ হয়ে যায়।[৩১৫]

ইবনে সিনার অভিনব কিছু আবিষ্কার

আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, যোগ্যতা, জ্ঞানের প্রসারতা এবং জ্ঞানের প্রতি তীব্র আগ্রহের কল্যাণে ইবনে সিনা অভিনব কিছু আবিষ্কার মানবতাকে উপহার দিতে পেরেছেন, যার উদ্ভাবন ছিল তার যুগ ও যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রসরতার তুলনায় অভাবনীয়। বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রে তার অবদান অসামান্য। প্রথম ব্যক্তি হিসাবে তিনি এমন কিছু রোগ-ব্যাধির সন্ধান পেয়েছেন, আজও যেগুলোর সংক্রমণ ঘটছে। তিনি প্রথমবারের মতো বড়শি-কৃমির সন্ধান পান এবং এর নাম দেন গোলাকার পোকা। *আল-কানুন ফিত তিব* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি অন্ত্রে বসবাসকারী পরজীবীর আলোচনায় এ কথা বলেছেন। প্রথম তিনিই বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কোন কোন কারণে এই রোগ হয়, সেটাও তিনি বর্ণনা করেছেন।[৩১৬] এ ছাড়া তিনি এই রোগের প্রতিকারও বলে দিয়েছেন।

এ নিয়েই প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ খলিল আবদুল খালিক 'আর-রিসালাহ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে সিনার *আল-কানুন ফিত তিব* গ্রন্থটি ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ

---

৩১৫. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৭৩; *ওয়াফায়াতুল আয়ান*, ২/১৫৮

৩১৬. *আল-কানুন ফিত তিব*, ৪/১৮৬

হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইবনে সিনা প্রথম বড়শি-কৃমি আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে আমরা বর্তমানে হুকওয়ার্ম বলি। কিন্তু প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে মনে করা হয় যে, এই কৃমির আবিষ্কার হয়েছে ইতালিতে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অ্যাঞ্জেলো দুবিনির হাতে। অথচ এরও প্রায় ৯০০ বছর আগে ইবনে সিনা এ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গিয়েছেন। পরজীবীবিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত আধুনিক গ্রন্থাবলিতেও লেখকগণ দুবিনিকেই এর জনক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি আমেরিকার রকফেলার ফাউন্ডেশনও দুবিনিকে হুকওয়ার্মের জনক বলে আখ্যায়িত করে। অথচ রকফেলার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে হুকওয়ার্মসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে! এজন্যই আমি বিষয়টি তুলে ধরলাম, যেন মানুষ ইবনে সিনার বহু আবিষ্কারের সাথে এই নতুন আবিষ্কারকেও সংযোজিত করে নেয়। এই আবিষ্কারটি ছিল এমন একটি রোগের, যার প্রাদুর্ভাব বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি।[৩১৭]

আমরা যদি কৃমি নিয়ে ইবনে সিনার লেখালেখির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই, তিনি এমন পরজীবী কীটের কথাও তুলে ধরেছেন, যাদের বসবাস অন্ত্রে নয়; বরং অন্ত্র থেকে দূরে। যেমন চোখের পরজীবী, ফাইলেরিয়া জীবাণু যা গোদ রোগের কারণ। গোদ রোগ সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেছেন, গোদ রোগ হলে পা ফুলে যায়। ভেরিকোজ ভেইনস ফুলে পা স্থূল ও প্রকট আকার ধারণ করে।[৩১৮]

ইবনে সিনা প্রথম মেনিনজাইটিস রোগ[৩১৯] বর্ণনা করেন। তেমনইভাবে পার্থক্য করেন মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ কারণে পক্ষাঘাত ও বাহ্যিক কারণে পক্ষাঘাতের মাঝে। এ ছাড়াও মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক হওয়ার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গ্রিক চিকিৎসাবিদদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি প্রথম পেটের ব্যথা ও কিডনির ব্যথার পার্থক্য নির্ণয় করেন।[৩২০]

---

৩১৭. *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যু লিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮০-১৮১

৩১৮. *আল-কানুন ফিত তিব*, ৪/৪২৮

৩১৯. মেনিনজাইটিস এমন একটি রোগ, যার ফলে জীবাণু মস্তিষ্কের এবং মেরুরজ্জুর আবরণীকে আক্রমণ করে। রোগটির ভয়াবহতার মুখ্য কারণ হলো, যখন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন চিকিৎসার জন্য সময় থাকে ২৪ ঘণ্টারও কম।

৩২০. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৩

জীবাণুমুক্ত চিকিৎসাযন্ত্র মিসবার প্রবেশ করিয়ে চোখের জলনালি চিকিৎসার কৃতিত্ব তার। বর্তমানে আমরা যে ক্যাপসুল দেখি, এর ধারণার সূচনা বলতে গেলে ইবনে সিনার মাধ্যমেই। তিনিই প্রথম ওষুধ-দানা সংরক্ষণের জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য দিয়ে মোড়ানোর পদ্ধতি ব্যবহার করেন। মূত্রাশয়ের পাথরের লক্ষণগুলো তিনি বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এর আগে কিডনির পাথরের লক্ষণগুলোর কী কী পার্থক্য রয়েছে, সেদিকেও ইঙ্গিত করেছেন। ড. খাইরুল্লাহ *আত-তিব্বুল আরাবি* গ্রন্থে বলেছেন, মূত্রাশয়ের পাথর সম্পর্কে ইবনে সিনা যা লিখে গিয়েছেন, তার সাথে নতুন কিছু যোগ করা কঠিন।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেও ইবনে সিনা অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কিছু গাইনি রোগের বিবরণ দিয়েছেন। যেমন যোনিপথের প্রতিবন্ধকতা (Vaginal obstruction), গর্ভপাত, জরায়ুর টিউমার (Uterine fibroids) ইত্যাদি।

প্রসবের পর নারীরা সম্ভাব্য যে-সকল রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেগুলো নিয়েও ইবনে সিনা আলোচনা করেছেন। যেমন রক্তস্রাব, রক্ত জমাট বাঁধা (Hematometra)। এর ফলে কখনো টিউমার হয় এবং প্রচণ্ড জ্বর আসে। তা ছাড়া তিনি ইঙ্গিত করেন যে, রোধক প্রসব অথবা ভ্রূণের মৃত্যুর কারণে জরায়ুর বীজদূষণ ঘটতে পারে। বিষয়টি ইতিপূর্বে জানা ছিল না। ভ্রূণ অবস্থায়ই স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ধারিত হয় বলে তিনি আলোকপাত করেন এবং তিনি পুরুষকেই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়ী করেন। পরবর্তীকালে আধুনিক বিজ্ঞান ইবনে সিনার মতামতকেই জোরালোভাবে সমর্থন করেছে।[৩২১]

ইবনে সিনা প্রথমবারের মতো কিছু সংক্রামক রোগের সংক্রমণপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যেমন জলবসন্ত, গুটিবসন্ত ইত্যাদি। তিনি উল্লেখ করেন এসব রোগ পানি ও বায়ুতে ছড়িয়ে থাকা জীবাণুর মাধ্যমে ছড়ায়। তিনি বলেন, পানিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু জীবাণু রয়েছে যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। এ সকল জীবাণু কিছু রোগের জন্য দায়ী...।[৩২২]

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানী লিউয়েন হুক ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃষ্টির পানির মধ্যে নিজের তৈরি সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু পর্যবেক্ষণ করেন। যা ইবনে সিনার দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক বলে প্রমাণ করে।

---

৩২১. *আল-কানুন ফিত তিব*, ২/৫৮৬

৩২২. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৯৮

ইবনে সিনা অস্ত্রোপচারেও অসাধারণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অস্ত্রোপচারে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার বিভিন্ন উপায় উল্লেখ করেছেন। যেমন বেঁধে, শলিতা দিয়ে, আগুনের তাপ দিয়ে, দাহজনক ওষুধ দিয়ে অথবা শিরার ওপরের মাংসপেশি শক্ত করে চেপে ধরে। জখম থেকে কীভাবে তির বের করে আনতে হবে, তাও বর্ণনা করে গিয়েছেন তিনি। শল্যচিকিৎসকদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন তির বের করার সময় ধমনি বা স্নায়ুতে আঘাত না লাগে। প্রত্যেক শল্যচিকিৎসকের যে শারীরবৃত্ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার, সে কথাও তুলে ধরেছেন।[৩২৩]

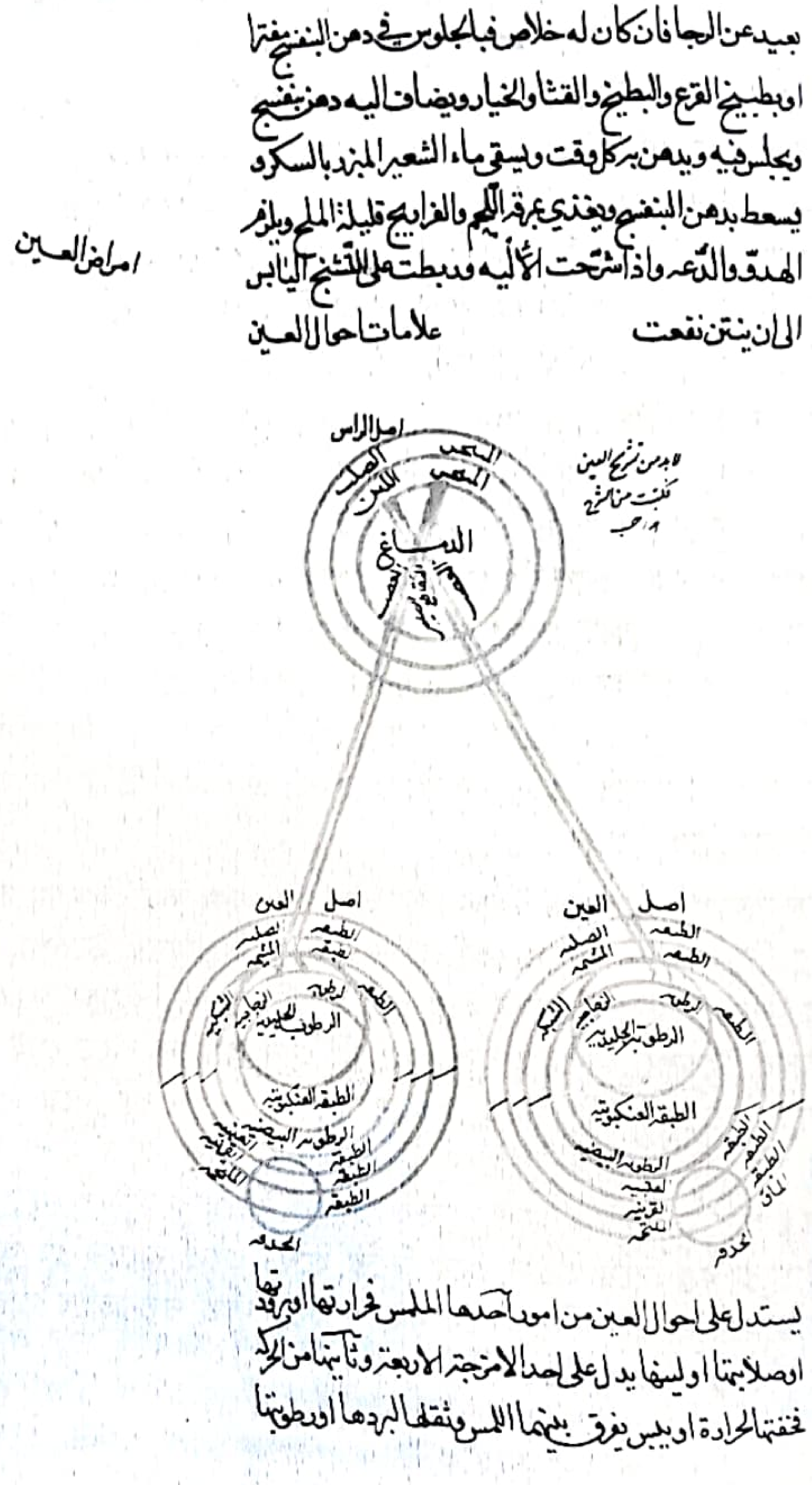
ইবনে সিনার আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম হলো, মহিলাদের যোনিপথ দিয়ে মূত্রাশয়ের পাথর বের করা। তিনি রক্তক্ষরণ ও হিমোফিলিয়া সম্পর্কে ভালো বিবরণ দিয়েছেন। হিমোফিলিয়া সম্পর্কে তখনই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এটি বংশানুক্রমিক জিনগত রোগ। এই রোগে রক্ত তঞ্চনে সমস্যা হয়, তাই একবার রক্তনালি কেটে গেলে আর রক্তপাত বন্ধ হয় না। এটাকে জিনগত রোগ বলার কারণ হলো, তিনি গবেষণা করে দেখেছেন, বিভিন্ন মানুষের হিমোফিলিয়ায় তারতম্য সৃষ্টি হয় বংশের কারণে। হিমোফিলিয়ার রক্তক্ষরণের চিকিৎসাও তিনি বের করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বৃহত্তম ধমনি অ্যাওর্টাকে বেঁধে দিতেন।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ইবনে সিনা চক্ষুবিদ্যা এবং দন্তচিকিৎসায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ডেন্টাল কেরিজ বা দন্তক্ষয় নিরাময়ের উদ্দেশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, দাঁতের ক্ষয়রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্য ক্ষয়রোধ করা এবং তা যেন আর না বাড়ে সেই ব্যবস্থা নেওয়া। দাঁত ক্ষয়কারী পদার্থ পরিষ্কার করে পরিপূরক বস্তু দিয়ে জায়গাটি ভরাট করে দিতে হবে। দাঁতের চিকিৎসার মৌলিক নীতি হলো দাঁতের সুরক্ষা। আর তা করতে হলে দাঁতের ক্ষয়যুক্ত অংশটুকু উঠিয়ে ফেলে দিয়ে তা উপযুক্ত বস্তু দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। এতে দাঁতের যে অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে দাঁত নতুনভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।[৩২৪]

---

[৩২৩]. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ১১৮

[৩২৪]. *আল-কানুন ফিত তিব*, ১/১৯২


بعيد عن الرجا فان كان له خلاص فبالجلوس في دهن البنفسج مفترا
او بطبيخ القرع والبطيخ والقثا والخيار ويضاف اليه دهن بنفسج
ويجلس فيه ويدهن به كل وقت ويسقى ماء الشعير المبزر بالسكر و
يسعط بدهن البنفسج ويغذى بمرقة اللحم والفراريج قليلة الملح ويلزم
الهدو والدعة واذا سخنت الاليه وبسطت على التشنج اليابس
الى ان ينتن نفعت علامات احوال العين

امراض العين

يستدل على احوال العين من امور احدها الملمس فحرارتها او بردها
او صلابتها او لينها يدل على احد الامزجة الاربعة وثانيها من الحركة
فخفتها الحرارة او يبس يفرق بينهما اللمس وثقلها البردها او رطوبتها

চিত্র নং-৮
চক্ষু চিকিৎসায় আল-কানুন ফিত তিব গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

ইবনে সিনা স্নায়বিক রোগ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু মানসিক রোগ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে সমর্থ হন। তিনি মনে করতেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক কার্যকারণ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপে অত্যন্ত প্রভাবক।[৩২৫]

এ ছাড়াও ইবনে সিনা গবেষণা করেছেন স্থান, সময়, পরিধি, শক্তি ও শূন্যমণ্ডল নিয়ে। তিনি বলেন, চোখের রশ্মি দৃশ্যমান অবয়ব থেকে চোখে আসে। তিনি বিভিন্ন পদার্থের ভর ও নির্দিষ্ট ওজনের একক সম্পর্কে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। গবেষণা করেছেন গতি ও গতিবিদ্যার অন্যান্য প্রসঙ্গেও। ইবনে সিনাই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম গতিসূত্র আবিষ্কার করেছেন।[৩২৬]

প্রফেসর মুস্তফা নাজিফ[৩২৭] বলেন, পদার্থবিজ্ঞানে ইবনে সিনা-সহ অন্য মুসলিমগণ যা গবেষণা করেছেন, তন্মধ্যে বেশ কিছু বিষয় আধুনিক গতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে।

নিউটনের গতিবিদ্যার তিনটি সূত্রের প্রথমটি অনেকখানি তাদের গবেষণায় চলে এসেছিল। এ সম্পর্কে তাদের বেশ কিছু সুস্পষ্ট উদ্ধৃতিও আছে।[৩২৮]

পাললিক শিলা, পাহাড় ও পাথরের গঠনের বিবরণের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইবনে সিনার অমূল্য গবেষণা। ভূতত্ত্বে রয়েছে অত্যুচ্চ অবস্থান। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা একসময় ইবনে সিনার গবেষণার ওপরেই নির্ভর করত। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় তার গবেষণাই পাঠদান করা হতো।[৩২৯]

ইবনে সিনার অমর কীর্তি

ইবনে সিনা রেখে গিয়েছেন বিশাল এক জ্ঞানভান্ডার। তার সেই জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে মানবসভ্যতার পথ মসৃণ হয়েছে। জ্ঞান ও চিন্তার অগ্রগতির

---

৩২৫. *আল-হাযারাতুল ইসলামিয়া বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া আমালিল মুসতাকবাল*, ৫/৩১১

৩২৬. *আল-ইশারাত ওয়াত তানবিহাত*, পৃ. ২৮৩-২৮৪

৩২৭. **মুস্তফা নাজিফ (১৮৯৩-১৯৭১ খ্রি.)** : বিংশ শতাব্দীর মিশরের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম। চিকিৎসা ও পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। ইসলামি সভ্যতার জ্ঞানসমুদ্র সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। হাসান ইবনে হাইসামের রেখে যাওয়া জ্ঞান-গবেষণার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সকল ভাষার জ্ঞানবিজ্ঞানকে আরবিতে অনুবাদের অন্যতম প্রবক্তা।

৩২৮. *উলামাউল আরব ওয়া মা আতাওহু লিল হাযারা*, পৃ. ১৬৩

৩২৯. *উলামাউল আরব ওয়া মা আতাওহু লিল হাযারা*, পৃ. ১৬৩

ইতিহাসে ইবনে সিনার অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের ওপর তার রচিত গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা শখানেকের ওপরে। সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে বিশাল গ্রন্থ ও বিশ্বকোষ।

সম্ভবত ইবনে সিনার রচিত *আল-কানুন ফিত তিব* গ্রন্থটি চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর তার লেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যানিকেতনে। ইংরেজরা এ গ্রন্থকে বলে Canonmedicina। এতে ইবনে সিনা ফিজিয়োলজি, প্যাথলজি, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, রোগের চিকিৎসা, ফার্মাকোলজি এবং অ্যানাটমি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা রচিত এ গ্রন্থটি চিকিৎসাশাস্ত্রের বাইবেল নামে পরিচিত। মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত হলেও ইংরেজি, ফারসি, ল্যাটিন, চীনা, হিব্রু, জার্মান-সহ অসংখ্য ভাষায় এটি অনূদিত হয়। আধুনিক যুগে পরপর এর ১৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে *আল-কানুন ফিত তিব* সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থে উঠে এসেছে তৎকালীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল বিভাগের আলোচনা। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় খ্রিষ্টীয় ১৭ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাব্দীকাল ধরেই পঠিত হয়ে এসেছে ইবনে সিনার এই অমূল্য গ্রন্থখানি।[৩৩০]

প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, ইবনে সিনার *আল-কানুন* গ্রন্থের সামনে গ্রিক ও রোমান বড় বড় চিকিৎসকদের মোটা মোটা গ্রন্থ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে দীর্ঘ সময় ধরে ছিল এই গ্রন্থের একক ও স্থায়ী প্রভাব, চিকিৎসার ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার।[৩৩১]

প্রাচ্যবিদ নিউবার্গার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ *আল-কানুন* গ্রন্থকে মনে করত ভুলত্রুটিমুক্ত ঐশী বাণী। কারণ যে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলো সাজানো হয়েছে, তাতে ভুল খুঁজে পাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এজন্যই কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ মনে

৩৩০. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ২/২৪২; *আল-মুজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতু ইনদাল আরব*, পৃ. ৪০৩-৪০৪

৩৩১. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ২৮৯

করত এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এর বাইরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।[৩৩২]

ইতিহাসবিদ উইলিয়াম অসলার এই গ্রন্থের মূল্যায়ন এভাবে করেছেন যে, প্রায় সাত শতাব্দীর অধিককাল এই গ্রন্থটি মানুষের কাছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পবিত্র ইনজিল হিসাবে বিবেচিত ছিল।[৩৩৩]

ইবনে সিনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম *আশ-শিফা*। এটি ১৮ খণ্ডে রচিত একটি বিশ্বকোষ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংগীতশাস্ত্র। স্বরতত্ত্ব বিষয়ে লেখা তার একটি গ্রন্থ হলো *আসবাবু হুদুসিল হুরুফ*।

তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির মধ্যে আরও রয়েছে, *আল-মাআদ* (পরকালীন জীবন), *আসরারুল হিকমাতিল মাশরিকিয়্যা* (মাশরেকি দর্শনের স্বরূপ), *আল-ইশারাত* (ইঙ্গিতাবলি), *আসরারুস সালাত* (সালাতের তাৎপর্য, এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিধান), *উরজুযাতুন ফিত তিব* (ছন্দে ছন্দে চিকিৎসাশাস্ত্র), *আন-নাবাত ওয়াল হায়াওয়ান* (উদ্ভিদশাস্ত্র ও প্রাণিবিজ্ঞান), *আসবাবুর রাদ ওয়ার বারক* (বজ্রপাতের কারণ) ইত্যাদি।[৩৩৪]

ইবনে সিনার চিকিৎসা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি ল্যাটিন-সহ বিশ্বের বেশিরভাগ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রায় ছয় শতাব্দী পর্যন্ত সেগুলো চিকিৎসাক্ষেত্রে রাজত্ব করেছে। সেগুলো ছিল ফ্রান্স ও ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার ভিত্তি। ১৯ শতকের গোড়ার দিকেও ফ্রান্সের মন্টিপিলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে (Université de Montpellier) তার গ্রন্থগুলো নিয়মিত পড়ানো হতো।[৩৩৫]

এমনই ছিল ইবনে সিনার সোনালি কর্মময় জীবন। তার গ্রন্থ ও উদ্ভাবনের ওপর ভর করে পশ্চিমারা চিকিৎসাশাস্ত্রের সবক নিয়েছে। তিনি মানবসভ্যতার কল্যাণে তার সাধনার শস্য বিলিয়ে গেছেন অবারিত। জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষের দ্যুতি ছড়িয়ে ৪২৮ হিজরি মোতাবেক ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের হামাদান শহরে ইবনে সিনা ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

---

[৩৩২]. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৭

[৩৩৩]. *উলামাউল আরব ওয়া মা আতাওহু লিল হাযারা*, পৃ. ১৬৪

[৩৩৪]. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ২/২৪২

[৩৩৫]. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাযারাতুল আরব*, পৃ. ৪৯০

(৩)

আবু বকর রাযি : ইতিহাসের কিংবদন্তি চিকিৎসক

সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হিসাবে একক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা খুব আশ্চর্যের বিষয়। সভ্যতা বিনির্মাণের গল্পে আমরা বহু মানুষের সামষ্টিক প্রচেষ্টা, কর্ম ও উদ্যোগের কথা শুনে থাকি। সভ্যতার কারিগরগণ জীবন-জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। চিকিৎসা, প্রকৌশল, নির্মাণ-স্থাপত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য অঙ্গনে একেকজনের অনন্য ভূমিকা থাকে। কিন্তু ইসলামি সভ্যতার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সেখানে আবির্ভূত হয়েছে এমন কতক ব্যক্তিত্ব, যারা এককভাবেই ইসলামি সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপরই সভ্যতার নাম প্রয়োগ হতে পারে। তাদের আলোচনা যেন সভ্যতার আলোচনা। তাদের জীবনীর ইতিহাস পাঠ যেন সভ্যতারই ইতিহাস পাঠ!

আবু বকর রাযি শুধু চিকিৎসক কিংবা শিক্ষক ছিলেন না। তার সৃজনশীলতার স্বাক্ষর থেকে বাদ পড়েনি নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ধর্মতত্ত্ব। মানবিক বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ছিল তার পদচারণা। তিনি হয়ে উঠেছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানেও একজন বরেণ্য ব্যক্তি। তার মতো একজন মহান ব্যক্তি একাই এক সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

এই মহান মনীষীর নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া রাযি। জন্মগ্রহণ করেন রায় শহরে। এই শহরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেই তার নাম রাযি। শহরটি ইরানের রাজধানী তেহরানের ছয় কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২৫০ হিজরি মোতাবেক ৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।

শৈশব থেকেই আবু বকর রাযি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও জ্ঞানীদের সাহচর্য অন্বেষী। জন্মভূমি রায় শহরে অধ্যয়ন করেন ধর্মীয় জ্ঞানশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন।[৩৩৬] রায় শহরে যদিও অনেক জ্ঞানী-গুণীর বসবাস ছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখাপ্রশাখার চর্চা সেখানে ছিল, তবু তার জ্ঞানপিপাসা সেখানে পূর্ণ হয়নি। তাই আবু বকর রাযি তৎকালীন সময়ে বিশ্বের জ্ঞানের রাজধানী বাগদাদে যাত্রা করার ইচ্ছা করেন। বাগদাদ ছিল আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী। একটা ছোট কাফেলার সাথে তিনি জ্ঞান

---

৩৩৬. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৬৩

শিক্ষার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে সেখানে চলে যান। বাগদাদে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক শাস্ত্র আয়ত্ত করেন। তবে মৌলিক মনোযোগ তিনি নিবদ্ধ রেখেছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে। উচ্চতর চিকিৎসাচর্চায় তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আলি ইবনে যাইন তাবারি। তিনি *ফিরদাউসুল হিকমাহ* নামে প্রথম চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনা করেন।[৩৩৭]

আবু বকর রাযি (মৃ. ৩১১ হি./৯২৩ খ্রি.) ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তৃতীয় হিজরি শতকের দ্বিতীয় ভাগে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত কিংবদন্তি। তাকে শৈল-ওষুধের অন্যতম পণ্ডিত মনে করা হয়।

প্রথমে তিনি চাকরি গ্রহণ করেছিলেন রায় শহরের হাসপাতালে। পরবর্তী সময়ে নিযুক্ত হন মুকতাদিরি হাসপাতালের প্রধান দায়িত্বশীল হিসাবে।

তিনিই প্রথম ওষুধের মধ্যে রাসায়নিক যৌগ মিশ্রিত করেন। পেডিয়াট্রিক্স বা শিশুদের রোগ-বালাই ও চিকিৎসা নিয়ে আলাদাভাবে তিনিই প্রথম বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছিলেন। সার্জারির পর অঙ্গ সেলাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।[৩৩৮]

তিনিই প্রথম রোগীর রোগের ওঠা-নামা, অবস্থার উন্নতি-অবনতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে লিখে রাখার প্রচলন করেন। রোগের লক্ষণসমূহ, রোগের বিকাশ ও ওষুধ প্রয়োগের ফলে রোগের অবস্থা বিস্তারিত তিনি লিখতেন। সে কালে হাম ও গুটিবসন্তকে একই রোগ ভাবা হতো। আবু বকর রাযি বিস্তারিত গবেষণায় প্রথমবারের মতো এ দুটিকে আলাদা রোগ হিসাবে চিহ্নিত করেন। জেনেটিক কারণে রোগ বিস্তারের বিষয়টাও তিনি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। ওষুধের কার্যকারিতা নিরূপণে তিনি পশুপাখির ওপর পরীক্ষা চালাতেন। তার গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে *আল-হাবি*, *রিসালাতুন ফিল জুদারি ওয়াল হিসবাহ*, *আল-কিতাবুল মানসুরি*, *কিতাবুল আসরার*, *আল-কিতাবুল জামি*।[৩৩৯]

---

৩৩৭. *নাওয়াবিগুল মুসলিমিন*, ১/১১৭

৩৩৮. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩২১-৩২২

৩৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪; *তারিখু হুকামাইল ইসলাম*, পৃ. ২১; *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, ৩/৭৬; *দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া*, ৯/৪৫১; *আল-হাযারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, ৫১০-৫১১

চিকিৎসাশাস্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণার আলোকে তিনি গ্যালেনের তত্ত্ব খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রিক বিজ্ঞানী গ্যালেনের কাছে রক্তসঞ্চালনের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না। তিনি দাবি করেছিলেন, হৃৎপিণ্ডের ডান ও বাম অংশের মধ্যবর্তী সেপটামে অদৃশ্য কিছু ছিদ্র রয়েছে। এই ছিদ্রপথে রক্ত একপাশ থেকে অন্য পাশে যায়। আর ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের ওপর স্পন্দিত হতে থাকে এবং হৃৎপিণ্ড ও রক্তের উষ্ণতা ঠান্ডা করে দেয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং এটি হৃৎপিণ্ড ও রক্তের জন্য পুষ্টি সরবরাহ করে।

আবু বকর রাযি গ্রিসের এই মহান চিকিৎসাবিদের ভ্রান্ত চিন্তা খণ্ডন করে একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম *আশ-শুকুক আলা জালিনুস*। এই গ্রন্থে তিনি গ্যালেনের জ্ঞানগত প্রমাদ তুলে ধরে সঠিক বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন। সাথে সাথে এই ফলাফল ও সিদ্ধান্তে পৌঁছার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন।[৩৪০]

আবু বকর রাযি ওই সকল জ্ঞানের চর্চায়ও প্রবৃত্ত হয়েছেন, যার সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা।[৩৪১] সাথে সাথে দর্শনের বিষয়েও। কারণ দর্শনের মাধ্যমে গ্রিক দার্শনিকদের অভিব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। চিকিৎসা সম্পর্কেও তারা বিভিন্ন মতামত প্রদান করে গেছেন। তাই দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করে গ্রিক দার্শনিকদের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করেছেন।

দর্শনে আবু বকর রাযির প্রথম শিক্ষক ছিলেন আল-বালখি[৩৪২]। আবু বকর রাযি একটানা কয়েক বছর চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করেন। হাতের নাগালে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যা পেতেন সেটাই তিনি আত্মস্থ করে নিতেন। এভাবে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেন।

বাগদাদ থেকে চূড়ান্ত শিক্ষা লাভের পর তিনি ফিরে আসেন জন্মভূমি রায় শহরে। রায় শহরের হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসলামি সভ্যতায় এটি একটি প্রাচীনতম হাসপাতাল। এখান থেকে তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌দিগন্তে। তার যুগের অসম্ভব ও দুর্বোধ্য অনেক রোগের ওষুধ আবিষ্কার

---

৩৪০. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৬৮

৩৪১. নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালি, *আবজাদুল উলুম*, ৩/১১৪

৩৪২. *আল-ফিহরিসত লি ইবনি নাদিম*, ১/৪১৬

করতে সক্ষম হন তিনি। জনমুখে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ছোট-বড়, দূরের-কাছের বহু মানুষ তার কথা জানত।

আব্বাসি খেলাফতের উচ্চ পর্যায়ের উজির আদুদুদ্দাওলাহ ইবনে বুওয়াইহের কানে আবু বকর রাযির কথা পৌঁছে। তিনি রাযিকে বাগদাদের প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয় আদুদি হাসপাতালে আমন্ত্রণ জানান। তৎকালীন সময়ে আদুদি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। সেখানে নিযুক্ত ছিলেন ৫০০ চিকিৎসক।[৩৪৩]

বাস্তব কথা হলো, এটা নিছক কোনো হাসপাতাল ছিল না। এটা ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। আবু বকর রাযি এখানে এসে হয়ে ওঠেন চিকিৎসাশাস্ত্রের জীবন্ত বিশ্বকোষ। তার তুলনা কেবল বাগদাদে নয়, তখন সারা দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। এই মহান মর্যাদায় তিনি হাতে গোনা কয়েক বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং কয়েক শতক পর্যন্ত ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন কয়েক প্রজন্মের কিংবদন্তি চিকিৎসক।

এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সমাধানে একটু বিরতি নিতে পারি। প্রশ্নটি হলো, কীভাবে আবু বকর রাযি মহান মর্যাদা অর্জন করে গৌরবের উঁচু শিখরে পৌঁছতে পারলেন?

সফলতা কখনো হঠাৎ করে চলে আসে না। উঁচুতে পৌঁছতে হলে দরকার অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, শ্রম এবং কুরবানির। এমনইভাবে সৃজনশীলতাও চট করে মানুষের ভেতর চলে আসে না। এর জন্য প্রয়োজন লক্ষ্য নির্ধারণ, চেষ্টা ও পরিশ্রম। এসবের সমন্বয়েই ছিল আবু বকর রাযির জীবন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।

আবু বকর রাযি সকল জায়গা থেকেই জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেছেন। হাতের নাগালে যা-কিছু পেয়েছেন সাধ্যমতো অধ্যয়ন করেছেন এবং পরীক্ষানিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। গভীর অধ্যবসায়, চিন্তাশীল, ধীরস্থির গবেষণার মাধ্যমে তিনি পঠিত বিষয়ের তুলনা ও সমালোচনা করতেন। সমস্যা ও সমাধানের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি অভিনব কিছু আবিষ্কার করে ফেলতেন।

---

[৩৪৩]. *রওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২১৮

আবু বকর রাযির সময় সারা পৃথিবীতে গ্রিক, পারসিক, ভারতীয়, মিশরীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। আলেমগণ যে তাদের চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থাবলি অনুবাদ করেছিলেন এটা ছিল তারই ফলাফল। রাযি সেগুলো গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি নতুন পথ নির্মাণ করতে চেয়েছেন এবং তিনি সফল হয়েছেন।

গ্রিক চিকিৎসাপদ্ধতি সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তবে তা ছিল তত্ত্বনির্ভর, প্রায়োগিক না। সকল গ্রিক চিকিৎসক এই তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতির অনুসরণ করতেন। ফলে তারা দার্শনিক চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। বাস্তব জীবনের অঙ্গনেও তারা পারতপক্ষে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতেন না। এই ব্যাধিতে সকল গ্রিক চিকিৎসক আক্রান্ত ছিলেন। এমনকি হিপোক্রেটিস এবং গ্যালেনের মতো মহান মনীষীও এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু আবু বকর রাযি উচ্চারণ করে গেছেন সিদ্ধান্তমূলক ঐতিহাসিক বাণী, আজকের যুগে যা জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বজনীন নীতি, বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলনীতি হিসাবে বিবেচিত। তিনি বলেন, প্রচলিত দর্শনের সাথে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের বিরোধ হলে আমাদেরকে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই গ্রহণ করতে হবে। যদিও এর বিপরীতে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমর্থনে সকলেই দর্শনকে গ্রহণ করে।[৩৪৪]

তিনি আরও বলেন, কোনো বিখ্যাত কিংবা অখ্যাত চিকিৎসকের জন্য বৈধ নয় যে, সে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফলকে পেছনে রেখে পূর্ববর্তীদের তাত্ত্বিক দর্শনকে আঁকড়ে ধরবে। সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে। এমন যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল আবু বকর রাযির চিকিৎসাশাস্ত্র। কোনো দর্শন কিংবা তর্কনির্ভর অনুমানের লেশ ছিল না এতে।

কী অসাধারণ এবং সৃজনশীল একটি মূলনীতি তিনি বর্ণনা করে গিয়েছেন, যা আজ আমরা দেখে অবাক হতে বাধ্য হই।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই একাধিকবার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে আবু বকর রাযি পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের চিন্তাধারার সমালোচনা করতেন। এমনকি তিনি গ্রিসের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ গ্যালেনের দর্শন খণ্ডনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ

---

৩৪৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৭৭-৭৮

রচনা করেছেন। এর নাম দিয়েছেন *আশ-শুকুক আলা জালিনুস*, বা গ্যালেনের ভ্রান্তি নিরসন।

এই বইতে তিনি গ্যালেনের ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন এবং সমাধানে পৌঁছার পন্থাও জানিয়ে গেছেন।[৩৪৫]

আবু বকর রাযি সর্বদা রোগীদেরকে শরীরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। রোগের নিকটবর্তী-দূরবর্তী সকল কারণ জানতে তিনি অতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলতেন, চিকিৎসকের উচিত সর্বদা রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং তাকে শরীরের সার্বিক অবস্থা জিজ্ঞেস করা। যথাসম্ভব কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে না যাওয়া।[৩৪৬] তিনি এখানে যা বর্ণনা করলেন সেটাই হলো আধুনিক চিকিৎসার প্রথম ধাপ। রোগের তারিখ জানা, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে রোগের সম্ভাব্য কারণ ও উপসর্গ খুঁজে বের করা চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য।

রোগীর দেহের তাপমাত্রা, নাড়ির স্পন্দন প্রায়ই পরীক্ষা করে দেখতেন আবু বকর রাযি। কোনো রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন হলে তাকে নিরবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে রাখতেন। এর মাধ্যমে রোগের উপসর্গ নির্ণয় এবং চিকিৎসা দিতে সহায়ক তথ্যগুলো টুকে রাখতেন।

আবু বকর রাযি রোগের অবস্থাগুলোর এত সূক্ষ্ম বিবরণ দিয়েছেন যে, তাতে পাঠকের অবাক না হয়ে উপায় নেই।

আবু বকর রাযি আধুনিক চিকিৎসাধারার সিঁড়ির ধাপে আরও ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষালব্ধ চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন পশুপাখির ওপর। প্রাণীদের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেন। নতুন নতুন ওষুধ তৈরি করে সেগুলোর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন বানরের ওপর। বানরের দেহে ফলপ্রসূ হলে তিনি সেগুলো মানুষের দেহে প্রয়োগ করার সাহস পেতেন। এটা ছিল এক চমৎকার বিষয়। বর্তমান যুগেও পশুপাখির ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা না চালানো হলে সিংহভাগ ওষুধের অনুমোদন দেওয়া হয় না। এটিই করেছিলেন আবু বকর রাযি।[৩৪৭]

---

[৩৪৫]. প্রাগুক্ত, ১/৬৮

[৩৪৬]. প্রাগুক্ত, ৩/২৭

[৩৪৭]. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৭৮

আবু বকর রাযির এই অনবদ্য ও অসাধারণ গবেষণামূলক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির দরুন তিনি এমন সব ফলাফল পেয়েছেন, যা ছিল যুগের তুলনায় অবিশ্বাস্য। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অগ্রগামিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যেমন—

প্রথম ব্যক্তি হিসাবে শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত সুতা উদ্ভাবন করেন। বিড়ালের অন্ত্র প্রক্রিয়াজাত করে এই সুতা উদ্ভাবন করেন। আবু বকর রাযির মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই সুতা ব্যবহার করা হতো। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সার্জারির জন্য উন্নতমানের সুতা আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত শল্যচিকিৎসকরা আবু বকর রাযির উদ্ভাবিত সুতাই ব্যবহার করতেন। এ সুতাগুলোই ক্যাটগুট (catgut) নামে পরিচিত।[৩৪৮]

আবু বকর রাযিই প্রথম আবিষ্কার করেছেন পারদ মলম।[৩৪৯]

তিনিই প্রথম শিরাস্থ রক্তক্ষরণ এবং ধমনির রক্তক্ষরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেন। শিরাস্থ রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আঙুলের চাপ ব্যবহার করার কথা বলেন এবং ধমনির রক্তপাত বন্ধ করার জন্য তিনি বেঁধে দেওয়ার পদ্ধতির প্রচলন করেন। বর্তমানেও এই পদ্ধতি প্রচলিত!

তিনি প্রথম চোখের মধ্যে জমে থাকা পানি বের করার প্রক্রিয়া বাতলে দিয়েছেন।[৩৫০]

শুকনো কাশির চিকিৎসায় তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আফিম।

তিনিই ফার্মাকোলজিতে জোলাপের প্রথম ব্যবহার করেছেন।

প্রথম তিনিই জ্বরকে রোগ না বলে রোগের লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৫১]

তিনি রোগীর প্রস্রাব ও রক্তের বিবরণ পর্যালোচনায় গুরুত্বারোপ করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসাসেবার জন্য অভিনব কোনো কার্যকরী তথ্য উদ্ঘাটন করা।[৩৫২]

---

৩৪৮. *আল-মুজায লিমা আদাফাহুল আরব ফিত-তিব*, পৃ. ৪৩
৩৪৯. *কিসসাতুল হাযারা*, ৪/৪
৩৫০. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ৩০৮
৩৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৩৫২. *আল-হাবি ফিত তিব লি-রাযি*, ১০/১০

ভেষজ ওষুধ ও স্বাভাবিক খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হলে তিনি রাসায়নিক ওষুধ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতেন। আধুনিক চিকিৎসকগণও এই উপদেশ দিয়ে থাকেন।[৩৫৩]

আবু বকর রাযি কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন আর অন্যান্য শাখায় তার দক্ষতা ছিল না, বিষয়টা আদৌ এমন না। তিনি চিকিৎসার বহু শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অভ্যন্তরীণ রোগ, শিশুরোগ, নারীদের রোগ, যৌন ও প্রজননসংক্রান্ত রোগ, চক্ষুরোগ, শল্যচিকিৎসা ইত্যাদি শাখায় তিনি ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা আবু বকর রাযিকে প্রদান করেছিলেন অসাধারণ মেধা। বাগদাদের সর্ববৃহৎ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ধারণে তার অসাধারণ মেধার অনন্য এক নজির মেলে। আবু বকর রাযির কাছে বাদশাহ আদুদুদ্দাওলা চিকিৎসালয় নির্মাণের জন্য সর্বোত্তম স্থান নির্বাচনের পরামর্শ চান। হাসপাতালের জন্য আবু বকর রাযি প্রথমে চারটি স্থান নির্বাচন করেন। এরপর নির্বাচিত চারটি স্থানের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্তটি চয়নের জন্য পরীক্ষা চালাতে শুরু করলেন। তিনি চারটি স্থানেই এক টুকরো করে তাজা গোশত রেখে দিলেন। দিনদিন গোশতগুলো পচতে শুরু করে। তিনি প্রতিদিন গোশতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। ধীরে ধীরে চারটি স্থানের গোশতই পচে গেল। তখন তিনি যে স্থানের গোশত সর্বশেষে পচেছে সেই স্থানকেই হাসপাতাল নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করেন। কেননা চারটি স্থানের মাঝে এই স্থানটির পরিবেশ সবচেয়ে ভালো। তাইতো এখানে রাখা গোশত সবার পরে পচেছে। সুতরাং এখানকার পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাস রোগের সুস্থতায় সবচেয়ে উপযোগী ও সহায়ক হবে।[৩৫৪]

আবু বকর রাযি নিছক চিকিৎসক ছিলেন না। তিনি একজন মহান শিক্ষকও ছিলেন। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাত্রদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে যোগ্য ছাত্র গড়ে তুলতেন। তিনি ক্লাস নিতেন আদুদি হাসপাতালে। পাঠদানের ক্ষেত্রে তিনি দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, **এক.** চিকিৎসাগত তাত্ত্বিক আলোচনা করা **দুই.** হাতেকলমে ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা দেওয়া।

---

[৩৫৩]. *নাওয়াবিগুল মুসলিমিন*, ১/১২১

[৩৫৪]. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/১৩

তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠদান করতেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা রাখা, চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে জ্ঞানমূলক উন্মুক্ত সেমিনারের আয়োজন করার পাশাপাশি তিনি ছাত্রদেরকে রোগীর বিছানার পাশে নিয়ে রোগ ও রোগীর অবস্থা ব্যাখ্যা করতেন, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বর্ণনা করতেন। তিনি তিন বছরের পাঠ্যক্রমে চিকিৎসাশাস্ত্রের পূর্ণ কোর্স শেষ করতেন। প্রথমে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়গুলো গ্রন্থ ও বক্তৃতার মাধ্যমে শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিকভাবে বোঝাতেন। এরপর প্রায়োগিকভাবে হাতেকলমে দেখিয়ে দিতেন। যেমনটা আমরা বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজগুলোয় দেখতে পাই। তৃতীয় বছরের শেষে একটা চূড়ান্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকত। এই পরীক্ষার দুটি অংশ ছিল, **এক.** অ্যানাটমি ও সার্জারি নিয়ে। **দুই.** রোগীদের ওপর প্রায়োগিক পদ্ধতি নিয়ে। কেউ যদি প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতো, তাহলে তাকে আর দ্বিতীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হতো না। বর্তমানেও মেডিক্যাল কলেজগুলোয় সাধারণত এই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা নেওয়া হয়।[৩৫৫]

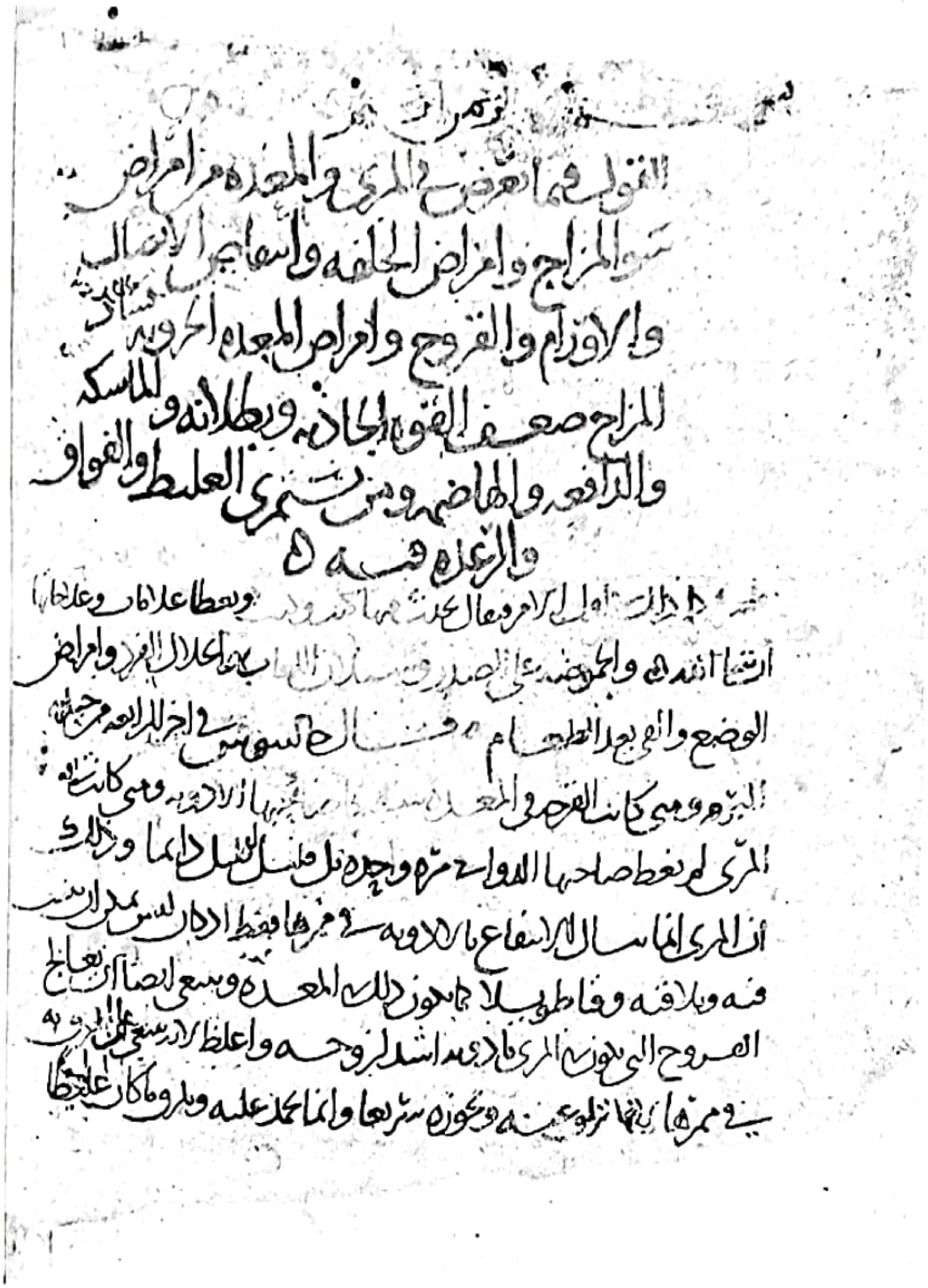
আবু বকর রাযি চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে শুধু পাঠদান, পরীক্ষা নেওয়া ও মৌলিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি আরেকটি ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন, যা কোনোমতেই পাঠদানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রচনা ও লেখালেখি। ইবনে নাদিম তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-ফিহরিসত*-এ আবু বকর রাযির ১১৩টি বড় গ্রন্থ ও ২৮টি ছোট পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে বিশাল সংখ্যা। বিশেষত এর সবকটিই ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে।[৩৫৬] এর বাইরেও তার আরও গ্রন্থ আছে।

আবু বকর রাযির সর্ববৃহৎ গ্রন্থ *আল-হাবি ফি ইলমিত তাদাবি*। রাযির যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের যতদূর অগ্রগতি হয়েছিল, তার সকল দিকের জ্ঞানই এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার ক্লিনিক্যাল জীবনের অভিজ্ঞতার সারনির্যাস এখানে তিনি তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে রাযির দক্ষতা, পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা, জ্ঞানের গভীরতা ও অনবদ্য সৃজনশীলতা ফুটে উঠেছে।

---

৩৫৫. *আস-সিনাআতুত তিব্বিয়্যা*, পৃ. ৩০৩

৩৫৬. *আল-ফিহরিসত লি ইবনি নাদিম*, ১/৪২০



চিত্র নং-৯

আবু বকর রাযির *আল-হাবি ফিত তিব* গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ইতালির ব্রেসিয়াতে। মুদ্রণশিল্প আবিষ্কারের অব্যবহিত পর এটাই সম্ভবত প্রকাশিত সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থ। ২৫ খণ্ডে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ইতালির ভেনিসে কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছিল ষোড়শ শতকে। ঐতিহাসিক ম্যাক্স মেয়েরহোফ উল্লেখ করেছেন, ১৫০০ সালের আগেই এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের পাঁচটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায় আর কয়েকটি খণ্ড বহুবার প্রকশিত হয়।

আবু বকর রাযির আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম *আল-মানসুরি*। খোরাসানের শাসক মানসুর ইবনে ইসহাকের দিকে সম্বন্ধ করে এই নাম রাখা হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি অভ্যন্তরীণ রোগ, সার্জারি, চক্ষুচিকিৎসা সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ততার প্রতি অধিক লক্ষ রাখা হয়েছে। গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে ১০ খণ্ডে!

ইউরোপের চিকিৎসাবিদগণ এই গ্রন্থের একাধিক অনুবাদ বের করেছেন। ল্যাটিন, ইংরেজি, জার্মান, হিব্রু-সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে গ্রন্থটি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৮৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৪৮১ সালে ইতালির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মিলানে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থটি ইউরোপের চিকিৎসকদের অন্যতম ভরসাস্থল হিসাবে বিবেচিত ছিল।[৩৫৭]

আবু বকর রাযির অন্যতম আরেকটি গ্রন্থ হলো *আল-জুদারি ওয়াল হাসবাহ*। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি গুটিবসন্ত ও হামের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। রোগদুটির পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিশ্লেষণ এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। ১৪৯৮ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যে এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫৮]

তার আরেকটি অন্যতম গ্রন্থ *আল-আসরার ফিল কিমিয়া*। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রসায়নশাস্ত্রের অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত ছিল এটি।[৩৫৯]

নৈতিক ও আত্মিক সংশোধনে তার রচিত *আত-তিব্বুর রুহানি* একটি চমৎকার গ্রন্থ। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন, এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য আত্মিক

---

৩৫৭. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৯২
৩৫৮. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ৭৩
৩৫৯. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৯১

নৈতিকতার সংশোধন। এই গ্রন্থে তিনি মানুষের বিবেচনাশক্তির মর্যাদা তুলে ধরেছেন। কুপ্রবৃত্তির সংশোধন, মন্দ আচরণের বিরোধিতা এবং নিজেকে উন্নত স্বভাবে অভ্যস্ত করার বিষয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন।[৩৬০]

আবু বকর রাযির গ্রন্থাবলি ও লেখালেখির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো আদর্শিক গুণ বজায় রাখা। লেখালেখিতে তিনি সবসময় জ্ঞানের আমানত রক্ষা করেছেন। অন্যদের থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করলে তিনি মূল লেখকদের নাম উল্লেখ করে দিতেন। অন্যদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব কখনোই নিজের নামে চালিয়ে দিতেন না। এজন্যই তার গ্রন্থাবলিতে ভরে আছে গ্যালেন, হিপোক্রেটিস ও আরমানিয়াস প্রমুখের নাম। ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক প্রমুখ নবীন চিকিৎসকদের নামও তিনি উল্লেখ করে দিতেন।

তিনি সর্বদা ছাত্রদেরকে লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করতেন। তাদের বলতেন, একজন ছাত্র যখন নির্দিষ্ট বিষয়ের অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে এবং অধ্যয়ন করে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে, তার উচিত অধীত বিষয়ে গ্রন্থগুলোয় যা সংযোজিত হয়নি তা নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা।

প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি ক্লাসে নোট করতে ও রোগী দেখে লব্ধ অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে বলতেন। যেন এর মাধ্যমে তারা নিজেরা এবং তাদের পরবর্তীরা উপকৃত হতে পারে।

আবু বকর রাযি শুধু যে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়, পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। দান, দয়া, বদান্য, উদারতা ও দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি ছিলেন অনন্য । আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতিও তিনি অনেক সদয় ছিলেন। রোগীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল ও দয়ালু। নিজের পকেট থেকে তিনি রোগীদের জন্য খরচ করতেন। কখনো কখনো স্থায়ী ভাতা নির্ধারণ করে দিতেন।[৩৬১]

তিনি সবসময় ছাত্রদের উপদেশ দিতেন, তাদের উদ্দেশ্য যেন অর্থ উপার্জন না হয়। রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়াই যেন তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য থাকে। শাসক এবং ধনাঢ্যদের পাশাপাশি দরিদ্রদের জন্য আলাদাভাবে তিনি সুচিকিৎসার চিন্তাভাবনা করতেন। এ নিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন

---

৩৬০. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৫

৩৬১. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/১৩

তিব্বুল ফুকারা নামে। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন রোগ এবং সেগুলোর উপসর্গ বর্ণনা করেছেন। দামি দামি ও দুর্লভ ওষুধের পরিবর্তে হাতের নাগালে পাওয়া যায় এমন ভেষজ ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি তুলে ধরেছেন।[৩৬২]

উন্নত নীতিনৈতিকতার প্রতি তিনি সবসময় লক্ষ রাখতেন। এজন্যই এ বিষয়ে রচনা করেছেন *আখলাকুত তাবিব* নামে চিকিৎসা-নীতিশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ। এখানে তিনি চিকিৎসক ও রোগীর মাঝে মানবিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। একইসাথে চিকিৎসকদের পারস্পরিক আচরণ এবং চিকিৎসকদের সাথে রোগীর শিষ্টাচার তুলে ধরেছেন।[৩৬৩]

চিকিৎসাশাস্ত্রে আবু বকর রাযির কৃতিত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। সকলেই একবাক্যে আবু বকর রাযির দান-অবদান, জ্ঞানগরিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্বের স্বীকৃতি দেয়। কেবল মুসলিমরা নয়, বরং অমুসলিমরাও রাযির আবিষ্কার ও কীর্তির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিভিন্ন ভাষায় রাযির গ্রন্থাবলির অনুবাদ ও একাধিক সংস্করণের জনপ্রিয়তা থেকে আমরা তার কৃতিত্ব অনুধাবন করতে পারি। এ ছাড়াও আমরা এমন বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পাই, যা তার মহান মর্যাদা ও সম্মানের ইঙ্গিত করে। একটি ঘটনা বলি, বিখ্যাত ফরাসি রাজা একাদশ লুই (শাসনকাল : ১৪৬১-১৪৮৩ খ্রি.) প্রচুর স্বর্ণ ব্যবহার করে *আল-হাবি ফিত তিব* গ্রন্থের একটি ব্যক্তিগত সংস্করণ তৈরি করিয়েছিলেন, যেন কোনো রোগে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে তার নিযুক্ত চিকিৎসকগণ দ্রুত তা দেখে চিকিৎসা দিতে পারেন।

প্রাচীন ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসার *দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস* গ্রন্থে আবু বকর রাযিকে প্রশংসার সাথে উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখাপ্রশাখার আত্মপ্রকাশসত্ত্বেও আবু বকর রাযির নাম একটুও মলিন হয়নি। এটি তার অমর কীর্তির শ্রেষ্ঠতম একটি দিক। আমরা দেখি এ যুগেও আমেরিকার প্রেস্টন বিশ্ববিদ্যালয় বৃহৎ একটি শাখার নাম রেখেছে রাযির নামে।[৩৬৪] প্যারিস ইউনিভার্সিটির মেডিসিন অনুষদে রাযির একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। প্যারিসের সেন্ট-জার্মেইন স্ট্রিটে তার ছবি রয়েছে।

---

৩৬২. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১১৫-১১৬

৩৬৩. *মুকাদ্দামাতু আখলাকিত তাবিব লি রাযি*, পৃ. ৬

৩৬৪. *আসারুল উলামা ওয়াল মুসলিমিন ফিল হাযারাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ১৩৮

আবু বকর রাযি ছিলেন ইসলামি সভ্যতার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের ক্ষণজন্মা কিংবদন্তি চিকিৎসক, বিদ্বান, শিক্ষক। সর্বোপরি একজন মানুষের মতো মানুষ। জীবনকে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলাম, জ্ঞান ও মানবতার সেবায়। ৬০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তার মৃত্যু হয়েছে ৩১১ হিজরি মোতাবেক ৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

'তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন', এটা বলা কঠিন। মানুষ যতদিন অন্যের উপকার করতে পারে, ততদিন সে অমর থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই বলেছেন,

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ»

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি বিষয় বন্ধ হয় না। **এক.** সদকায়ে জারিয়া **দুই.** এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় **তিন.** নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।[৩৬৫]

(৪)

আবুল কাসেম জাহরাবি : সার্জারিবিজ্ঞানের অগ্রপথিক

খালাফ ইবনে আব্বাস জাহরাবি (মৃ. ৪২৭ হি./১০৩৬ খ্রি.) ছিলেন আন্দালুসের একজন বিখ্যাত জ্ঞানসাধক। তার রচিত *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছেন আরব মুসলিমদের মাঝে মধ্যযুগে ও ১৭ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উন্মেষপর্বে সার্জারিবিজ্ঞানের অগ্রপথিক। তার গ্রন্থাদি অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মূত্রাশয়ের পাথর ভেঙে বের করার সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি বাত, যক্ষ্মা-সহ বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করেছেন।[৩৬৬]

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে অনেক জ্ঞানসাধক ও বিজ্ঞানী নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তারা ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও

---

৩৬৫. *সহিহ মুসলিম*, ১৬৩১; *সুনানু আবি দাউদ*, ২৮৮০; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৮৮৩১; *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ৬৪৫৭

৩৬৬. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৩৩৩; *আল-হাযারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১৩

প্রকৌশলে অন্ধকার রাতের আকাশে উজ্জ্বল তারকা। তাদের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার মানবসভ্যতার রাজমহলে অঙ্কিত হয়ে আছে।

আলোচনার ধারাবাহিকতায় আমরা এখন একজন শল্যচিকিৎসকের জীবনী তুলে ধরব। মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক না হলেও কালের মানদণ্ডে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ একজন। তার পুরো নাম আবুল কাসেম খালাফ ইবনে আব্বাস জাহরাবি আল-আন্দালুসি। ইউরোপের জ্ঞানীমহলে তিনি পরিচিত 'Abulcasis' নামে। একজন শল্যচিকিৎসক হয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন শল্যছুরি এবং সার্জিক্যাল কাঁচির মতো সার্জারির প্রাথমিক ও অভিনব সরঞ্জাম। সার্জারির মূলনীতি ও আনুষঙ্গিক নিয়মকানুনও তিনি প্রণয়ন করে গিয়েছেন। অস্ত্রোপচারকালে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ধমনি-সংযোগপদ্ধতি আবিষ্কার তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। অস্ত্রোপচারের সময় ক্ষতস্থানকে সেলাই করার বিশেষ সুতা বা তন্তুও তিনিই উদ্ভাবন করেন। এসব বিবেচনায় বলা যায়, জাহরাবি ছিলেন বিশ্বমানবতার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

আবুল কাসেম জাহরাবি আন্দালুসের জাহরা শহরে[৩৬৭] জন্মগ্রহণ করেন। সেদিকে সম্বন্ধ করেই তাকে জাহরাবি বলা হয়। তার জন্ম ৩২৫ হিজরি মোতাবেক ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। তার মৃত্যুতারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, তার মৃত্যু ৪০৪ হিজরি/১০১৩ খ্রিষ্টাব্দে। কেউ বলেন, ৪২৭ হিজরি/১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।[৩৬৮]

জাহরাবি আন্দালুসে ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষের শীর্ষ সময়টা পেয়েছেন। বেড়ে উঠেছেন এমন সমাজে, যেখানে ছিল জ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণার উপকরণের সমাহার। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি সময়ের ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, আবুল কাসেম জাহরাবি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্তের খুব অভাব। তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিকদের কলমেও তার কথা বিস্তৃতির সাথে উঠে আসেনি। মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ইবনে আবি উসাইবিয়ার সংক্ষিপ্ত আলোচনা জাহরাবির জীবনী সম্বন্ধে স্বল্প তথ্যেরই প্রমাণ বহন করে। ইবনে আবি উসাইবিয়া

---

৩৬৭. **মদিনাতুজ জাহরা :** খলিফা আবদুর রহমান নাসির এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এটি কর্ডোভা শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। *মুজামুল বুলদান*, ৩/১৬১

৩৬৮. *আল-আলাম লিয-যিরিকলি*, ২/৩১০

চিকিৎসকদের জীবনী নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তবে জাহরাবির জীবনী লিখেছেন মাত্র একটি অনুচ্ছেদে। ইবনে আবি উসাইবিয়া তার সম্পর্কে বলেন, খালাফ ইবনে আব্বাস জাহরাবি ছিলেন বিযুক্ত ও কম্পোজিট মেডিসিন সম্পর্কে দক্ষ চিকিৎসক। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার প্রসিদ্ধ বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি *জাহরাবি* নামে প্রসিদ্ধ। তবে তার সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ*। সার্জারিবিজ্ঞানে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাসমৃদ্ধ গ্রন্থ।[৩৬৯]

বিক্ষিপ্ত তথ্য-উপাত্ত একত্র করে আমরা জানতে পারি, আবুল কাসেম জাহরাবি কর্ডোভার হাসপাতালে কাজ করতেন। এই হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল খলিফা আবদুর রহমান নাসেরের হাতে। আবুল কাসেম জাহরাবি এখানে রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি শল্যচিকিৎসার উপকরণ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করতে থাকেন। এখানেই প্রচুর পড়ালেখা ও জ্ঞানসাধনায় নিমগ্নতার দরুন গড়ে ওঠে তার বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাতন্ত্র্য। চিকিৎসাক্ষেত্রে তার গভীর প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয়। কম্পোজিট ও মৌলিক ওষুধ সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পর তিনি অর্জন করেন বাস্তব ও প্রায়োগিক জ্ঞান। প্রথমদিকে তিনি ওষুধবিজ্ঞান ও চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শল্যচিকিৎসায় ও অ্যানাটমিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। কারণ তখন একজন ভালো সার্জন পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। ফলে এই ক্ষেত্রে আসন গেড়ে বসেছিল রক্তমোক্ষক ও ক্ষৌরকারজাতীয় লোক। তিনি নিপুণভাবে সার্জারি আয়ত্ত করেন এবং সার্জারিতে সৃজনশীলতার পরিচয় দেন। এভাবে চর্চা, গবেষণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি শল্যবিদ্যায় দক্ষ থেকে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচারবিদ্যায় এমন অত্যুচ্চ মর্যাদা অর্জন করেন যে, শল্যচিকিৎসা-ইতিহাসের সঙ্গে তার নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। বর্তমানে সার্জারিবিজ্ঞানের আলোচনায় তার নাম উচ্চারিত না হয়ে পারে না।[৩৭০]

---

[৩৬৯]. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/২৪৬

[৩৭০]. *উলামাউ আন্দালুস ইবদাআতুহুমুল মুতামাইয়িযা ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৩১; *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৩১-৩৩২; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৬২

জাহরাবির সার্জারিসংক্রান্ত গবেষণা এ বিষয়ের প্রাচীন বইপুস্তকগুলোর স্থান দখল করে নিয়েছিল। হয়ে উঠেছিল সার্জারির অন্যতম অবলম্বন এবং দলিলগ্রন্থ। এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল খ্রিষ্টীয় ১৬ শতক পর্যন্ত। চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে তার চিন্তাগুলো ছিল সৃজনশীল ও বিপ্লবী। রোগীদের রোগ নিরাময়ের জন্য সার্জারিতে তিনি নতুন সক্ষমতা আনয়ন করেছিলেন, যা সে সময়কার চিকিৎসকদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়, এমনকি বর্তমান সময়ের চিকিৎসকদেরও বিস্মিত করে। তার লিখিত গ্রন্থে দুশতাধিক শল্যচিকিৎসাবিষয়ক যন্ত্রপাতির সচিত্র নকশা ছিল। পশ্চিমা শল্যচিকিৎসকদের ওপর গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রভাব ফেলে। ১৬ শতকে যারা ইউরোপে শল্যচিকিৎসার আধুনিকায়ন করেছেন তাদের কাছে গ্রন্থটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বলা যায়, ইউরোপে সার্জারির মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল তার উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি।[৩৭১]

সার্জারি করতে জাহরাবি যেসব যন্ত্রের সাহায্য নিতেন, সেগুলোর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। যন্ত্রগুলোর ব্যবহারপদ্ধতি ও তৈরির পন্থা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এসব যন্ত্রের মধ্যে কিছু আছে পূর্ববর্তীদের গবেষণা আর কিছু তার নিজের আবিষ্কার। যেমন প্রসবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সাঁড়াশি বা ফরসেপ, মহিলাদের বিভিন্ন ডাক্তারি পরীক্ষায় ব্যবহৃত যোনি আরশি বা স্পেকুলাম, প্রচলিত সিরিঞ্জ ও ইনজেকশন, পায়ুপথে ব্যবহৃত ইনজেকশন এনিমা, জিহ্বা-মুখ পরীক্ষার জন্য বিশেষ চামচ, টনসিলের গিলোটিন, দাঁত উত্তোলনের ছোট সাঁড়াশি ও চিমটা, হাড় কাটার সার্জারি করাত, বিভিন্ন ধরনের স্ক্যালপেল ও অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন সরঞ্জাম। জাহরাবির আবিষ্কৃত এই যন্ত্রপাতিগুলো কয়েক শতাব্দীব্যাপী চর্চা ও গবেষণায় উন্নত হয়ে আধুনিক সার্জিকাল সরঞ্জামাদিতে পরিণত হয়েছে।[৩৭২]

জাহরাবির অন্যতম একটি আবিষ্কার হলো ইনজেকশন। যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'জাররাকা'। অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য এটা খুবই দরকারি একটা যন্ত্র। দেখতে সাধারণ, কাজে অসাধারণ এ যন্ত্র থেকে তার গবেষণা ও প্রতিভা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি।

---

৩৭১. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৩২

৩৭২. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ১৭৬



চিত্র নং-১০

আত-তাসরিফ গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

'জাররাকা' যন্ত্রের মাধ্যমে জাহরাবি সার্জারিকর্ম পরিচালনা করতেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, যা থেকে অন্যরা বহুগুণ পিছিয়ে ছিল। অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার ভিত্তি ছিল

মানবদেহের শারীরবৃত্ত অধ্যয়ন, পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকার গ্রহণ, বাস্তব কাটাছেঁড়ার অভিজ্ঞতা, সংবেদী পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরতা এবং হাতেকলমে চর্চা যা সার্জনকে অভিজ্ঞ, যশস্বী ও পারদর্শী করে তোলে। এই পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করে গিয়েছেন *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ* গ্রন্থে।[৩৭৩]

ক্যাম্পবেল তার *আরব মেডিসিন* বইয়ে বলেছেন, প্যারিস, লন্ডন ও এডিনবার্গের চেয়ে আন্দালুসিয়ায় সার্জারিবিজ্ঞান বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল। কারণ আন্দালুসিয়ায় সার্জারি চিকিৎসকদেরকে যতটা সম্মান দেওয়া হতো, তা দশম হিজরি শতাব্দী পর্যন্তও ইউরোপের অঞ্চলগুলোয় বিরল ছিল।[৩৭৪]

কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জাহরাবির মতো যোগ্য ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসকের সন্ধান মেলেনি। তিনি মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বৃহৎ বিশ্বকোষ। এটি পূর্ণাঙ্গ, বিস্তৃত ও জ্ঞানগর্ভ বিশ্বকোষ। এখানে রয়েছে সার্জারি ও সার্জারির যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। চিকিৎসাশাস্ত্রে তার গ্রন্থের মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। কেউ এর নাম দিয়েছে বিশ্বকোষ। কেউ কেউ এই বিশ্বকোষকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মহাকাব্যও বলেছেন। এটি মুসলিমদের চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি বৃহৎ রচনাসম্ভার।

প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর চেয়ে সমৃদ্ধ এবং তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক যুগপৎ আলোচনাবিশিষ্ট কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এই বিশ্বকোষটি সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমা সার্জনদের জন্য প্রধান দলিল হিসাবে বিবেচিত ছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন সালেরনো এবং মন্টপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্য একটি অন্যতম মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ ছিল এটি। ইতালির রেনেসাঁসের সময় এবং পরবর্তী শতাব্দীতে *আত-তাসরিফ* গ্রন্থটি ইতালির শল্যচিকিৎসকদের কাছে পরিচিত ছিল এবং তারা গ্রন্থটির ওপর

---

৩৭৩. *উলামাউল আন্দালুস ওয়া ইবদাআতুহুমুল মুতামাইয়িযাহ ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ৩২

৩৭৪. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৩৬

অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল, এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিস্মৃত হওয়া মোটেও উচিত হবে না।[৩৭৫]

জাহরাবি এ ছাড়া আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন *আল-মাকালা ফি আমালিল ইয়াদ*, *মুখতাসারুল মুফরাদাত ওয়া খাওয়াসসুহা* ইত্যাদি। ঐতিহাসিক যিরিকলি বলেন, আমি আন্দালুসি লিপিতে লেখা পাশ্চাত্যের একটি পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলাম। পুরো গ্রন্থটি আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত বর্ণানুক্রমিক বিন্যস্ত। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে ছিল গ্রিক, সুরিয়ানি, ফারসি ও অনারব ভাষায় বিভিন্ন ওষুধের নাম, মাপ ও ওজনের ব্যাখ্যা, ওষুধের দাম ও মেয়াদকাল। চিকিৎসাগ্রন্থে প্রচলিত নামের ব্যাখ্যা ছিল সেখানে। গ্রন্থটির লেখক আবুল কাসেম জাহরাবি।[৩৭৬]

ফিজিয়োলজিস্ট হালার বলেন, চতুর্দশ শতাব্দীর পর যেসব শল্যচিকিৎসক আত্মপ্রকাশ করেছেন তারা সকলে আবুল কাসেম জাহরাবি রচিত এসব অনন্যসাধারণ উৎসগ্রন্থগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন।[৩৭৭]

আবুল কাসেম জাহরাবির আবিষ্কার ও অবদান

আবুল কাসেম জাহরাবি সার্জারিবিদ্যায় অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। তিনিই প্রথম শল্যচিকিৎসা এবং অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। শল্যচিকিৎসাকে তিনিই প্রথম স্বতন্ত্র এবং বিশ্লেষণনির্ভর শাস্ত্র হিসাবে উপস্থাপন করেন। শল্যচিকিৎসার নতুন নতুন ধারা উদ্ভাবন এবং বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি তৈরির কৃতিত্ব তারই।[৩৭৮]

গুস্তাভ লি বোঁ জাহরাবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত আরব শল্যচিকিৎসক। বিশেষভাবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন মূত্রাশয়ের পাথর ভেঙে বের করার প্রক্রিয়া। অথচ অন্যায়ভাবে তার এ আবিষ্কারকে আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে দাবি করা হয়।[৩৭৯]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এসেছে, আরব মুসলিমদের মধ্যে যারা অস্ত্রোপচার নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রসিদ্ধতম

---

৩৭৫. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২২১
৩৭৬. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ২/৩১০
৩৭৭. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাযারাতুল আরব*, পৃ. ৪৯০
৩৭৮. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৬৫
৩৭৯. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাযারাতুল আরব*, পৃ. ৪৯০-৪৯২

হলেন আবুল কাসেম জাহরাবি। তিনিই প্রথম রক্তপাত রোধে ধমনি সংযোগপদ্ধতির প্রয়োগ করেন।[৩৮০]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত তথ্যমতে আবুল কাসেম জাহরাবির অন্যতম উদ্ভাবন হলো ক্যাথেটার[৩৮১]। তিনিই প্রথম ক্যাথেটারাইজেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

তিনিই প্রথম শ্বাসনালিতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন করেছিলেন। তার আগে ইবনে সিনা ও আবু বকর রাযির মতো চিকিৎসকগণও বিপদের আশঙ্কায় এ থেকে বিরত ছিলেন।

নবজাতকের মূত্রনালির বাইরের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিবন্ধকতা দূর করে সহজে প্রস্রাব চালু করার জন্য জাহরাবি খুব সূক্ষ্ম একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বক্ষগহ্বর-সহ অন্যান্য সমস্ত গভীর ক্ষত থেকেও দূষিত রক্ত অপসারণ করতে সক্ষম হন। বড় ধমনি বেঁধে নেওয়ার মাধ্যমে তিনিই প্রথম সার্জারি চলাকালীন রক্তপাত বন্ধ করতে সফল হন। এ ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা চিকিৎসকদের আবিষ্কারের ৬০০ বছর আগেই সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তার পরে ১৫৫২ খ্রিষ্টীয় সালে ফরাসি সার্জন অ্যাম্বরোয়া যিবেরা (১৫১০-১৫৯০ খ্রি.) নিজেই এর উদ্ভাবনের দাবি করে বসেছিলেন।

আবুল কাসেম জাহরাবিই প্রথম সার্জারির সুতা আবিষ্কার করেছিলেন। অন্ত্রের শল্যচিকিৎসায় তিনি এটি ব্যবহার করেছিলেন। এই সুতা তিনি তৈরি করেছিলেন বিড়ালের ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে। তিনিই প্রথম দুই সুচ ও একটি সুতার মাধ্যমে ত্বকের অভ্যন্তরীণ অংশে স্থায়ীভাবে সেলাইয়ের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে অস্ত্রোপচারের কোনো চিহ্ন শরীরে অবশিষ্ট থাকে না। তিনি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন *ইলমামুল জুরুহ তাহতাল আদামা* (ত্বকের অভ্যন্তরীণ অংশে ক্ষত মিলিয়ে যাওয়া)।

রোগীর শরীরের নিম্নাংশের যেকোনো অপারেশনের সময় প্রথমেই রোগীর শ্রেণিদেশ ও দুপা ওপরে উঠিয়ে রাখার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তার এ

---

৩৮০. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ২/৩১০

৩৮১. ক্যাথেটার : চিকিৎসায় ব্যবহৃত একপ্রকার সরু পাইপ যা চিকিৎসাকার্যে ব্যবহারযোগ্য উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়। রোগের চিকিৎসা বা শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনে শরীরে ক্যাথেটার প্রবেশের প্রয়োজন পড়ে।

আবিষ্কার ছিল জার্মান শল্যচিকিৎসক ফ্রেডরিক ট্রিডলেনোবার্গের আগমনের প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে। শাওকি আবু খলিল বড় শক্ত কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এটা হলো জার্মান সার্জন ফ্রেডরিক ট্রিডলেনোবার্গের পক্ষ হতে জাহরাবির সভ্যতাগত অধিকার হরণ।[৩৮২]

বিশ্বের মুদ্রণ পরিকল্পনার প্রথম পথপ্রদর্শক বা পথিকৃৎও মূলত জাহরাবি। মুদ্রণশিল্পের কথিত জনক জার্মান নাগরিক জোহানেস গুটেনবার্গের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই জাহরাবি মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে তার ধারণা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এটা তার *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ* গ্রন্থের ২৮তম নিবন্ধে রয়েছে। উক্ত নিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, চিকিৎসা ও ফার্মাকোলজির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাহরাবি বর্ণনা করেছেন এমন ট্যাবলেট তৈরি করার ফর্মুলা, যাতে ওষুধের নামও অঙ্কিত থাকবে। এটি তৈরি করা হবে আবলুস কাঠ বা হাতির দাঁতের তৈরি পাত ব্যবহার করে। পাতটি দৈর্ঘ্যে আধাআধি বিভক্ত থাকবে। ট্যাবলেটের অর্ধেকের পুরুত্ব অনুপাতে বোর্ডের দুপাশেই খোদাই করা হবে। পাতটির যেকোনো এক পাশে উদ্দিষ্ট ট্যাবলেটটির নাম উলটো করে অঙ্কিত থাকবে। এরপর ছাঁচে ওষুধ তৈরির কাঁচামাল ঢেলে যখন ট্যাবলেট তৈরি করা হবে, তখন তাতে ট্যাবলেটের নামও অঙ্কিত হয়ে যাবে। তিনি এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ওষুধশিল্পে নকল ও প্রতারণা রোধ করতে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রস্তুত শিল্পকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে।

শাওকি আবু খলিল এ সম্পর্কে লিখেছেন, নিঃসন্দেহে এই মতামতের মাধ্যমে আবুল কাসেম জাহরাবি মুদ্রণশিল্প ও ট্যাবলেট ওষুধশিল্পের প্রবর্তক হওয়ার সভ্যতাগত অধিকার রাখেন। আধুনিক বিশ্বের কোনো আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানিই এ দুটি শিল্পের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু জাহরাবির এই আবিষ্কার-অধিকারকে চুরি করে অন্যদের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা অনেকেরই অজানা।[৩৮৩]

এ ছাড়াও জাহরাবিই প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী, যিনি শরীরের মূল শিরা ও পায়ের নলার ধমনি-স্ফীতির চিকিৎসার জন্য পায়ের নলা থেকে রগ

---

৩৮২. *উলামাউল আন্দালুস ইবদাআতুহুমুল মুতামাইয়িযাহ ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৩৫; *তারিখুত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া*, ১৬২

৩৮৩. *উলামাউল আন্দালুস ইবদাআতুহুমুল মুতামাইয়িযাহ ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৩২-৩৩

অপসারণের ধারণা দেন। তিনি সফলভাবে এ অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেন। বর্তমানে আমরা যে প্রক্রিয়াটি অনুশীলন করছি তার সাথে এটি বেশ মিলে যায়, যা মাত্র ৩০ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য এতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।[৩৮৪]

দন্তচিকিৎসা ও চোয়াল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও জাহরাবির বেশ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন রয়েছে। কোমলতার সাথে কীভাবে দাঁত তুলতে হয়, দাঁত তোলার সময় চোয়াল ভাঙার কারণ, দাঁতের শেকড় তুলে আনার পদ্ধতি, দাঁত পরিষ্কারের পদ্ধতি, চোয়াল ফাটলের চিকিৎসা, স্বস্থানে দাঁত না গজানো ইত্যাদি নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ই রচনা করেছেন। দন্তচিকিৎসায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

তিনি দাঁত ওঠানোর ব্যাপারে লিখেছেন, মাড়িদাঁতে ব্যথা হলে যথাসম্ভব দ্রুত চিকিৎসা করে ফেলা উচিত। দাঁত উঠিয়ে ফেলতে কোনো শঙ্কা না থাকলেও দাঁত ওঠাতে তাড়াহুড়া করা উচিত না। তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আরও বলেন, কখনো কখনো দাঁতে ব্যথা ওঠে, কিন্তু রোগী অসুস্থ দাঁত নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। ফলে ডাক্তার রোগীর কথা শুনে ভালো দাঁত তুলে ফেলে। পরে দেখা যায়, ব্যথা নিরাময় হয়নি। ব্যথা নিরাময়ের জন্য আবার অসুস্থ দাঁত তুলতে হয়। তাই এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এমনইভাবে জাহরাবি সংক্রমিত ব্যথা এবং এর বিপদের গুরুতা তুলে ধরেছেন। সম্ভবত চিকিৎসা-ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তিনি এভাবে মানুষকে সতর্ক করেছেন। যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন।[৩৮৫]

ক্যান্সারের চিকিৎসা নিয়েও জাহরাবি গবেষণা করেছিলেন। তিনি এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রতিষেধনব্যবস্থা বাতলে দিয়েছেন। বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এমনকি বর্তমানেও ক্যান্সার চিকিৎসায় জাহরাবির বাতলানো পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও শল্যচিকিৎসার পথপ্রদর্শক জাহরাবি ক্যান্সার চিকিৎসার

৩৮৪. *আল-মুজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতু ইনদাল আরব*, পৃ. ১৪২, ১৪৩

৩৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

যে ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে খুব বেশি নতুন তত্ত্ব সংযোজন করতে পারেননি।[৩৮৬]

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগবিদ্যা সম্পর্কে জাহরাবি যা লিখে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে আজও চিকিৎসাবিজ্ঞানে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। তিনি ট্রেন্ডেলেনবার্গ ও ওয়ালচের নামক দুধরনের জটিল প্রসব-ব্যবস্থাপনাপদ্ধতি বর্ণনা করে গিয়েছেন। এ ছাড়া বলেছেন যুক্ত প্ল্যাসেন্টার বহিষ্কার-পদ্ধতি, অ্যাক্টোপিক গর্ভাবস্থা ও গর্ভপাতের চিকিৎসার পদ্ধতি। গর্ভস্থ মৃত সন্তানকে বের করার জন্য তিনি একটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। অর্থাৎ এই আবিষ্কারের দাবিদার ডাক্তার প্যালসারের প্রায় ৯০০ বছর পূর্বেই তিনি এ সংক্রান্ত চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম অ্যাক্টোপিক গর্ভধারণ নিয়ে বর্ণনা করেছেন।[৩৮৭] তিনিই প্রথম জরায়ুমুখ (Cervix) প্রশস্ত করার জন্য বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন স্ত্রীরোগ পরীক্ষার বিশেষ যন্ত্র। যা বর্তমান যুগেও ব্যবহৃত হয়।[৩৮৮]

ইতিহাস আমাদের সামনে যতটুকু তুলে ধরে, তা থেকে আমরা আবুল কাসেম জাহরাবির এইসব আবিষ্কার ও অবদান দেখতে পাই।

সমাপ্তিতে আমরা শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের উদ্দেশে আবুল কাসেম জাহরাবির কিছু উপদেশ শুনতে চাই । তিনি সার্জারির কাজ শুরু করার পূর্বে সার্জারির ছোট-বড় সকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার কথা বলেছেন। যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও শারীরবৃত্ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত তিনি সার্জারির কাজ করতে নিষেধ করেছেন। *আত-তাসরিফ লিমান আজাযা আনিত তালিফ* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, জেনে রাখো, সার্জারির কাজ দুই ভাগে বিভক্ত, **এক.** যেসব অস্ত্রোপচারে সুরক্ষার সম্ভাবনা বেশি **দুই.** যেসব অস্ত্রোপচারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বেশি।

---

৩৮৬. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৬৪

৩৮৭. **অ্যাক্টোপিক গর্ভাবস্থা :** জরায়ুর বাইরে যেকোনো স্থানে গর্ভধারণ হলে তাকে অ্যাক্টোপিক গর্ভধারণ বলে।

৩৮৮. আল-আমরাদুন নিসাইয়্যা ফিত তিব্বিল আরাবিয়্যিল কাদিম, *আল-মিহানুত তিব্বিয়্যা* ম্যাগাজিন, বর্ষ ১৯৬৪ খ্রি.; *আত-তিব্বু ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ১৬৩ ও পরবর্তী আলোচনা।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে আমি স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছি। তোমাদের উচিত, এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা। যেন অজ্ঞ লোকেরা তোমাদের চিকিৎসাকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে না পারে।

সুতরাং নিজেদের জন্য অবলম্বন করো সতর্কতা, সাবধানতা ও দৃঢ়তা। তোমরা তোমাদের রোগীদের প্রতি দয়া করো। তাদের সচেতন করো। সুস্থতা আর শুভ পরিণতি বয়ে আনে এমন শ্রেষ্ঠ পন্থাই অবলম্বন করো।

যেসব বিপজ্জনক ও জটিল অস্ত্রোপচারে তোমরা অভিজ্ঞ নও, সেসব থেকে বিরত থাকো। দ্বীন ও দুনিয়ায় মর্যাদাহানির যে শঙ্কা করছ তা থেকে অন্তরকে নির্মল করে নাও। ইনশাআল্লাহ এতে তোমাদের সম্মান ও খ্যাতি বজায় থাকবে এবং দুনিয়া-আখেরাতে তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।[৩৮৯]

(৫)

ইবনে বাইতার : বিরল প্রতিভার অধিকারী

মুসলিম সভ্যতার মনীষীদের বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। সবার আগে আসবে তাদের বিস্তৃত জ্ঞানের কথা। একেকজন ছিলেন একেকটি বিশ্বকোষ। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় তারা অনবদ্য অবদান রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন মনীষী খুব কমই দেখা যায়, যারা কেবল নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। বরং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের লেখালেখি ও সংকলন রয়েছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি কেউ কেউ নির্দিষ্ট একটি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন। মানুষের জ্ঞান ও রুচির ভিন্নতায় জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছু শাখায় তাদের ছিল বিশেষজ্ঞতা আর অন্য শাস্ত্রগুলোয় ছিল সম্যক জ্ঞান।

যেসব মনীষী উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজিতে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন ইবনে বাইতার। তিনি উদ্ভিদ ও ফার্মেসিবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত। উদ্ভিদবিজ্ঞানে তিনি গবেষণার নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। ইবনে আবি উসাইবিয়া তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখেন, ইবনে বাইতার উদ্ভিদবিজ্ঞানের অতুলনীয়

৩৮৯. রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা, পৃ. ২৬৭

একজন মহান পণ্ডিত। উদ্ভিদবিজ্ঞানের গবেষণা, উদ্ভিদের যাচাইকরণ, নির্বাচন, প্রাপ্তিস্থান, সেগুলোর বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্য, নাম ও গুণ সম্পর্কে তার ছিল ঈর্ষণীয় যোগ্যতা।[৩৯০]

ইবনে বাইতারের পরিচয়

ইবনে বাইতারের পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ মালেকি। তিনি মালেকি মাজহাবের ছিলেন না। বরং তার গ্রামের নাম ছিল মালেকা, যা মূলত আন্দালুসের অন্তর্ভুক্ত। জন্মস্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে মালেকি বলা হয়। ইবনে বাইতার জন্মগ্রহণ করেন হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে। তার পিতা ছিলেন একজন দক্ষ পশুচিকিৎসক। পশুচিকিৎসককে আরবিতে বাইতার বলা হয়। সেখান থেকেই তার উপনাম হয়ে গেছে 'ইবনে বাইতার' অর্থাৎ পশুচিকিৎসকের পুত্র।

ইবনে বাইতার শৈশবে গ্রামের পাশে বিভিন্ন বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। ঘুরে ঘুরেই কাটাতেন সারা বেলা। সেখান থেকেই অল্প বয়সে তার মনের ভেতরে স্থান করে নেয় প্রকৃতিপ্রেম। প্রকৃতির প্রেম থেকেই ধীরে ধীরে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও গাছপালার পর্যবেক্ষণে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তার আগ্রহ উন্নীত হয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের দিকে। সুতরাং বলা যায়, এই বনজঙ্গল ছিল তার উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রথম বিদ্যানিকেতন।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের পাঠ তিনি শুরু করেন সেভিলের পণ্ডিত আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ফারাজ নাবাতির নিকট। উদ্ভিদবিজ্ঞানে তার খ্যাতি আর দক্ষতা ছিল আকাশচুম্বী। কিন্তু ইবনে বাইতার তার শিক্ষককে ছাড়িয়ে যান। বরং তিনি সমকালীন অন্যান্য ভেষজবিদের তুলনায় বৈজ্ঞানিক, পরীক্ষামূলক এবং প্রায়োগিক গবেষণায় অধিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।[৩৯১]

ইবনে বাইতারের চরিত্র ও নৈতিকতা

ইবনে বাইতারের একদিকে যেমন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা অপরদিকে তার সাথে মিশে ছিল বিস্ময়কর নৈতিক গুণ, যা অন্যদের মাঝে খুব কমই

---

৩৯০. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, পৃ. ৩/৫০০

৩৯১. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, পৃ. ৩/৫০০

দেখা যায়। যারা তার সাথে মিশেছেন এবং চলাফেরা করেছেন সকলেই এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ইবনে আবি উসাইবিয়া লিখেছেন, আমি তার মাঝে দেখেছি নিখাদ বন্ধুত্ব, পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, উদারতা, মানবিকতা, বংশীয় আভিজাত্য, গভীর জ্ঞানগরিমার পাশাপাশি নৈতিক ও আদর্শিক চেতনা, যা সত্যিই বর্ণনাতীত ও বিস্ময়কর।[৩৯২]

জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ইবনে বাইতারের সফর

ইবনে বাইতারের মাঝে ছিল জ্ঞানের প্রতি প্রবল তৃষ্ণা ও আগ্রহ। তিনি ২০ বছর বয়সে বিভিন্ন দেশে সফরে বেরিয়ে পড়েন। পথের কষ্ট উপেক্ষা করে তিনি ছুটে যান গ্রিস, রোম, মরক্কো, মারাকেশ, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ায়। সেখান থেকে সফর করেন এশিয়া মাইনর, আনতাকিয়া, সিরিয়া, হিজায, গাজা, জেরুসালেম, বৈরুত ও মিশরে।

এসব দেশে গিয়ে জ্ঞানী-গুণীদের সাহচর্য লাভ করেন। তাদের সঙ্গে উদ্ভিদের প্রকার, বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করার সুযোগ হয়। পুথিগত বিদ্যায় তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি বনেজঙ্গলে গিয়ে ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতেন। এমনকি উদ্ভিদ উৎপাদনস্থলও তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন গভীরভাবে। এ সম্পর্কে ইবনে আবি উসাইবিয়া বলেন, দামেশকের বাইরে তার সঙ্গে বনেজঙ্গলে প্রচুর গাছপালা দেখেছি।[৩৯৩]

ইবনে বাইতার সুলতান আল-কামিলের শাসনকালে মিশরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সুলতান তাকে নিযুক্ত করেন প্রধান ভেষজবিজ্ঞানী হিসাবে। তিনি ছিলেন উদ্ভিদ ও ভেষজ ওষুধের ক্ষেত্রে সুলতানের আস্থাভাজন। সুলতান আল-কামিলের ইন্তেকালের পর তিনি সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুবের অধীনে কাজ শুরু করেন। তার দরবারেও তিনি বেশ সমাদৃত ছিলেন।[৩৯৪]

---

৩৯২. প্রাগুক্ত

৩৯৩. প্রাগুক্ত, ৩/৫০০

৩৯৪. প্রাগুক্ত, ৩/৫০১

ইবনে বাইতারের গবেষণা ও লেখালেখি

ইবনে বাইতার শূন্য থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানের পথচলা শুরু করেননি। তার যাত্রা শুরু হয়েছিল পূর্ববর্তী উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ফার্মাকোলজিস্টদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে। ইবনে বাইতার গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাদের বইপত্র। অবিরাম গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছেন তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ মতামত। ইবনে বাইতারের ভ্রমণসঙ্গী ইবনে আবি উসাইবিয়া বলেন, আমি তার কাছে ডায়োসকোরাইডসের *মেটেরিয়া মেডিকা* গ্রন্থের ব্যাখ্যা পড়েছি। তার বিস্তৃত জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণক্ষমতা ও অনুধাবনশক্তি আমাকে মুগ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। গ্যালেন, গাফিকি ও ডায়োসকোরাইডস-সহ এই শাস্ত্রের দিকপালদের গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে আমি তার কাছে উপস্থিত হতাম।[৩৯৫]

ইবনে আবি উসাইবিয়ার লেখালেখির মধ্য দিয়ে আমরা ইবনে বাইতারের জ্ঞানবৈচিত্র্য ও জ্ঞানবৈদগ্ধের পরিচয় পাই। গ্রিক ও অনারব প্রাচীন জ্ঞানভান্ডারের সকল অনূদিত বই ছিল ইবনে বাইতারের নখদর্পণে। এ ক্ষেত্রে তার সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আরবির পাশাপাশি ফারসি ও গ্রিক ভাষার জ্ঞান।

ইবনে বাইতার এখানেই থেমে থাকেননি। মুসলিম গবেষকগণ এ বিষয়ে যেসব রচনা রেখে গিয়েছিলেন, সেসবও তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ইবনে সিনা, আল-ইদরিসি, ইবনুল আব্বাস নাবাতি প্রমুখের গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করে উপকৃত হয়েছেন এবং সেসবের গূঢ় বিষয়গুলোর মর্ম তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যদিও পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলি থেকে উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু সেগুলো যেন ছিল তার শুদ্ধি অভিযানের ক্ষেত্র। সিংহভাগ সময়ে সেগুলোর সংশোধন-সংযোজন ও সমালোচনা করেছেন।

রম ল্যান্ডো তার লেখা *ইসহামু উলামাইল আরব ফিল হাযারাতিল উরুব্বিয়া*[৩৯৬] গ্রন্থে বলেন, উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইবনে বাইতারের অবদান ডায়োসকোরাইডস-সহ পূর্ববর্তীদের সকল অবদান ছাড়িয়ে গেছে। তার একচ্ছত্র প্রভাব দশম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

---

৩৯৫. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, পৃ. ৩/৫০১

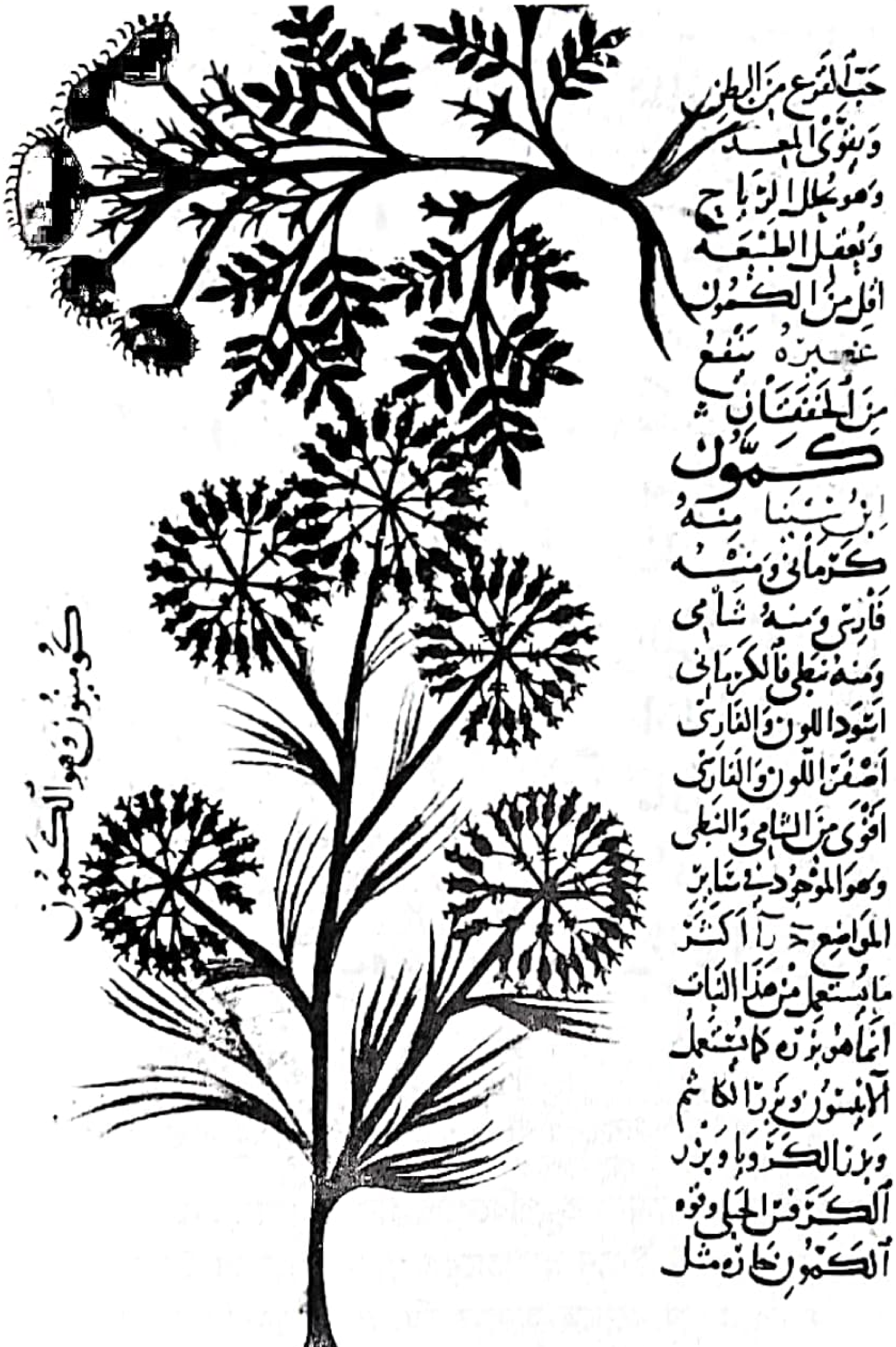
৩৯৬. ইউরোপের সভ্যতা বিনির্মাণে আরব বিজ্ঞানীদের অবদান।

তেমনইভাবে অ্যালডো মেলি *আল-ইলম ইনদাল আরব ওয়া আসারুহু ফি তাতাওউরিল ইলমিল আলামি*[৩৯৭] গ্রন্থে লেখেন, ইবনে বাইতার মুসলিম সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ফার্মাসিস্ট হিসাবে বিখ্যাত। তবে তার লেখালেখির বেশিরভাগই পূর্ববর্তীদের লেখালেখির ওপর নির্ভরশীল। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি সামগ্রিক বিচারে সমকালে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন।

ইবনে বাইতারের গ্রন্থাবলি নিয়ে কথা বলার পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে ফার্মাকোলজির সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্পৃক্তির ওপর নজর বুলানো আবশ্যক। কারণ মানুষ তার সমকালীন যুগ দ্বারা প্রভাবিত থাকে। তাই স্ব-যুগের উদ্ভাবন ও অগ্রগামিতার প্রভাব ইবনে বাইতারের ওপর পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে উদ্ভাবিত হয়েছে ইবনুন নাফিসের রক্তসঞ্চালনতত্ত্ব-সহ নতুন কিছু তত্ত্বের। এই সময়েই ফার্মাকোলজি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চিকিৎসকগণ প্রয়োজনীয় ওষুধ নিজেরাই তৈরি করতেন, যেমনটা আমরা দেখতে পাই ইবনে সিনার *আল-কানুন* গ্রন্থে। এই গ্রন্থের একটা অধ্যায়ে তিনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেক ওষুধের নাম তুলে ধরেন।

---

৩৯৭. আরবদের জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিশ্বসভ্যতার জ্ঞান বিকাশে তার প্রভাব।



চিত্র নং-১১

মুসলিম চিকিৎসকদের ব্যবহৃত ভেষজগুণবিশিষ্ট গাছগাছড়া



চিত্র নং-১২

মুসলিম চিকিৎসকদের ব্যবহৃত ভেষজগুণবিশিষ্ট গাছগাছড়া

এমন এক বিস্ময়কর জ্ঞানগত পরিবেশে প্রকাশ পেয়েছিল উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজি সম্পর্কে ইবনে বাইতারের গ্রন্থাবলি। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকায় সবার আগে রয়েছে *আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদভিয়া ওয়াল আগযিয়া*[৩৯৮]। এটি তিনি রচনা করেছিলেন বিস্তৃত ব্যবহারিক অধ্যয়ন, গাছপালার পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ব্যক্তিগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা সত্য মনে হয়েছে এবং প্রচলিত কথায় কান না দিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আমার কাছে যা প্রমাণিত হয়েছে, আমি কেবল তা-

৩৯৮. ওষুধপত্রের শব্দকোষ।

ই গ্রহণ করেছি। আর যে ওষুধের কার্যকারিতা, প্রকৃতি মান, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের পরিপন্থি ছিল তা ছুড়ে ফেলেছি। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যতীত আমি ওষুধ তৈরি করিনি।[৩৯৯]

ইবনে বাইতার কেন *আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদভিয়া ওয়াল আগযিয়াহ* রচনা করেছেন, তা তিনি গ্রন্থের সূচনাতেই তুলে ধরেছেন। তার গবেষণার রূপরেখা, পূর্ববর্তীদের থেকে জ্ঞান গ্রহণের ক্ষেত্রে সততা, বিধিবিধানের সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের অনুরূপ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরতা তার গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে। তিনি লেখেন—এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মৌলিক ওষুধ ও খাবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান, যেন দিনে কিংবা রাতে যখনই প্রয়োজন পড়ে যে-কেউ দেখে নিতে পারে। সাথে সাথে মানুষের জন্য উপকারী আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ও এখানে আলোচিত হয়েছে। ডায়োসকোরাইডসের পাঁচ প্রবন্ধ ও জ্ঞানতাপস গ্যালেনের ছয় প্রবন্ধে উল্লেখিত সকল ওষুধের নাম আমি হুবহু উল্লেখ করেছি। তাদের বক্তব্য ও মতামতের পাশাপাশি যুক্ত করেছি উদ্ভিদ, খনিজ ও প্রাণিজ ওষুধ সম্পর্কে পরবর্তী ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বক্তব্য। যাদের বক্তব্য আমি নকল করেছি, তাদের কথা সততার সাথে উল্লেখ করে দিয়েছি। বর্ণনাকারীর নাম-সহ বর্ণনাপদ্ধতি উল্লেখ করেছি। এখানে আমি সেসব কথাই উল্লেখ করেছি যে বিষয়ে আমার বিশেষজ্ঞতা আছে, যা আমার কাছে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। পর্যবেক্ষণের বিপরীতে এখানে কিছু উল্লেখ করিনি।[৪০০]

ইবনে বাইতারের গ্রন্থের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ওষুধের নাম বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে দিয়েছেন। সেগুলোর আঞ্চলিক নামগুলোও উল্লেখ করে দিয়েছেন। জর্জ সার্টন এই গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, ইবনে বাইতার এই গ্রন্থখানি বর্ণানুক্রমিক সাজিয়েছেন। ফলে এখান থেকে উপকৃত হওয়া সহজ। অন্যান্য ভাষায় একই ওষুধের বিভিন্ন নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন। ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের আগ পর্যন্ত এই গ্রন্থই ছিল ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ভরসাস্থল।[৪০১]

---

[৩৯৯]. *আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদভিয়া ওয়াল আগযিয়া*, ১/১
[৪০০]. *আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদভিয়া ওয়াল আগযিয়া*, ১/১
[৪০১]. http://www.nooran.org

যেসব জায়গায় ওষুধি গাছ উৎপন্ন হয় সেসব স্থানের নাম বলে দিয়েছেন ইবনে বাইতার। লিপিবদ্ধ করেছেন ওষুধের উপকারিতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। তিনি গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ করিয়েছেন দক্ষ লিপিকার দিয়ে। ওষুধের নামগুলোও তিনি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ-সহ লেখাতেন, যেন পাঠক কিংবা লিপিকার উচ্চারণবিভ্রাটে না পড়ে। ওষুধের গুরুত্ব ও জনজীবনে ভুল ওষুধের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতেই তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

ভেষজগাছের উৎপাদন, সংরক্ষণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সেগুলোর পুষ্টিগুণ ও কার্যকারিতা নিয়েও ইবনে বাইতার বিস্তর লিখেছেন।

ইবনে বাইতারের গ্রন্থে অনেক ওষুধের বিস্তর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভেষজ, প্রাণিজ ও খনিজ পদার্থের ১৪০০টি ওষুধের নাম আমরা তার গ্রন্থে দেখতে পাই। তন্মধ্যে ৩০০টি তার নিজস্ব আবিষ্কার। এ ক্ষেত্রে তিনি ১৫০-এর অধিক গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছেন। এগুলোর মধ্যে ২০টি গ্রিক ভাষায় রচিত। এসব ওষুধের বৈশিষ্ট্য, চিকিৎসাগত ব্যবহারবিধি তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

তার লেখা *আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদভিয়া ওয়াল আগযিয়াহ* গ্রন্থটি অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কয়েকটি সংস্করণে এটি মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আরবি ভাষায় মিশরে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে বৈরুতের দারু সাদের প্রকাশনী দুখণ্ডে এটি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বড় বড় লাইব্রেরি এবং জাদুঘরে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো কিছুদিন আগ পর্যন্তও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এই গ্রন্থ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইবনে বাইতারের আরেকটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হলো *আল-মুগনি ফিল আদভিয়াতিল মুফরাদা*। গ্রন্থটি ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এখানে উল্লেখিত ওষুধ থেকে কোনো চিকিৎসকই নির্মুখাপেক্ষী না। গ্রন্থটিতে শরীরের অঙ্গভিত্তিক রোগ ও ওষুধের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একইসাথে গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত এবং চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

নিখাদ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার পূর্ণ অঙ্গীকারের সাথে পর্যালোচনা-প্রবণতা ইবনে বাইতারের অন্যতম রচনাশৈলী। তার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও ভেষজবিদদের সমালোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাদের মতামতের সমালোচনা করেছেন। তবে

তার সমালোচনা ছিল গঠনমূলক। যেসব চিন্তাধারা বিজ্ঞজনদের অনুসৃত সঠিক পন্থার বিপরীত হতো, সেগুলো তিনি বর্জন করতেন। কখনো আবার নিজের জ্ঞানের মানদণ্ডের বিপরীত হলেও সেগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কেবল ভুল চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হতেন না, বরং সত্যের অপলাপের জন্য এর প্রবক্তা কিংবা বর্ণনাকারীকে কঠোর ভাষায় নিন্দাও জানাতেন।

তার সমালোচনামূলক মনোভাবের বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তার রচিত *আল-ইবানা ওয়াল ইলাম বিমা ফিল মিনহাজ মিনাল খালালি ওয়াল আওহাম* গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন ইবনে জাযলার (মৃ. ৪৯৩ হি.) রচিত *মিনহাজুল বায়ান ফি মা ইয়াসতামিলুহুল ইনসান* গ্রন্থের সমালোচনায়। এখানে তিনি ওষুধ, খাদ্য এবং পানীয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইবনে জাযলার রচিত গ্রন্থের ভুলভ্রান্তি বিশেষত ওষুধের নামে তিনি যে ভুল করেছেন সেগুলো চিহ্নিত করেই উপর্যুক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইবনে বাইতার। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেন, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের ইচ্ছা ও পরামর্শের ফলে ওষুধি গাছপালা ও মেডিসিন নিয়ে লেখা কিছু গ্রন্থ ঘেঁটে দেখার ইচ্ছা হলো। সেখানে প্রদত্ত ওষুধের যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধান করব, কোনো তথ্য বা নামগত ভুল থাকলে টুকে নেব এবং ওষুধের কার্যকারিতা ও উপকার সম্পর্কে মানুষকে জানাব, এই বোধ থেকেই মূলত এ গ্রন্থটি রচনা করি। সেসব গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যের ভুল প্রমাণের ক্ষেত্রে আমি নির্ভর করেছি পরীক্ষানিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর।[৪০২]

ইবনে বাইতারের আরও কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যেমন ডায়োসকোরাইডসের রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখিত ওষুধসমূহের ব্যাখ্যা। এখানে তিনি প্রাণিজ ও ভেষজ ওষুধসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটি আরবি, সুরিয়ানি, গ্রিক ও বার্বার ভাষার অমূল্য এক জ্ঞানকোষ। *আল-আফআলুল গারিবাহ ওয়াল খাওয়াসসুল আজিবাহ* (আশ্চর্যজনক ক্রিয়া ও অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য) নামেও তার একটি গ্রন্থ আছে।

৪০২. *আল-ইবানা ওয়াল ইলাম বিমা ফিল মিনহাজ মিনাল খালালি ওয়াল আওহাম*, পৃ. ২

ইবনে বাইতার সম্পর্কে পশ্চিমা বিজ্ঞজনদের সাক্ষ্য

পাশ্চাত্যের অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ইবনে বাইতারের জ্ঞানগত যোগ্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে বলেন, ইবনে বাইতার উদ্ভিদবিজ্ঞানে আরবদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। তার রচিত *আল-জামি* গ্রন্থটি এ বিষয়ে অনন্য একটি বই। জ্ঞানের জীবন্ত আকর থেকে বইটি উৎসারিত। পূর্ববর্তী প্রায় দেড়শ গ্রন্থের সারনির্যাস এখানে তুলে ধরেছেন ইবনে বাইতার। ওষুধি গাছের খোঁজে চষে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত। নিজের চোখে দেখে, পর্যবেক্ষণ করে তিনি পূর্ববর্তীদের দেওয়া তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। এজন্যই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই গ্রন্থে উল্লেখিত ১৪০০টি ওষুধের মধ্যে ৩০০টি অভিনব ওষুধ উদ্ভাবনের। তিনি ওষুধের নাম উল্লেখ করেছেন, ব্যবহারপদ্ধতি বলেছেন এবং ওষুধের বিকল্পও বলে দিয়েছেন। এই অসামান্য অবদান থেকে আমরা তার প্রতিভার ধারণা লাভ করতে পারি।[৪০৩]

প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মেয়েরহোফ ইবনে বাইতার সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয় ইবনে বাইতার একজন আরবীয় শ্রেষ্ঠ লেখক। ভেষজ উদ্ভিদবিজ্ঞানে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।[৪০৪] জর্জ সার্টন তার বিযুক্ত ওষুধ সম্পর্কে লেখা *আল-জামি ফিল আদভিয়াতিল মুফরাদা* গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, এটি নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে লেখা মধ্যযুগের অন্যতম গ্রন্থ। বরং বলা যায়, ডায়োসকোরাইডসের পরে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এটিই ছিল এ বিষয়ের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ।[৪০৫]

ইবনে বাইতারের ইন্তেকাল

ইবনে বাইতার ৬৪৬ হিজরি মোতাবেক ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার কর্ম ও অবদান এখনো আমাদের মাঝে বিদ্যমান, যা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরল প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

---

৪০৩. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩২২-৩২৩

৪০৪. http://www.bab.com/full_article.cfm?id=7173

৪০৫. প্রাগুক্ত

(৬)

ইবনে আবি উসাইবিয়া : ইতিহাসবিদ ও চিকিৎসক

আমরা এখন এমন একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি যিনি নিজে একজন চিকিৎসক, একইসাথে একজন প্রতিভাবান ইতিহাসবেত্তা। ইসলাম-পূর্ব যুগের চিকিৎসক ও চিকিৎসাব্যবস্থা এবং ইসলামি সভ্যতার চিকিৎসক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ইবনে আবি উসাইবিয়ার পূর্ণ নাম মুওয়াফফাকুদ্দিন আহমাদ ইবনে কাসেম ইবনে খলিফা হাকিম খাজরাজি। উপনাম আবুল আব্বাস। উপাধি ইবনে আবি উসাইবিয়া। তিনি ৫৯৬ হিজরিতে (১২০০ খ্রি.) দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৬৮ হিজরিতে (১২৭০ খ্রি.) হাওরান পর্বতমালার অন্যতম শহর সারখাদে ইন্তেকাল করেন।[৪০৬]

ইবনে আবি উসাইবিয়ার শিক্ষাদীক্ষার পেছনে পারিবারিক প্রভাব লক্ষণীয়। তার পরিবার জ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চায় প্রসিদ্ধ ছিল। শাম ও মিশরের গভর্নরদের সাথে তাদের ছিল সুসম্পর্ক। ফলে তার জন্য জ্ঞানার্জনের পথ অনেকটায় সুগম ছিল। তিনি দামেশক ও কায়রোয় সমকালীন খ্যাতিমান আলেমদের কাছে সাহিত্য, দর্শন-সহ জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পিতার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রের হাতেখড়ি হয়। তার পিতা ছিলেন দামেশকের চক্ষুচিকিৎসক। আর চাচা ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন চিকিৎসক।

ইবনে আবি উসাইবিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইবনে দাখওয়ারের (৬২৮ হি./১২৩০ খ্রি.) নিকটেও শিক্ষা অর্জন করেন। উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজির জ্ঞান অর্জন করেন ইবনে বাইতারের নিকট। কায়রোর নাসেরি হাসপাতালে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। সেখানে তিনি দেখা পান চিকিৎসাশাস্ত্রের পথিকৃৎ আলাউদ্দিন আবুল হাসান ইবনুন নাফিসের (মৃত্যু ৬৮৭ হি.)।

---

৪০৬. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ১/১৯৭; *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ২/৪৭; *মুজামুল মাতবুআতিল আরাবিয়া*, ১/২৭

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের প্রশাসনে যোগদানের মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবনের সূচনা হয়। তার কর্মের সুখ্যাতি দামেশকের সারখাদে[৪০৭] পৌঁছে যায়। সারখাদের শাসক তাকে আমন্ত্রণ জানান। শাসকের অনুরোধে তিনি সারখাদে চলে যান। আমৃত্যু তিনি সেখানেই থাকেন।[৪০৮]

ইবনে আবি উসাইবিয়া ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চিকিৎসক এবং ঐতিহাসিক। চিকিৎসা পেশা ও লেখালেখির মধ্যে সমন্বয় করেছেন তিনি। রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*। অসামান্য এই গ্রন্থ ইবনে আবি উসাইবিয়াকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

ইবনে আবি উসাইবিয়া বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে একজন চিকিৎসকের জন্য তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা উভয়ের সমন্বয় দরকার। এদিকেই তিনি তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন। পূর্ববর্তী ও সমকালীন যশস্বী চিকিৎসকদের চিকিৎসাগত অভিজ্ঞতার ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেন *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে কীর্তিমান চিকিৎসকদের লেখা গ্রন্থের নাম, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি তিনি অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে তার রচিত গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে মুসলিম সভ্যতার পূর্বাপর চিকিৎসাবিজ্ঞানের অতুলনীয় এক ইতিহাসগ্রন্থ। বর্তমানে পৃথিবীতে চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে কেউ গবেষণা করতে চাইলে এই গ্রন্থটি অবশ্যই পাশে রাখতে হবে।[৪০৯]

ইবনে আবি উসাইবিয়া এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন মূলত উজির আবুল হাসান আমিনুদ্দাউলা ইবনে গাযাল সামেরির অনুরোধে। তিনি ছিলেন বাদশাহ সালেহ ইবনে মালিক আদিলের উজির। ৬৩৪ হিজরিতে তিনি উপর্যুক্ত গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। শেষ করেন ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে (৬৬৭ হি.)। এই গ্রন্থের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ইবনে উসাইবিয়া সকল তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের আবিষ্কার এবং পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের বিবৃতির ওপর নির্ভর করেছেন। পাশাপাশি তিনি যুগশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের থেকে যা শুনেছেন এবং নিজে আবিষ্কার করেছেন তা উল্লেখ করেছেন।

---

৪০৭. সারখাদ : সিরিয়ার জাবাল আল-দুরুজের একটি অঞ্চল। এটি দামেশকের হাওরান প্রদেশের সংলগ্ন একটি অঙ্গরাজ্য। সারখাদ মূলত একটি অভেদ্য দুর্গের নাম। *মুজামুল বুলদান*, ৩/৪০১

৪০৮. *মুজামুল মাতবুআত আল-আরাবিয়্যা*, ১/২৭; *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৪৩৫; *আত-তিব্বু ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৮৭

৪০৯. *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, ৫/৩২৭

আরেকটি বিষয় যা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ইবনে উসাইবিয়ার গ্রন্থকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে এবং অদ্যাবধি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে স্থান দিয়েছে তা হলো ইবনে উসাইবিয়ার গভীর অনুসন্ধিৎসা। তিনি অনেক তত্ত্বতালাশ করে প্রত্যেক চিকিৎসকের জীবনী, জ্ঞানকর্ম এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রত্যেকের উল্লেখযোগ্য অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি এই ইতিহাসগ্রন্থে চমকপ্রদ তথ্যের মাধ্যমে যুগের জ্ঞান-গবেষণা ও সামাজিক জীবনের ছবি প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৪১০]

ইবনে আবি উসাইবিয়ার এই গ্রন্থে আরও রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিভিন্ন শিল্পকলার সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল্যায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বতন্ত্র রচনার অধিকারী পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের স্তরবিন্যাস। তিনি গ্রিক চিকিৎসকদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামি সভ্যতার চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আলোচনাও স্থান পেয়েছে তার গ্রন্থে। চিকিৎসকদেরকে পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৪১১]

ইবনে আবি উসাইবিয়া *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* গ্রন্থে আরও বলেন, চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশের পর—শুরু থেকে অদ্যাবধি—অসংখ্য মানুষ এই শাস্ত্রের উৎকর্ষে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাদের অনেকেই ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের নক্ষত্র, যোগ্যতায় অতুলনীয়। তাদের কীর্তি-কৃতিত্ব, মান-মর্যাদা ও দান-অবদান যুগপরম্পরায় বর্ণিত। তাদের রচনাসম্ভার এর উজ্জ্বল সাক্ষী। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, চিকিৎসকদের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে লেখা সামগ্রিক কোনো গ্রন্থ আমি পাইনি যেখানে ধারাবাহিকভাবে তাদের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাই আমি *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* গ্রন্থের রচনায় হাত দিই। এখানে প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কথা তুলে এনেছি। কাল, স্তর ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্তও করেছি। তুলে ধরেছি তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, আলাপচারিতা, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, গ্রন্থাবলি, তত্ত্বমালা ও জ্ঞান-গবেষণা। এর মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞানের বিস্তৃতি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও সময়ের বিবেচনায় তারা আমাদের বহু আগের, কিন্তু তাদের

---

৪১০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৩৬

৪১১. *কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন*, ২/১১৮৫

অনুগ্রহ আমাদের ওপর অনেক বেশি, ছাত্রের ওপর শিক্ষকের অনুগ্রহের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। এই গ্রন্থে আমি ওই সকল দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কথাও তুলে ধরেছি, যারা চিকিৎসক না হলেও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাদের অবস্থা, ঘটনাবলি, গ্রন্থাবলির নাম আমি তুলে ধরেছি। উপযুক্ত স্তর ও ধারাক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছি তাদেরকে।[৪১২]

উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা গ্রন্থ সম্পর্কে অ্যালডো মেলি বলেন, উয়ুনুল আতিব্বা গ্রন্থ আমাদেরকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের বুনিয়াদি ধারণা দেয়।[৪১৩]

এই গ্রন্থের নিরীক্ষক ও বিশ্লেষক ড. আমের নাজ্জার বলেন, *উয়ুনুল আতিব্বা* গ্রন্থটি আমাদের সামনে পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের কথা তুলে ধরেছে। তুলে ধরেছে তাদের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত। ইবনে আবি উসাইবিয়া এই গ্রন্থ রচনায় তার পূর্ববর্তীদের লেখা কিছু গ্রন্থ থেকে উদারভাবে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তিনি যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইবনুল মাতরান রচিত *বুসতানুল আতিব্বা*, *মুখতাসারু কিতাবিল আদভিয়া লিল কালাদানিয়্যিন*, আবুল ওয়াফা মুবাশশার ইবনে ফাতিকের *মুখতারুল হিকাম ওয়া মাহাসিনুল কিলাম*, শায়খ আবু সুলাইমান মানতেকির *তাআলিক*, *সাওয়ানুল হিকমাহ*, আবদুল মালেক ইবনে যুহরের *তাইসির*, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা *আল-মুতাবার*, আবু মাশার বালখির *আল-উলুফ*, হুনাইন ইবনে ইসহাকের *নাওয়াদিরুল ফালাসিফা ওয়াল হুকামা*, ইবনে জুলজুলের *তাবাকাতুল আতিব্বা* ইত্যাদি।[৪১৪]

উয়ুনুল আতিব্বা গ্রন্থটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি, ইবনে আবি উসাইবিয়া আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যেমন *ইসাবাতুল মুনাজ্জিমিন*[৪১৫], *হিকায়াতুল আতিব্বা ফি ইলাজাতিল আদভিয়া* [৪১৬], *আত-তাজারিব ওয়াল ফাওয়ায়িদ* ইত্যাদি[৪১৭]।

---

৪১২. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/১৫১

৪১৩. অ্যালডো মেলি, *আল-ইলম ইনদাল আরব ওয়া আসারুহু ফি তাতাওউরিল ইলমিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৩০

৪১৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/১০

৪১৫. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/৩১৭

৪১৬. প্রাগুক্ত, ৩/২৩

আমরা দেখতে পাই, ইবনে আবি উসাইবিয়ার গভীর আত্মনিবেশের কল্যাণে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদদের নিয়ে রচিত হয়েছিল অসাধারণ গ্রন্থাবলি। এককথায় বলা যায় মুসলিমজাতির ঐতিহাসিক অবদান ও সভ্যতাগত গৌরবগাথা সংরক্ষণে ইবনে আবি উসাইবিয়ার ভূমিকা ছিল অসামান্য।

(৭)
ইবনে কাহহাল : চক্ষুচিকিৎসার জনক

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা থেকেই চক্ষুচিকিৎসাকে সাধারণ চিকিৎসাব্যবস্থা থেকে পৃথকভাবে দেখা হয় এবং স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। আরবীয় মুসলিম সমাজেও চক্ষুচিকিৎসা সম্মানিত পেশা হিসাবে বিবেচিত ছিল। আরবিতে চক্ষুচিকিৎসাকে বলা হতো 'সিনাআতুল কাহল'।[৪১৮]

ইবনে কাহহাল একজন অসামান্য প্রাজ্ঞ চিকিৎসক। চক্ষুচিকিৎসা নিয়ে তার রচিত গ্রন্থটি সাত শতক পর্যন্ত ছিল এ বিষয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এটি নিছক আমাদের দাবি না। বরং জার্মান প্রাচ্যবিদ হিরসবার্গও এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ইবনে কাহহালের (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.) পুরো নাম আলি ইবনে ঈসা বাগদাদি আল-কাহহাল। উপাধি শরফুদ্দিন। তিনি হিজরি চতুর্থ শতকের একজন চিকিৎসক। ইউরোপে তিনি Jesyhaly নামে প্রসিদ্ধ।[৪১৯]

ইবনে কাহহাল শৈশব থেকেই চক্ষুচিকিৎসার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। এ নিয়েই ছিল তার সকল চিন্তাভাবনা। অবিরাম সাধনা আর অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে একসময় তিনি হয়ে উঠলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের একজন নক্ষত্র। চক্ষুচিকিৎসা নিয়ে আরব ও গ্রিকদের লেখালেখি তার গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ হয়। ফলে তাদের ভুল সিদ্ধান্তগুলো খণ্ডনে তিনি পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দেন। পরবর্তী সময়ে চক্ষুচিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।[৪২০]

---

৪১৭. প্রাগুক্ত, ৪/২৫৬

৪১৮. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৪/৩১৮

৪১৯. ম্যাক্স মেয়েরহোফ, *তুরাসুল ইসলাম*, পৃ. ৪৭৬

৪২০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫৪

ঐতিহাসিক সাফাদিও তার সম্পর্কে বলেন, ইবনে কাহহাল চক্ষুচিকিৎসায় দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছেন। চোখের রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে তার মতামতই ছিল চূড়ান্ত।[৪২১]

উইল ডুরান্ট[৪২২] তার বিখ্যাত *দ্য স্টোরি অব সিভিলাইজেশন* গ্রন্থে লিখেছেন, আলি ইবনে ঈসা শ্রেষ্ঠ মুসলিম চক্ষুচিকিৎসক। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার লেখা বই পড়ানো হতো।[৪২৩]

ইবনে কাহহালের গ্রন্থাবলি

চক্ষুচিকিৎসা নিয়ে ইবনে কাহহাল বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থাবলি আজও দলিল হিসাবে বিবেচিত। তবে তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো *তাযকিরাতুল কাহহালিন*। সেখানে চক্ষুচিকিৎসাবিষয়ক তিনটি অধ্যায় আছে।

জামালুদ্দিন কিফতি তারিখুল হুকামা গ্রন্থে লেখেন, আলি ইবনে ঈসার *তাযকিরাতুল কাহহালিন* গ্রন্থটি চক্ষুচিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থ। এজন্যই দীর্ঘ সময় এটি চক্ষুচিকিৎসকদের নিকট ছিল আস্থা ও নির্ভরতার উৎস। ত্রয়োদশ হিজরি শতক পর্যন্ত চক্ষুচিকিৎসায় রচিত এই গ্রন্থই ছিল শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। *তাযকিরাতুল কাহহালিন* চিকিৎসাশাস্ত্রে পূর্ববর্তীদের অবদানের এক ঐতিহাসিক দলিল। একইসাথে *তাযকিরাতুল কাহহালিন* গ্রন্থে রয়েছে ইবনে কাহহালের অভিনব ও মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ।[৪২৪]

একটি তত্ত্বের মাধ্যমে *তাযকিরাতুল কাহহালিন* গ্রন্থের গুরুত্ব বোঝা যায়, যেখানে ইবনে কাহহাল দর্শনপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। তিনিই প্রথম বলেছেন, দৃষ্টিশক্তি প্রথমে চোখ থেকে বের হয়ে দর্শনীয় বস্তুর পরিমাপ করে। এরপর তা আবার চোখে ফিরে এসে মস্তিষ্কে বস্তুর ছবি এঁকে দেয়। ফলে আমরা দেখতে পারি। পরবর্তী সময়ে ইবনে কাহহালের ভুল সিদ্ধান্তকে শুদ্ধ করে দেন আরব চিকিৎসার অন্যতম নক্ষত্র হাসান ইবনে হাইসাম। তিনি বলেন, দৃষ্টি বা অবলোকন হলো, চোখের ভিজুয়াল সিস্টেমে বিভিন্ন

৪২১. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, ২১/২৪৬

৪২২. **উইল ডুরান্ট (১৮৮৫-১৯৮১ খ্রি.)** : বিখ্যাত মার্কিন বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিক। তার শ্রেষ্ঠ রচনাকর্ম *কিসসাতুল ফালসাফা* এবং ৪২ খণ্ডে রচিত সভ্যতার বিশ্বকোষ *কিসসাতুল হাযারা*। এখানে তিনি সভ্যতার উন্মেষপর্ব থেকে আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস এঁকেছেন।

৪২৩. *কিসসাতুল হাযারা*, ১৪/৫২

৪২৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫৪-২৫৫

চিত্রের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়া। এখানে দৃষ্টির আলাদা কোনো প্রাণশক্তি নেই যেমনটি ধারণা করতেন আলি ইবনে ঈসা কাহহাল।

জ্ঞানগত গুরুত্বের দরুন, বহুকাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি ছিল অন্যতম আশ্রয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেন, চোখের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন, তার প্রায় সবকিছুই এক মলাটে আমি বর্ণনা করে দিয়েছি। কেননা চোখের কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য কখনো কখনো বড় বড় বিশ্বকোষ দেখার প্রয়োজন হয়। অথচ তার সুযোগ থাকে না বিভিন্ন কারণে। তা ছাড়া সফরে বড় বড় গ্রন্থ বহন করা মুশকিল। এই বইটি ছোট হওয়ায় দূরপথে সাথে রাখা সহজ হবে। তা ছাড়া একটি গ্রন্থেই আমি চক্ষুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় সবকিছু উল্লেখ করে দিয়েছি। পাশাপাশি উল্লেখ করেছি রোগের লক্ষণ, কারণ, প্রতিকার, সাদৃশ্যপূর্ণ রোগসমূহ ইত্যাদি।[৪২৫]

'তাযকিরাতুল কাহহালিন' গ্রন্থটির বিন্যাস

প্রথম অধ্যায় : চোখের স্তরসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ, স্নায়ু, পেশি, লিগামেন্ট, চোখের আর্দ্রতা ও দর্শনপ্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায় : চোখের পাতার চুলকানি, শক্ত হয়ে যাওয়া, চোখের ওপরের পাতা ঝুলে পড়া, উলটে যাওয়া, চোখে জখম হওয়া, পানি পড়া, চোখের ওপরে অতিরিক্ত মাংস, কর্নিয়াল ফুসকুড়ি, পাস্টুলস, ক্যান্সার, পিউপিলারি রোগ এবং ইনফেকশন।

তৃতীয় অধ্যায় : চোখের সংবেদনশীল অদৃশ্য রোগ, রোগের কারণ ও চিকিৎসা, দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা, মায়োপিয়া, হাইপরমেট্রোপিয়া, রাতকানা, রেটিনাল ও স্নায়বিক রোগ, চোখ শুকিয়ে যাওয়া, অকুলোমোটর নার্ভের রোগ ইত্যাদি। এ ছাড়া চোখ সুরক্ষার উপায় এবং চোখে ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা তিনি আলোচনা করেছেন।[৪২৬]

গ্রন্থটি সম্পর্কে জ্ঞানীদের সাক্ষ্য

ইবনে আবি উসাইবিয়া *তাযকিরাতুল কাহহালিন* সম্পর্কে বলেছেন, যারা চক্ষুচিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কিংবা গবেষক, প্রত্যেকের উচিত ইবনে কাহহালের গ্রন্থটি মুখস্থ করা। চক্ষু বিষয়ে রচিত সকল গ্রন্থ রেখে ইবনে

---

[৪২৫]. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫৫

[৪২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫-২৫৬

কাহহালের গ্রন্থটি মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই আস্থা শেষ হয়নি।[৪২৭]

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাত জর্জ সার্টন বলেন, *তাযকিরাতুল কাহহালিন* চক্ষুবিজ্ঞানে আরবি ভাষায় রচিত সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। মধ্যযুগ থেকে প্রায় আধুনিক যুগের আগ পর্যন্ত হুনাইন ইবনে ইসহাকের লেখা *আশরু মাকালাত ফিল আইন* ছাড়া চক্ষুবিজ্ঞানের এমন উন্নত গ্রন্থ পাওয়া যায় না।[৪২৮]

হিরসবার্গও বলেছেন, নিঃসন্দেহে চক্ষুবিজ্ঞানের এ যাবৎকালের সবচেয়ে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো হুনাইন ইবনে ইসহাকের রচিত *তাযকিরাতুল কাহহালিন*, যেটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আরবি ভাষায় এ বিষয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে, প্রায় সবই আমাদের হাতে পৌঁছেছে। কিন্তু ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে *তাযকিরাতুল কাহহালিনের* সমপর্যায়ে উন্নীত কোনো গ্রন্থ দেখা যায়নি।[৪২৯]

কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশেষ মূল্য ও মর্যাদার কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মধ্যযুগের প্রথমদিকে এটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। ফারসি ভাষায় অনূদিত হয় শামসুদ্দিন ইবনে আলি জুরজানির কলমে। এর পাণ্ডুলিপি হায়দারাবাদের সালার জং জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তুর্কি ভাষায়ও গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় এটি অনুবাদ করেন প্রাচ্যবিদ হিরসবার্গ। গ্রন্থটির শুরুতে তিনি ইবনে কাহহালের চিকিৎসাগত অবদান নিয়ে একটা জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন।[৪৩০]

তাযকিরাতুল কাহহালিন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ক্যাসি আলবার্ট উড।[৪৩১] মেয়েরহোফ গ্রন্থটির কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করে ট্রাকোমা[৪৩২] সম্পর্কে রচিত তার গ্রন্থের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

---

৪২৭. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/২৬৩

৪২৮. *আত-তুরাসুল আরাবিয়্যু* ম্যাগাজিন, সংখ্যা : ৮৯, মার্চ ২০০৩

৪২৯. *আত-তুরাসুল আরাবিয়্যু* ম্যাগাজিন, সংখ্যা : ৮৯, মার্চ ২০০৩

৪৩০. প্রাগুক্ত

৪৩১. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫৭

গ্রন্থটির প্রাচীনতম সংস্করণ ৯০৩ হিজরিতে ভেনিসে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৯০৫ হিজরিতে। পরবর্তী বছর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৪৩৩]

ইবনে কাহহালের জ্ঞানগত উদ্ভাবন

জ্ঞানগত গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ইবনে কাহহাল আবিষ্কার করেছেন এক নতুন স্বতন্ত্র পদ্ধতি। *তাযকিরাতুল কাহহালিন* গ্রন্থে আমরা এমনটিই দেখতে পাই। তিনি যুক্তিবিদ্যাগত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ব্যবহার করেছিলেন তার গবেষণায়। তার রচনাশৈলী আদি যুগের রচনাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। হুনাইন ইবনে ইসহাক (মৃ. ২৬০ হি.) *আল-মাকালাতুল আশরু ফিল আইন* ও *আল-মাসাইল ফিল আইন* গ্রন্থদ্বয়ে যে গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, সেখান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন ইবনে কাহহাল।

টেম্পোরাল ও ক্রেনিয়াল আর্টেরাইটিস ও এ দুইয়ের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তির অস্বচ্ছতা বর্ণনায় তার সৃজনশীলতা প্রতিভাত হয়েছে। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে জোনাথন হিগিংসন এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সে হিসাবে বলা যায়, চক্ষুচিকিৎসায় তার আট শতাব্দীর অগ্রজ হলেন মুসলিম সভ্যতার ইবনে কাহহাল। এই দুজনের মাঝে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন ড. হ্যামিল্টন ও তার সঙ্গীরা। ইবনে কাহহালের *তাযকিরাতুল কাহহালিন* গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, যখন তিনি ডাইভার্টিকিউলিটিস[৪৩৪] ও কাউটারাইজেশন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তখন বেশ সূক্ষ্মভাবে প্রদাহপূর্ণ ধমনি ও দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমগুলোর আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন।

ইবনে কাহহালের গ্রন্থ থেকে ড. হ্যামিল্টন ও তার সঙ্গীদের কথার যৌক্তিকতা আমরা বুঝতে পারি। ইবনে কাহহাল তার গ্রন্থের ২৫তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় নিবন্ধে আলোচনা করেছেন টেম্পোরাল ধমনির স্লাইডিং ও কাউটারাইজেশন করা সম্পর্কে। সেখানে তিনি বলেছেন, মাইগ্রেনের ফলে মাথাব্যথা, চোখের

---

৪৩২. ট্রাকোমা : ক্লেমেডিয়া ট্রাকোমেটিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ। এর সংক্রমণে নেত্রপল্লবের ভেতরের পৃষ্ঠ অমসৃণ হয়। এর অমসৃণতা চোখে ব্যথা, চোখের বহির্পৃষ্ঠে অথবা কার্নিয়ায় ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্ধত্বের কারণ হতে পারে।

৪৩৩. *আত-তুরাসুল আরাবিয়্যু* ম্যাগাজিন, সংখ্যা : ৮৯, মার্চ ২০০৩ খ্রি.।

৪৩৪. ডাইভার্টিকিউলিটিসের ফলে বৃহদন্ত্র প্রভাবিত হয়। এ রোগে বৃহদন্ত্রের প্রাচীরে ছোট ছোট পিণ্ড তৈরি হয়। এই ডাইভার্টিকুলাগুলোয় প্রদাহের সৃষ্টি হলে একে ডাইভার্টিকিউলিটিস বলে।

দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ এবং মস্তিষ্কের ফ্লুর চিকিৎসা করা সম্ভব। কিন্তু এতে ঝুঁকিও কম নয়। এমনকি কখনো কখনো দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

মস্তিষ্কের বহিরাবরণের ধমনি প্রদাহের চিকিৎসাপ্রক্রিয়া বর্ণনায় ইবনে কাহহাল বলেন, প্রথমে রোগীর মাথা ন্যাড়া করতে হবে। গরম পানিতে হাতের আঙুল ভিজিয়ে ধমনির জায়গাগুলো ধীরে ধীরে ডলতে থাকলে একসময় তা ফুলে উঠবে। সে স্থানে চিকন কলম দিয়ে দাগিয়ে রাখলে ভালো, এতে চিকিৎসার সুবিধা হয়। পরে বাম হাতের দু-আঙুল দিয়ে ত্বক কিছুটা টেনে ধরতে হবে। এভাবে প্রস্তুতি শেষ করে ত্বকে কোনো ধারালো বস্তু নিয়ে সোজাসুজি কিছুটা ফেড়ে দিতে হবে। ছেদটি শুধু ত্বকে থাকবে। তারপর শিরা একটি হুক দিয়ে প্রসারিত করা হবে, যতক্ষণ না এটি চারদিক থেকে অপসারণ করা হয়। তারপর সেটি কাউটারাইজেশন করে দিতে হবে। যদি ধমনিটি সূক্ষ্ম হয় তবে এর নিচে একটি স্ক্যালপেল ঢুকিয়ে কেটে ফেলতে হবে।[৪৩৫]

এভাবেই সূক্ষ্মতা ও জ্ঞানগর্ভ সমাধানের মধ্য দিয়ে ইবনে কাহহাল যুগ যুগ ধরে চিকিৎসাশাস্ত্রের একজন বরিত ব্যক্তি হিসাবে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। তার গ্রন্থাবলি থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কখনোই অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না।

(৮)

ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ : প্রতিভাবান চিকিৎসক

ইসলামি সভ্যতা তার ছায়াতলে অবস্থিত সকল জাতি-গোষ্ঠীকে আপন করে নিয়েছিল। কখনো মুসলিম-অমুসলিমে ভেদাভেদ করেনি। ইসলামের ইতিহাসে কোনো জাতি অপর জাতির তুলনায় শ্রেয় না। আরব, পারসীয়, রোমান, কুর্দি, তুর্কি, শেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ কেউ কারও ওপর শ্রেষ্ঠ না। মানুষের কাছেও শ্রেষ্ঠ না, আল্লাহর কাছেও না। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সৎকর্ম।

ইবনে মাসাওয়াইহ একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান চিকিৎসক হিসাবে সুখ্যাতির পাশাপাশি মানবকল্যাণের জন্য তার নাম ও খ্যাতি অবিস্মরণীয়। তিনি এই ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের দলিল এবং সাক্ষী। মুসলিমদের ক্ষমতা এবং

৪৩৫. 'ইলতিহাবুশ শারায়ান ফিল খালায়াল আমলাকাতি মাআল তিহাবিশ শারায়ানিস সুদগি' সম্পর্কে ড. হ্যামিল্টনের গবেষণা। *মার্কিন চিকিৎসা সাময়িকী*, প্রথম সংখ্যা, ১৯৭১ খ্রি.।

শৌর্যবীর্যের জয়গান যখন চারদিকে তখন আব্বাসীয় খলিফাদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন একজন খ্রিষ্টান, এ কথা প্রমাণ করে মুসলিম রাষ্ট্রে যোগ্যতা আর দক্ষতাই আসল। ইসলামি রাষ্ট্রে কর্মের পদে নেই কোনো জাতিগত পক্ষপাতিত্ব। জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিরাই পদ-পদবির উপযুক্ত।

ইবনে মাসাওয়াইহের পুরো নাম আবু যাকারিয়া ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ। বিদ্বান, লেখক[৪৩৬], গবেষক ও বাদশাহদের আস্থাভাজন ব্যক্তি। ধর্মবোধে সিরীয় খ্রিষ্টান। তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ও জুনদিশাপুরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। ১৯০ হিজরি থেকে ২৪৩ হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সামরা শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তীক্ষ্ণ মেধায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সমকালীন বহু চিকিৎসকের গুরু ছিলেন তিনি। বিদেশি ভাষার মূল্যবান বই অনুবাদেও তার হাত পাকা ছিল।[৪৩৭]

প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিকাশে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন খলিফা হারুনুর রশিদ। তার প্রচেষ্টায় মুসলিমদের সকল বিজিত অঞ্চল যেমন রোম, আঙ্কারা এবং আমোরিয়া থেকে খেলাফতের রাজধানীতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন গ্রন্থ এসে জমা হতে থাকে। সকলের পক্ষে বিদেশি ভাষা থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন করা সহজ ছিল না মোটেও। এজন্য দরকার ছিল সাবলীল অনুবাদ। ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহকে প্রধান নিযুক্ত করে অনুবাদকপর্ষদ গঠন করেন খলিফা হারুনুর রশিদ। ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ খলিফাকে বইপত্রের জন্য বিশাল ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেন। হারুনুর রশিদ ভবন নির্মাণের পর সেটি হয়ে ওঠে জ্ঞানবিজ্ঞানের একাডেমি 'বায়তুল হিকমাহ'। হারুনুর রশিদের পর মামুনুর রশিদ ক্ষমতায় এসে ২১৫ হিজরি/৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইউহান্নাকে বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেন।

খলিফা হারুনুর রশিদ, আমিন ও মামুনের শাসনামলে রাজদরবারে ইউহান্না চিকিৎসার সেবা দিয়েছেন। এমনকি মুতাওয়াক্কিলের আমল পর্যন্ত রাজচিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। আব্বাসি শাসকগণ তার উপস্থিতি ছাড়া খাবারের লোকমা মুখে তুলতেন না। তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন তাদের মাথার কাছে। শীতকালে হাতে থাকত উষ্ণ হজমি ওষুধ আর গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা লাচ্ছি যা হজমের পক্ষে সহায়ক।

---

৪৩৬. *আল-ফিহরিসত লি ইবনি নাদিম*, ১/৪১১
৪৩৭. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭২

পুরো বাগদাদে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি।[৪৩৮]

ড. কামাল সামুরাই বলেন, মাসাওয়াইহ বংশের প্রসিদ্ধতম ব্যক্তি ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ। মহৎ কর্ম ও অবদানে তিনি অমর করে রেখেছেন তার পরিবারের নাম। দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ছিলেন বাগদাদ আর সামুরার অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ছিলেন আব্বাসি খেলাফতের প্রধান শাসকবৃন্দ—মামুন, মুতাসিম, ওয়াসেক, মুতাওয়াক্কিলের আস্থাভাজন। এবং আরবি, সুরিয়ানি-সহ অন্যান্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ফলে এসব ভাষায় লিখিত চিকিৎসাপত্র পাঠে তার বেগ পেতে হয়নি। তিনি চিকিৎসক আবদুল্লাহ তাইফুরির মেয়েকে বিয়ে করেন। খলিফা মামুনের শাসনামলে মেধা ও যোগ্যতায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন।[৪৩৯]

চিকিৎসাক্ষেত্রে ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহের অবদান

ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ সাফল্য অর্জন করেছিলেন বেশ কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষায়, বিশেষত শারীরবৃত্তিতে। মানুষের অ্যানাটমি অনুধাবনের জন্য তিনি বানরের দেহ কাটাছেঁড়া করতেন। সেখানকার প্রাপ্ত তথ্য মানুষের দেহে প্রয়োগ করতেন। তাই এ ক্ষেত্রে গ্যালেনের চেয়ে তার অধিক প্রায়োগিক ও বাস্তবসম্মত জ্ঞান ছিল।

আহমাদ শাওকাত শাতি[৪৪০] বলেন, বিভিন্ন প্রাচীন সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, বানরের দেহ কাটাছেঁড়া ও ময়নাতদন্তের জন্য ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ দজলা নদীর তীরে একটা মর্গ নির্মাণ করেছিলেন। মানুষের সাথে অতি সাদৃশ্যপূর্ণ একশ্রেণির বানর তিনি নির্বাচন করেছিলেন। দূরদূরান্ত থেকে এসব বানর সংগ্রহে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন খলিফা মুতাসিম। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে তৎকালীন শাসকদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার অনেকখানি বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে।[৪৪১]

---

৪৩৮. *তারিখুল হুকামা লি কিফতি*, পৃ. ১৬৩

৪৩৯. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৩

৪৪০. *তারিখুত তিব ওয়া আদাবুহু ওয়া আলামুহু* (চিকিৎসার ইতিহাস, নৈতিকতা এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকবৃন্দ) গ্রন্থের লেখক।

৪৪১. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৩

ইবনে মাসাওয়াইহের চিকিৎসাকেন্দ্রিক গবেষণা ও প্রায়োগিক পরীক্ষানিরীক্ষা নিছক অ্যানাটমির বলয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং প্রসারিত ছিল অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রেও। হজমপ্রক্রিয়া ও চোখের সমস্যা নিয়েও গবেষণা করেছিলেন তিনি। মাছ ও দুধ খেলে যে অ্যালার্জিজনিত রোগ হতে পারে, এমন কথা তিনিই বলেছিলেন প্রথম। চক্ষুচিকিৎসা নিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন *দাগলুল আইন* নামক এক গ্রন্থ। দীর্ঘকাল আরব ও অনারব অনেক চক্ষু চিকিৎসকের কাছে এটিই ছিল মৌলিক গ্রন্থ।[৪৪২]

ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহের বৈচিত্র্যময় জীবন

ইউহান্না নীরস কোনো সাধারণ চিকিৎসক ছিলেন না। পরিমিত রসবোধ, ভদ্রতা ও শালীনতা তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তার জীবনে চমৎকার কিছু ঘটনাও রয়েছে। যেমন, একবার এক ব্যক্তি তার কাছে এসে একটি রোগের কথা বলল। তখন অপারেশন ছাড়া সেই রোগের বিকল্প কোনো চিকিৎসা ছিল না। তাই তিনি অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। লোকটি বলল, আমি তো অপারেশনে অভ্যস্ত না। ইউহান্না তার কথা শুনে বললেন, আরে, কেউ কি মায়ের পেট থেকে অপারেশনে অভ্যস্ত হয়ে আসে নাকি! তা ছাড়া এর আগে তো তুমি এই অসুখেও অভ্যস্ত ছিলে না; এখন তো অসুখ হয়েছে। সুতরাং ভেবে দেখো, তুমি অসুস্থতায় ভুগবে নাকি অপারেশন করে সুস্থ হয়ে উঠবে!

ইউহান্না জন্মসূত্রে খ্রিষ্টান হলেও খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তেমন আগ্রহ তার ছিল না। সুযোগ পেলে বরং কটাক্ষ করে বসতেন। শেষজীবনে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যান। তার পরিবার নিরাশ হয়ে যায়। কারও জীবনের আশার আলো নিভে গেলে খ্রিষ্টানরা সন্ন্যাসী ও পোপদের ডেকে বাইবেল পাঠ ও ঈশ্বরবন্দনার আয়োজন করে। ইউহান্নার জন্যও তাই করা হলো। ইউহান্না তাদেরকে রাগতস্বরে বলেন, পাপিষ্ঠরা, আমার ঘরে কী করছ? তারা উত্তরে বলেন, আপনার জন্য প্রভুর কাছে রোগমুক্তির প্রার্থনা করছি। তিনি যেন আপনার ওপর দয়া করেন। ইউহান্না বলেন, সকল খ্রিষ্টানের বন্দনা থেকে একটা ট্যাবলেট খাওয়া ঢের উত্তম। আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। ইউহান্নার ধমক শুনে তারা সেই মুহূর্তেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

---

৪৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

ইউহান্নার কিছু বাণী

—তাকে প্রশ্ন করা হলো, 'এমন কল্যাণ কী, যাতে কোনো অকল্যাণ নেই?' তিনি বলেন, পরিমিত বিশুদ্ধ পানি পান।

—আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'এমন অকল্যাণ কী, যাতে বিন্দুমাত্র কল্যাণ নেই?' তার উত্তর ছিল, বৃদ্ধা নারী বিবাহ।

—আপেল খেলে দেহ প্রাণবন্ত হয়।

—টাটকা খাবার খাও, বাসি পানি পান করো।[৪৪৩]

ইউহান্নার গ্রন্থাবলি

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ। পরবর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য গ্রন্থগুলো একেকটি বাতিঘরের মতোই। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে :

- *কিতাবুল বুরহান*; এতে রয়েছে ৩০টি অধ্যায়।
- *কিতাবুল বাসিরা*
- *কিতাবুল কামাল ওয়াত তামাম*; এখানে তিনি লিখেছেন মুখ, চোখ, শ্বাসনালির রোগ ও প্রতিষেধক, পাকস্থলীর ব্যথা, কিডনির রোগ ও চিকিৎসা নিয়ে।[৪৪৪]
- *কিতাবুল হামিয়্যাত*; এখানে তিনি একত্র করেছেন কান, মাথাব্যথা, লিভার ও পিত্তথলির রোগ ও প্রতিকার নিয়ে।
- *কিতাবুন ফিল আগযিয়া*; এখানে তিনি লিখেছেন বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ, উদরে গ্যাস্টিকের সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে।[৪৪৫]
- *কিতাবুন ফিল আশরিবা* (পানীয়সংক্রান্ত গ্রন্থ)
- *আল-মুনজি ফিস সিফাতি ওয়াল ইলাজাত* (রোগ বর্ণনা ও প্রতিষেধনের সহায়িকা); গরমের কারণে বুক ধড়ফড়ানির চিকিৎসা, ইনজেকশনের মাধ্যমে অন্ত্রের চিকিৎসা, কিডনি ও মূত্রাশয়ের রোগে আক্রান্তদের খাদ্য,

---

৪৪৩. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/১২৩

৪৪৪. *মুখতাসারু তারিখিত তিব্বিল আরাবিয়্যি*, ১/৩৭১-৩৭২

৪৪৫. প্রাগুক্ত

হাড়ের সন্ধিস্থলে ব্যথা এবং গুটিবসন্তের চিকিৎসা নিয়ে রচনা করেছেন এই গ্রন্থ।[৪৪৬]

- *কিতাবুন ফিল ফাসদি ওয়াল হিজামাহ* (রক্তমোক্ষণ ও হিজামা চিকিৎসা)
- *আল-জাওয়াহের* (রত্নবৎ মূল্যবান পাথর); এখানে তিনি বিভিন্ন মূল্যবান পাথর নিয়ে লিখেছেন। সোনা, রুপা, ইয়াকুত, প্রবাল, মারজান, পান্না প্রভৃতি।[৪৪৭]
- *কিতাবুর রুজহান*
- *কিতাবুন ফি তারকিবিল আদভিয়াতিল মুসহিলা*; ডায়রিয়া, সায়্যাটিকা, শ্লেষ্মার কারণে দেহের সন্ধিস্থলে ব্যথা, মাড়ির রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে লিখেছেন এই গ্রন্থে। তা ছাড়া ডায়রিয়া হলে ডালিম খাওয়ার উপকারিতা-সহ আরও অনেক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এতে।[৪৪৮]
- *কিতাবু দাফয়ি মাদাররিল আগযিয়া* (বিভিন্ন খাদ্যের ক্ষতি থেকে সুরক্ষার উপায়)
- *কিতাবুন ফি গাইরি মা শাইউম মিম্মা আজাযা আনহু গাইরুহু*
- *কিতাবুস সিররিল কামিল* (পূর্ণ রহস্য)
- *কিতাবুন ফি দুখুলিল হাম্মামি ওয়া মানাফিউহা ওয়া মাদাররাতুহা* (গণগোসলখানায় যাওয়ার উপকার ও অপকার)
- *কিতাবুস সামুমি ওয়া ইলাজুহা* (বিষ ও তার প্রতিকার); এখানে তিনি বিষধর সাপের বিষ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৪৯]
- *কিতাবুদ দিবাজ*
- *কিতাবুল আযমিনাহ* (সময় ও কাল)
- *কিতাবুত তাবিখ* (রান্নার বই)

---

৪৪৬. প্রাগুক্ত
৪৪৭. প্রাগুক্ত, ১/৩৭৩
৪৪৮. প্রাগুক্ত, ১/৩৭০
৪৪৯. প্রাগুক্ত, ১/৩৭১

- *কিতাবুন ফিস সুদা* (মাথাব্যথা ও প্রতিকার); মাথাব্যথার কারণ, প্রকারভেদ, ওষুধ, প্রতিকার ও চিকিৎসাবিষয়ক বই। এটি তিনি আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরের[৪৫০] জন্য লিখেছিলেন।
- *কিতাবুস সাদরি ওয়াদ দুওয়ার* (বুকব্যথা ও মাথাঘোরা)
- *কিতাবুন লিমা ইমতানাআল আতিব্বা মিন ইলাজিল হাওয়ামিল ফি বাদি শুহুরি হামলিহিন্না* (কয়েক মাসের গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসা কেন চিকিৎসকগণ সাধারণত করেন না)
- *মিহনাতুত তাবিব* (চিকিৎসা পেশা)। এখানে তিনি জ্বরাক্রান্ত রোগীর নাড়ি ও প্রস্রাবের পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত তথ্য একত্র করেছেন।[৪৫১]
- *মারিফাতু মিহনাতিল কাহহালিন* (চক্ষুচিকিৎসা পেশা পরিচিতি)
- *দাখলুল আইন* (চোখের সমস্যা)
- *মিজাসসাতুল উরুক* (শিরাসমূহের ক্ষত পরীক্ষার শলাকা)
- *আস-সওত ওয়াল বাহহাহ* (স্বর ও স্বরভঙ্গ)
- *মাউশ শাইর* (যব ভেজানো পানি)
- *আল-মিররাতুস সাওদা* (কালো পিত্ত)
- *ইলাজুন নিসাইল লাওয়াতি লা ইয়াহবুলনা হাত্তা ইয়াহবুলনা* (বন্ধ্যা নারীর চিকিৎসা)
- *আল-জানিন* (ভ্রূণ)
- *তাদবিরুল আসিহহা* (গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা)
- *কিতাবুন ফিস সিওয়াক ওয়া সানুনাত* (মিসওয়াক ও টুথব্রাশ)
- *আল-মাইদা* (পাকস্থলী)
- *কুলানজ* (রেনাল কোলিক)[৪৫২]

---

৪৫০. আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে তাহির ইবনে হুসাইন খুযায়ি : (১৮২-২৩০ হি./৭৯৮-৮৪৪ খ্রি.)। আব্বাসি শাসনামলের প্রসিদ্ধ গভর্নর। শাম, মিশর, খোরাসান, তাবারিস্তান, কিরমান ও রায় শহরের গভর্নর। নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন। কেউ বলে মার্ভে ইন্তেকাল করেছেন।

৪৫০. *মুখতাসারু তারিখিত তিব্বিল আরাবিয়্যি*, ১/৩৭৩

৪৫১. *মুখতাসারু তারিখিত তিব্বিল আরাবিয়্যি*, ১/৩৭৩

- *আন-নাওয়াদিরুত তিব্বিয়া* (চিকিৎসাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিরল ঘটনা)
- *আত-তাশরিহ* (শারীরবৃত্তি)
- *কিতাবুন ফি তারতিবিল আদভিয়াতিল মুসহিলা বিহাসাবিল আযমিনাতি ওয়া বিহাসাবিল আমযিজা*। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন ওষুধ গ্রহণের পদ্ধতি, সময়, উপযুক্ত ব্যক্তি, ওষুধ বেশি দিন রেখে দিলে কীভাবে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে, ডায়রিয়া প্রতিরোধের নিয়ম ইত্যাদি। এ ছাড়াও এতে আলোচিত হয়েছে মানবসৃষ্টির গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এর সংখ্যা, জয়েন্ট, হাড়, শিরা, ব্যথার কারণ ইত্যাদি। তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন খলিফা আল-মামুনের নামে।
- *কিতাবুল আবদাল* (বিকল্প চিকিৎসা)
- *আল-মালিখুলিয়া* (মেলানকোলিয়া রোগের কারণ ও প্রতিকার)
- *জামিউত তিব* (চিকিৎসার সাতকাহন)। পারস্য ও রোমান চিকিৎসকদের মাঝে যে বিষয়ে ঐকমত্য ছিল, সেসব আলোচনা এখানে একত্র করা হয়েছে।
- *আল-হিলা লিল বুর*[৪৫৩] (রোগমুক্তির কৌশল)

---

৪৫২. **রেনাল কোলিক :** একধরনের পেটব্যাথা, যা সাধারণত স্থানচ্যুত বৃক্কের পাথর দ্বারা রেচননালিতে (Ureter) বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কারণে হয়। সবচেয়ে বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ভেসিকো-ইউরেটেরিক জাংশনে (Vesico-ureteric junction, VUJ) যা মূত্রনালির ঊর্ধ্বাংশের সব থেকে সরু জায়গা। আকস্মিক বাধা সৃষ্টির (Acute obstruction) কারণে মূত্রপ্রবাহে ব্যাঘাত ঘটে, যার ফলে রেচননালি ফুলে যেতে পারে এবং মসৃণ পেশির প্রতিবর্তী ক্রমকুঞ্চনজনিত খিঁচুনি (Reflexive peristaltic smooth muscle spasm) ঘটে, ফলে যা ইউরেটেরিক প্লেক্সাসের মাধ্যমে প্রেরিত হয়ে একটি তীব্র অভ্যন্তরীণ অঙ্গীয় ব্যথায় (Very intense visceral pain) পরিণত হয়।

৪৫৩. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/১২৩-১২৬

(৯)

ইবনে যুহর : আন্দালুসের অনন্য প্রতিভা

একসময় ইউরোপ ছিল অজ্ঞতা এবং পশ্চাৎপদতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। পক্ষান্তরে আন্দালুস ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও প্রাগ্রসরতার মূর্ত প্রতীক। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী তথা খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলিমদের নজিরবিহীন অগ্রগতির জ্বলন্ত সাক্ষী। বিশেষত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা এবং দর্শনশাস্ত্রে। তখন প্রত্যেক দার্শনিক ছিলেন চিকিৎসক এবং প্রত্যেক চিকিৎসক ছিলেন দার্শনিক। ফলে মধ্য ইউরোপ ও ইউরোপের নানা প্রান্ত এমনকি আন্দালুসের সংলগ্ন বিভিন্ন শহর থেকে আগত জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষার্থীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল মুসলিমদের আন্দালুস।

আন্দালুসের স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান চিকিৎসাবিজ্ঞানী—চিকিৎসাশাস্ত্রে যাদের অবদান দেদীপ্যমান এবং জ্ঞান-গবেষণাই ছিল যাদের ধ্যানজ্ঞান—হলেন আমাদের আলোচিত বিজ্ঞানী। চিকিৎসার উত্তরাধিকার পেয়েছেন পিতা থেকে এবং তার চিকিৎসাবিদ্যার উত্তরাধিকারী হয়েছেন তারই পুত্র। আন্দালুসের এই বিজ্ঞানীর নাম আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে যুহর আন্দালুসি। আবু বকর রাযির পর তাকেই মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে বড় ক্লিনিক্যাল চিকিৎসক মনে করা হয়। সার্জারিতেও তার দক্ষতা ছিল অসামান্য। শ্বাসযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে তিনিই প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন। খাদ্য, পানীয়, মেডিসিন এবং হাড়ভাঙা বিষয়ে তার অনেক গবেষণাকর্ম রয়েছে।

আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে আবিল আলা জন্মগ্রহণ করেন ৪৬৪ হিজরি/১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ইবনে যুহর আন্দালুসি ইশবিলি নামে বিখ্যাত। তার বংশের ধারায় বইছিল জ্ঞানের স্রোতঃস্বিনী। চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, এমনকি শরিয়তের জ্ঞানবিজ্ঞান সব দিকেই ছিল তার বংশের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার খ্যাতি। তার দাদা মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান ইবনে যুহর (মৃ. ৪২২ হি./১০৩১ খ্রি.) থেকেই সূচনা হয় এই বংশের জ্ঞানগত উত্থান। আন্দালুসে তিনি ছিলেন ধর্মীয় আলেম ও মহান ফকিহ। বংশের ধারায় এই জ্ঞানের উত্তরাধিকার লাভ করেন তার পুত্র আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যুহর। তিনি প্রথমে ফিকহশাস্ত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

তিনি ছিলেন বিবিধ জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী। তাই একসময় ঝুঁকে পড়েন চিকিৎসাশাস্ত্রে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের পিপাসায় ইবনে যুহর সফর করেন কায়রাওয়ানে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বড় বড় চিকিৎসকদের হাতে। সেখানে জ্ঞানার্জন সম্পন্ন করে যাত্রা করেন কায়রোর পথে। কায়রোয় চিকিৎসক হিসাবে তার প্রসিদ্ধি ঘটে। তবে তিনি ফিরে আসেন মাতৃভূমি ইশবিলিয়ায়। ৪৭১ হিজরি/১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে যুহরের চিকিৎসাশাস্ত্রের উত্তরাধিকার লাভ করেন তারই পুত্র আবুল আলা। পুরো নাম আবুল আলা যুহর ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যুহর। পিতার মতো তিনিও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান ও প্রসিদ্ধির দরুন চারদিক থেকে বহু শিক্ষার্থী তার কাছে সমবেত হয়।

মুরাবিত সাম্রাজ্যের শাসক ইউসুফ ইবনে তাশফিন তাকে ঘনিষ্ঠজন হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি আন্দালুসেই থাকতেন। আন্দালুসেই তার মৃত্যু হয় ৫২৫ হিজরি/১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে। আবুল আলা যুহর ইবনে আবদুল মালিক বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো:

- *কিতাবুল খাওয়াস* (বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থ)
- *মুজরিয়াতুত তিব* (চিকিৎসার চালিকাসমূহ)
- *আত-তাযকিরা* (স্মরণিকা)
- *আল- আদভিয়াতুল মুফরাদা* (বিযুক্ত মেডিসিন)
- *আন-নুকাত* (সূক্ষ্ম রহস্য) ইত্যাদি।

আবুল আলা যুহর ইবনে আবদুল মালিকের ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন আবু মারওয়ান, যার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ভরে ওঠে পৃথিবী। প্রসিদ্ধিতে বাবা ও দাদাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পূর্ণ নাম আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে আবুল আলা ইবনে যুহর। প্রথম ব্যক্তি হিসাবে তিনিই জীবনের পুরো সময় বিলিয়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসার শিক্ষা, প্রয়োগ, গবেষণা ও লেখালেখিতে।[৪৫৪]

---

৪৫৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, পৃ. ২৭৮-২৯১

বলা যায়, তার জ্ঞানতাত্ত্বিক সত্তা গড়ে তোলার পেছনে পরিবারের গভীর ভূমিকা ছিল। তার জ্ঞানসাধনায় এর স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। পিতা ছিলেন একদিকে যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, অন্যদিকে কবি। প্রজন্মপরম্পরায় এই জ্ঞানের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ইবনে যুহরের প্রপৌত্র আবু বকরের মাঝেও এই পারিবারিক জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মুরাবিত শাসকদের সাথে তারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মুলাসসামদের সাথেও সম্পর্ক ভালো ছিল। তারা প্রায়ই তাকে উপহার-উপঢৌকন দিতেন।[৪৫৫]

গবেষণা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক অবদান

ইবনে যুহর চিকিৎসা নিয়ে জীবনে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। লেখালেখির বিস্তৃতি থেকে তার জ্ঞানের প্রসারতা ও গভীরতার অনুমান পাই আমরা। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *আত-তাইসির ফিল মুদাওয়াত ওয়াত তাদবির*। মেডিক্যাল সাইন্স সম্পর্কে নিঃসন্দেহে এটি মুসলিমদের অন্যতম একটি গ্রন্থ। পূর্বের চিকিৎসাজগতের তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি প্রত্যক্ষ পরীক্ষণমূলক এবং ব্যবহারিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন পেরিকার্ডাইটিস[৪৫৬], ওটিটিস মিডিয়া[৪৫৭], পক্ষাঘাত, কিডনি থেকে পাথর অপসারণ ও শ্বাসনালিকে উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়া।[৪৫৮]

ইবনে যুহর রচনা করেছেন *আল-ইকতিসাদ ফি ইসলাহিল আনফুস ওয়াল আজসাদ* (আত্মা ও দেহ সংস্কারের মধ্যপন্থা)। এই গ্রন্থ সম্পর্কে এক প্রাচ্যবিদ বলেছেন, যারা পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর বইপত্র পড়েছে মূলত তাদের জন্য লেখা হয়েছে এই গ্রন্থটি। সাধারণ পাঠকদের জন্য না। লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে কথা বলেছেন তার মতো অভিজ্ঞ অন্যান্য চিকিৎসকদের সাথে। এখানে তিনি কুষ্ঠরোগ, ভিটিলিগো ও রোগ সংক্রমণ

---

৪৫৫. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/২৮৬

৪৫৬. **পেরিকার্ডাইটিস :** পেরিকার্ডিয়াম হার্টের পৃষ্ঠতলে একটি দ্বিস্তরের পাতলা থলি, যার লাল হয়ে যাওয়া, ফুলে যাওয়া ও প্রদাহকে পেরিকার্ডিটিস বলে। কখনো অতিরিক্ত তরল পদার্থ পেরিকার্ডিয়াল স্তরে জমা হয়, যা পেরিকার্ডিয়াল ইফ্যুসন নামে পরিচিত।

৪৫৭. **ওটিটিস মিডিয়া :** কানের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে ওটিটিস বলে। কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় ওটিটিস মিডিয়া বা মধ্যকর্ণের প্রদাহ। স্থায়িত্বের ভিত্তিতে ওটিটিস মিডিয়া দুরকম হতে পারে, (১) স্বল্পস্থায়ী (Acute otitis media) ও (২) দীর্ঘস্থায়ী (Chronic otitis media)।

৪৫৮. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২০১

নিয়ে আলোচনা করেছেন। সামসময়িক চিকিৎসকদের ব্যাপারে তার যে বেশ ক্ষোভ ছিল, তা এই গ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেন, রোগীর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের মধ্যেও অনেক ধরনের মানুষ আছে। অনেকে এমনও আছে, যারা চিকিৎসাশাস্ত্র ভালো করে অধ্যয়নই করেনি। অনেকে আবার রোগী দেখার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়াপ্রবণ। রোগী এলে ভালো করে রোগ পরীক্ষা না করেই তারা ওষুধ লিখে দেয়।[৪৫৯]

তার রচিত আরেকটি গ্রন্থ হলো *আল-আগযিয়া* (খাদ্য)। এটি উৎসর্গ করেছেন মুওয়াহহেদ রাজ্যের আমির আবদুল মুমিন ইবনে আলির নামে। এ ছাড়া *আল-জামি ফিল আদভিয় ওয়াল মাজুনাত* (মেডিসিন ও মলম) এবং *তাযকিরাতুন ফি আমরিদ দাওয়ায়িল মুসহিল ওয়া কাইফিয়্যাতু আখযিহ* (রেচক ওষুধের আলোচনা ও তা গ্রহণ করার পদ্ধতি) তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিডনি, ধবল রোগ, পেটের পাথর সম্পর্কে তার আরও কিছু গ্রন্থ রয়েছে।[৪৬০]

জ্ঞান-গবেষণায় দীপ্তিময় অবদানের কল্যাণে ইতিহাসের একজন মহান চিকিৎসক হিসাবে ইবনে যুহর বরিত হয়েছেন। তার অবদান তাত্ত্বিক গবেষণার বৃত্তে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও বহু অবদান রেখেছেন। তবে তিনি বড় কোনো অস্ত্রোপচার পরিচালনা করতে ভয় পেতেন। রোগীর দেহের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কিন্তু ওষুধ তৈরিতে তিনি ফলপ্রসূ অবদান রেখেছেন।[৪৬১]

চিকিৎসাকেন্দ্রিক অধ্যয়ন ও গবেষণায় ইবনে যুহর ছিলেন পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক যাচাই-বাছাইনির্ভর। ফলে এই পদ্ধতিতে তিনি এমন রোগেরও সন্ধান পেয়েছেন যা আগে আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি ফুসফুসের রোগ-বালাই নিয়েও গবেষণা করেছেন। ফুসফুসের ব্রংকাসে তিনিই প্রথম অপারেশন করেন।

স্বীকার করতেই হবে ইবনে যুহর ছিলেন আন্দালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বিদ্যমান রোগজীবাণু নিয়ে যারা প্রথম গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। চিকিৎসা ও খাদ্যে মধুর মূল্যমান তিনি

---

৪৫৯. প্রাগুক্ত

৪৬০. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/২৯১

৪৬১. *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, ২০১ পৃ.

প্রমাণ করেছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায় তার বিচরণ ছিল। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্য অবদানের মধ্য দিয়ে তার প্রসিদ্ধি ঘটে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি যুক্ত করেছেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণাকর্ম। এর মধ্যে আছে কিছু অভ্যন্তরীণ রোগ, চর্ম রোগ, জ্বর এবং মাথার রোগ। এভাবে সকল অবদানের মধ্য দিয়ে তিনি সামসময়িকদের মাঝে অনন্য হয়ে উঠেছেন।

আত-তাইসিরু ফিল মুদাওয়াত ওয়াত তাদবির গ্রন্থটি লেখার পেছনে একটা গল্প আছে। সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, মুসলিম চিকিৎসকদের মাঝে ছিল পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধ কাজ করার মানসিকতা।

প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে রুশদ রচনা করেছিলেন *আল-কুল্লিয়্যাত ফিত তিব* নামক গ্রন্থ। এটি লিখেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন চিকিৎসাশাস্ত্রে। এখানে তুলে এনেছেন চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিক প্রতিপাদ্য ও মূলনীতিসমূহ। অর্থাৎ চিকিৎসার সামগ্রিক তত্ত্বগুলো তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। শাখাগত আলোচনায় প্রবেশ করেননি। সুতরাং গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল চিকিৎসার শাখাগত সমস্যাগুলো নিয়ে আরেকটি গ্রন্থ রচনার। ইবনে রুশদ বেশ আস্থাবান ছিলেন ইবনে যুহরের ওপর। এমনকি তাকে গ্যালেনের যুগের পর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই *আল-কুল্লিয়্যাত ফিত তিব* গ্রন্থের শাখাগত আলোচনার জন্য ইবনে যুহরের নিকট আবেদন করেন। দুজনের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুর আবদার রক্ষা করে ইবনে যুহর লিখে ফেলেন *আত-তাইসিরু ফিল মুদাওয়াত ওয়াত তাদবির*। মধ্যযুগে এই গ্রন্থটি ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ দলিল। এখান থেকে আমরা আন্দালুসের বিজ্ঞানীদের জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধিও জানতে পারি।

এই দুই গ্রন্থের সম্বন্ধ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত ইবনে রুশদ নিজেই বলেছেন *আল-কুল্লিয়্যাত* গ্রন্থে। তিনি বলেন, এই গ্রন্থে সকল রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক তুলে ধরেছি সংক্ষিপ্তভাবে। তবে রোগের অভ্যন্তরীণ অনুষঙ্গ, উপসর্গ, বিভিন্ন অঙ্গের শাখাগত রোগের আলোচনা আসেনি এখানে। যদিও এগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সামগ্রিক চিকিৎসার জন্য শাখাগত আলোচনা খুবই প্রয়োজন। শাখাগত আলোচনায় অঙ্গ অনুযায়ী বিভিন্ন রোগের পর্যালোচনা করা হয়। এটা পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি। চিকিৎসার পূর্ণতা তখনই হয়, যখন সামগ্রিক আলোচনার সাথে যুক্ত হয় শাখাগত আলোচনা। তবে শাখাগত রচনায় হাত দেওয়ার মতো সময় ও সুযোগ আপাতত আমার

নেই। শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণ যদি এই গ্রন্থ পাঠের পর সামগ্রিক বিষয়গুলোর শাখাগত আলোচনায় আগ্রহী থাকেন, তাহলে অধ্যয়ন করতে পারেন সামসময়িক চিকিৎসাবিদ আবু মারওয়ান ইবনে যুহর রচিত *আত-তাইসির* নামক গ্রন্থখানা। আমিই তার কাছে আবেদন করেছিলাম এ বিষয়ে কলম ধরার জন্য। তারই ফল হিসাবে এই মূল্যবান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

বড় কাজ করার ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার গুরুত্ব বুঝে আসে এখান থেকে। এই দলবদ্ধ কাজ করার মানসিকতা থাকলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব আধুনিক যুগে।

চিকিৎসায় ইবনে যুহরের যে অবদান ছিল, তা সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ধারায় আমরা তুলে ধরতে পারি :

১. ইবনে যুহরের বিশ্বাস ছিল, পরীক্ষানিরীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই কেবল সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এর মাধ্যমেই সকল অমূলক তত্ত্ব দূরীভূত হবে।

২. তিনি শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিয়েছিলেন, পুথিগত বিদ্যাকে তারা যেন পরম সত্য হিসাবে গ্রহণ না করে। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই যেন তারা আঁকড়ে ধরে। কারণ এটিই হলো মূল।

৩. গলবিলের প্যারালাইসিসের চিকিৎসা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

৪. বক্ষ বিদারণের প্রক্রিয়াও তিনি বর্ণনা করেছেন সূক্ষ্মভাবে।

৫. জীবাণুজাতীয় রেচকের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর রেচক আবিষ্কারের কৃতিত্ব তারই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে কারও কথাই পরম সত্য নয়, এ ছিল ইবনে যুহরের অন্যতম মূলনীতি। তার গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্থানে গ্যালেনের মতাদর্শের বিরোধিতা থেকেও এই ধারণা স্পষ্ট হয়। বিশেষত শারীরবৃত্তির ক্ষেত্রে। তার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই গ্যালেনের ভ্রান্তি ও তার দর্শনের সামনে লজ্জাজনক নতিস্বীকার থেকে মুক্তি লাভ হয়। গ্যালেনের দর্শনের নেশায় জাতি বুঁদ হয়ে ছিল কয়েক শতাব্দী।[৪৬২]

ইবনে যুহরের অনেক গ্রন্থ লাতিন-সহ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিশেষত তার লেখা *আত-তাইসির* গ্রন্থটি। লাতিন ভাষায় এর অনুবাদ

৪৬২. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩২৯

প্রকাশিত হয়েছে ১৪৯০ সালে। ইউরোপীয় চিকিৎসায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থের বেশ চাহিদা ছিল।

জর্জ সার্টন ইবনে যুহরের প্রশংসায় *আল-মাদখাল ইলা তারিখিল উলুম*-এ বলেন, ইসলামি সাম্রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের বীজ বপনে অনন্য এক নক্ষত্র হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছিল ইবনে যুহরের। সমকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন তিনি।[৪৬৩]

প্রাচীন কাল থেকেই মুসলিমগণ জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারে উদার ছিলেন। তারা কখনো জ্ঞানবিজ্ঞান কুক্ষিগত করে রাখেননি। কোনো জাতি-গোষ্ঠীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। তাদের মূল্যবান গ্রন্থাবলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুসলিমদের প্রতিভা, মাহাত্ম্য ও উদারপন্থা ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে। নিকটবর্তীদের আগে দূরবর্তীরা এর স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইবনে যুহরের রচিত গ্রন্থাবলি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে । বিশেষত *আত-তাইসির* গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল ৮৯৫ হিজরি/১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যায় এর প্রভাবসঞ্চারী অবদান ছিল। খাদ্য ও ওষুধসংক্রান্ত গ্রন্থটিও অনূদিত হয়েছিল। এ ছাড়া তার *আল-ইকতিসাদ* গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ এখনো পাওয়া যায়।

পরিশেষে আমরা এতটুকুই বলতে পারি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইবনে যুহরের অবদান সংরক্ষিত আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তার অধিকাংশ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণ এখনো বিদ্যমান।

একসময় মুসলিমদের রাজ্যগুলো ছিল অমুসলিমদের জ্ঞানচর্চার তীর্থভূমি। দূরদূরান্ত থেকে তারা মুসলিমদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসে ধন্য হতো। বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা থেকে মুসলিমদের পশ্চাৎপসরণ এবং অমুসলিমদের উৎকর্ষসত্ত্বেও এই মুসলিম বিজ্ঞানীর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়।

---

৪৬৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৮৩

(১০)

ইয়াকুব আল-কিন্দি : চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ

চিকিৎসা পেশা পৃথিবীর বুকে নিঃসন্দেহে অতি সম্মানের একটি পেশা। কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি মানবজাতির সেবাই এই পেশার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামি সভ্যতার যারা দিকপাল, তাদের অনেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে এগিয়ে এসেছেন। তাদেরই অন্যতম একজন আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি। তিনি ছিলেন চিকিৎসা, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি। চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানে তার রচনাবলি অসংখ্য।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দির জন্ম কুফায়, ১৮৫ হিজরি মোতাবেক ৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যু বাগদাদে ২৬০ হিজরি মোতাবেক ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। বেড়ে উঠেছেন বসরায়। সেখান থেকে একসময় চলে যান বাগদাদে। জ্ঞানের এ দুটি প্রাণকেন্দ্রেই তিনি শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন ।

ইয়াকুব আল-কিন্দির জীবনী অনুসন্ধানে আমরা দেখি, তিনি বেড়ে উঠেছেন সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে। খলিফা মাহদি এবং হারুনুর রশিদের শাসনামলে কুফার শাসক ছিলেন তার পিতা ইসহাক। উল্লেখ্য যে তিনি বিখ্যাত সাহাবি আশআস ইবনে কায়েস রা.-এর বংশধর। ইসলামপূর্বে আশআস ইবনে কায়েস রা. সমগ্র কিন্দা ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন। তার পিতা কায়েস ইবনে মাদিকারিবও সমগ্র কিন্দার শাসক ছিলেন।

সমকালীন শাসকদের সঙ্গে ইয়াকুব আল-কিন্দির সুসম্পর্ক ছিল। খলিফা মামুন, মুতাসিম, আহমাদ মুতাওয়াক্কিল প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল তার ঘনিষ্ঠতা। প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে রাজপ্রাসাদে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। তাকে চিকিৎসা আর কর উসুলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন তিনি এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন।

খলিফাগণ তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কেবল তার জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধিতে মুগ্ধ হয়ে। চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তিনি অনেক গ্রন্থ লিখেছেন।

বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদেও তার হাতযশ ছিল খুব। গ্রিক গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টলেমির *আল-মাজেস্ট*, গ্যালেনের *আল-*

আদভিয়াতুল মুফরাদা তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বিদেশি গ্রন্থ অনুবাদে তিনি বেশ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে তার লেখা পর্যালোচনা করে বলা যায়, দর্শন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকপাল যেমন জাহরাবি, ইবনে যুহর প্রমুখের তুলনায় তার রচনার মূল্যমান কোনো অংশেই কম নয়। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- *কিতাবুত তিব্বিল বুকরাতি* (হিপোক্রেটিসের মেডিসিন গ্রন্থ)।
- *আল-গিযা ওয়াদ দাওয়ায়িল মুহলিক* (ধ্বংসাত্মক খাদ্য ও ওষুধ)
- *আল-আবখারাতিল মুসলিহা লিল জাও মিনাল আওবিয়া* (প্লেগ থেকে পরিবেশ রক্ষাকারী ধোঁয়া)
- *আল- আদভিয়াতুল মুশফিয়া মিনার রাওয়াইহিল মুযিয়া* (ক্ষতিকারক গন্ধ দূর করার ওষুধ)
- *কাইফিয়্যাতি ইসহালিল আদভিয়া ওয়া ইনজিযাবিল আখলাত* (ওষুধকে পানীয়করণ ও গুঁড়ো ওষুধ মিশ্রিতকরণ প্রক্রিয়া)
- *ইলমি নাফাসিদ দাম* (রক্তকাশি চিকিৎসা)[৪৬৪]
- *তাদবিরুল আসিহহা* (স্বাস্থ্যের যত্ন)
- *কাইফিয়্যাতুদ দিমাগ* (মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি)
- *ইল্লাতুল জুযাম ওয়া আশফিয়াতুহু* (কুষ্ঠরোগের কারণ ও নিয়াময়)
- *ওয়াজউল মাইদা* (পেটব্যথা)
- *ইলাজুত তিহাল* (প্লিহা চিকিৎসা)
- *আল-হিলা লি দাফয়িল আহযান* (ব্যথা থেকে মুক্তির উপায়)

---

৪৬৪. **রক্তকাশি বা হিমপ্টিসিস (Hemoptysis)** : এটি হলো ক্লোম-শাখা বা ব্রংকাস, স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালি অথবা ফুসফুস থেকে কাশির সাথে রক্ত বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া। ফুসফুসের ক্যান্সার, সংক্রমণ যেমন যক্ষ্মা, ব্রংকাইটিস অথবা নিউমোনিয়া ও কিছু হৃৎপিণ্ডের রোগে এটা হতে পারে। রক্তকাশি হতে পারে অল্প, কেবল কফের সাথে উজ্জ্বল রক্তের দাগযুক্ত, অথবা ব্যাপক। ব্যাপক রক্তকাশি বলতে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত পক্ষে ৬০০ মি. লি. রক্তক্ষরণকে বোঝায় যা ৩ থেকে ১০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

- *জাওয়ামিউ কিতাবিল আদভিয়াতিল মুফরাদা লি জালিনুস* (গ্যালেনের *বুক অব সিংগেল মেডিসিনের* অনুবাদ)
- *আল-ইবানা আন মানফাআতিত তিব* (ওষুধের উপকারিতার বর্ণনা) ইত্যাদি।[৪৬৫]

ইয়াকুব আল-কিন্দির অবদান তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনন্য ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণ করে। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রেই তিনি রচনা করেছেন বিশের অধিক নিবন্ধ ও বই। আর সকল শাস্ত্রে তার ছোট-বড় প্রায় হাজারখানেকের ওপরে বই আছে। এগুলো রচনায় সাহায্য নেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে এরিস্টটল থেকে। মুসলিম সভ্যতায় তিনি 'ফাইলাসুফ আল-আরব' তথা আরব সভ্যতার দার্শনিক নামে খ্যাত।[৪৬৬]

আল-কিন্দির এত বিস্তৃত জ্ঞান ও লেখালেখি দেখে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা আল-কিন্দি এসেছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ যুগে। সে যুগের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এবং সাহিত্যসম্ভারের প্রাসাদ বিনির্মাণে শাসকদের আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। বিদেশি ভাষার গ্রন্থাবলি অনুবাদ ও অনুবাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞানবিজ্ঞানের দরজা মুসলিমদের সামনে খুলে যায়। তারা সেসব অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত হন। তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। মুসলিম গবেষকগণ আরও নতুন নতুন বিষয় এতে সংযুক্ত করেন এবং জ্ঞানের বিকাশে কালজয়ী ভূমিকা রাখেন।

ইসলামি সভ্যতায় আল-কিন্দির সমকক্ষ আরও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব আছেন। যেমন ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ। তারা দর্শনের পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রেও অভূতপূর্ব কল্যাণসাধন করেছেন।

চিকিৎসার চর্চায় আল-কিন্দি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। চিকিৎসকদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, ডাক্তাররা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে বিপদের মুখে না ফেলে। কেননা প্রাণের কোনো বিকল্প নেই। আর চিকিৎসককে সাধুবাদ জানানো উচিত যে তার কল্যাণে রোগমুক্তি ঘটেছে। চিকিৎসককে অন্যায় দোষারোপ করা উচিত নয়। বিজ্ঞজন সর্বদা মনে করেন

---

৪৬৫. *কাওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৩-১৮৪

৪৬৬. *ফাজায়েলু মিশর আল-মাহরুসা লি ইবনি কিন্দি*, ১/৪

এখনো তার অনেক জ্ঞান শেখা বাকি আছে। তাই অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বিনয়ী থাকেন। পক্ষান্তরে মূর্খ ব্যক্তি নিজেকে মহাজ্ঞানী মনে করে সকলকে অবজ্ঞা করে। ফলে মানুষ তাকে অপছন্দ করে।[৪৬৭]

এই উপদেশ থেকে আল-কিন্দির বিনয় ও প্রজ্ঞা উপলব্ধি করা যায় যে, রোগীর সাথে ডাক্তার যেন দাম্ভিক আচরণ না করেন। বরং তিনি যেন আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন। ডাক্তার যেমন সাধুবাদ শুনতে পছন্দ করেন তেমনইভাবে দোষের শিকার হওয়া থেকেও যেন বেঁচে থাকেন।

আল-কিন্দি তার পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন ইবনে আবি উসাইবিয়া তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আল-কিন্দি বলেন, বৎস, পিতা হলেন হর্তাকর্তা। ভাই ফাঁদ। চাচা কষ্টের কারণ। মামা বিপদ। পুত্র দুঃখ নিয়ে আসে। আত্মীয়স্বজন বিচ্ছুর মতো। 'না' বললে আপদ দূর হয়। 'হ্যাঁ' বললে শান্তি চলে যায়। গানবাজনা মৃত্যু ডেকে আনে। গান মানুষকে নেশায় ফেলে দেয়। গানবাজনার জন্য সে ইচ্ছামতো খরচ করে আর অপচয়ের দিকে পা বাড়ায়। ফলে সর্বস্ব হারিয়ে দুর্দশায় পতিত হয়। একপর্যায়ে অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। স্বর্ণমুদ্রা উত্তপ্ত গোলা; ব্যয় করলে এটি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। রৌপ্যমুদ্রা সংরক্ষণ করো; বের করলে এটি পালিয়ে যায়। মানুষ নির্বোধ। তাদের থেকে ভালোটা গ্রহণ করো এবং নিজের সুকুমারবৃত্তি বিকাশ করো। যে মিথ্যা শপথ করে তার কথায় কান দিয়ো না। মিথ্যা শপথের পাপে সে নিঃস্ব হয়ে যাবে।[৪৬৮]

ইবনে আবি উসাইবিয়া এই ঘটনা উল্লেখের পর ইবনে নাদিমের মন্তব্য তুলে ধরেছেন। *ফিহরিসত* গ্রন্থের লেখক ইবনে নাদিম আল-কিন্দি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি নাকি কৃপণ ছিলেন।

কিন্তু আমরা বলব, এই উপদেশ থেকে আল-কিন্দির জীবনদর্শন ও কঠিন বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। প্রতিটি কথাই ক্ষেত্রবিশেষে সত্য। পিতা হর্তাকর্তাই হয়ে থাকেন। কারণ তিনি পরিবারের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভাই ভাইয়ের মরণফাঁদ হয়ে ওঠে, যখন তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, চক্রান্তের জাল বোনে। চাচা কষ্টের

---

৪৬৭. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/১৯২

৪৬৮. প্রাগুক্ত

কারণ, যখন ভাতিজার সম্পদে তার লোভের দৃষ্টি পড়ে। এভাবেই একের পর এক দর্শন বর্ণনা করে গিয়েছেন আল-কিন্দি। কোনো কথাই তার কৃপণতার প্রমাণ নয়। বেশির চেয়ে বেশি বলা যায়, এখানে তার কঠোর সতর্কতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তা ছাড়া তিনি নিজের পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তো চূড়ান্ত সতর্কতা কাম্য। তা ছাড়া তার এই অসিয়তটি বেশ প্রসিদ্ধ। এটাকে সবাই স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। একমাত্র ইবনে নাদিম ছাড়া কেউ সমালোচনা করেনি।

আল-কিন্দির আরও কিছু বাণী আছে। জহিরুদ্দিন বাইহাকি সেগুলো তুলে ধরেছেন *তারিখু হুকামাইল ইসলাম* (ইসলামের দার্শনিকদের ইতিহাস) গ্রন্থে। তিনি বলেন,

- মন্দ থেকে দূরে থাকো। কারণ মন্দ হলো মন্দ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।
- যাকে ইচ্ছা তাকে অনুসরণ করো, কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। সম্পদে প্রতারিত হয়ো না, যদিও তা রাশি রাশি হয়।
- কোনো মিথ্যুকের কাছে অভাবের কথা বলো না। মিথ্যুক ব্যক্তি প্রয়োজন তো পূরণ করবেই না, বরং অভাব আরও বাড়িয়ে দেবে।[৪৬৯]
- আল-কিন্দি ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মহাসাগর। অনেক শাস্ত্রের পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয়। দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা আল-কিন্দির রচিত গ্রন্থাবলি তার অনন্যতা ও সৃজনশীলতার উজ্জ্বল সাক্ষী।

(১১)
আম্মার মাওসিলি : চক্ষুচিকিৎসার অগ্রপথিক

আম্মার মাওসিলি মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায় হাজার বছর আগে। তবে এখনো তার নাম উচ্চারিত হয় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুই শতক আগেও তার গ্রন্থাবলি পঠিত হয়েছে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়।

পূর্ণ নাম আবুল কাসেম আম্মার ইবনে আলি মাওসিলি। জন্ম মাওসিল শহরে। এজন্যই তাকে বলা হয় মাওসিলি। শহরের বড় বড় পণ্ডিত আর জ্ঞানীদের

৪৬৯. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৪

হাতে তার প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ। পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন চক্ষুচিকিৎসায়।[৪৭০]

চক্ষুচিকিৎসায় তিনি দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। সে যুগে আরবি ভাষায় চক্ষুচিকিৎসককে বলা হতো 'কাহহাল'। চক্ষুচিকিৎসক হওয়ার জন্য চোখের অ্যানাটমি, চোখের বিভিন্ন রোগ, রোগের কারণ, উপসর্গ, রোগের প্রতিকার, ওষুধ তৈরি ও চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে থাকতে হতো বিস্তৃত জ্ঞান। আম্মার মাওসিলি এসব ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা অর্জন করেছিলেন।[৪৭১]

চক্ষুচিকিৎসক হিসাবে তার খ্যাতি ঘটে কায়রোর ফাতেমি খলিফা হাকিম বি-আমরিল্লাহর (৯৯৬-১০২০ খ্রি.) শাসনামলে। তিনি চক্ষুচিকিৎসায় অভিনব চিকিৎসক হিসাবে সমাদৃত।[৪৭২] চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবি উসাইবিয়া তার ব্যাপারে মন্তব্য করেন—আম্মার মাওসিলি একজন খ্যাতিমান চক্ষুচিকিৎসক। চোখের রোগ ও প্রতিষেধক সম্পর্কে তার বিশেষজ্ঞতা ছিল।[৪৭৩]

আম্মার মাওসিলির উল্লেখযোগ্য অবদান

আম্মার মাওসিলির সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো চক্ষুচিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরতা। চক্ষুচিকিৎসার বিকাশেও তার এই পদ্ধতি অবদান রেখেছে বেশ।[৪৭৪] তার ভূমিকা এতটাই প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে যে, চক্ষুবিজ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়। চক্ষুচিকিৎসার অভিযাত্রায় আম্মার মাওসিলি নক্ষত্র হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রয়াস শিক্ষার্থীদের নক্ষত্রের মতো পথ দেখায়।

চক্ষুচিকিৎসায় আম্মার মাওসিলির আরেকটি বড় অবদান হলো *আল-মুনতাখাব ফি ইলমিল আইন ওয়া ইলালুহা ওয়া মুদাওয়াতুহা বিল আদভিয়াতি ওয়াল হাদিদ* (সংক্ষিপ্ত চক্ষুবিজ্ঞান, চক্ষুরোগ, ওষুধ ও যন্ত্রের মাধ্যমে রোগের প্রতিকার)। গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন হাকিম বি-আমরিল্লাহর অনুরোধে।

---

৪৭০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৭৩

৪৭১. প্রাগুক্ত

৪৭২. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৩০

৪৭৩. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৩৬৮

৪৭৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৭৩

আবুল কাসেম মাওসিলি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ-বিদেশে। জ্ঞানী-গুণীদের সাহচর্য ও সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন। শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানই নয়, বরং অন্যান্য জ্ঞান ও শাস্ত্রের অনুসন্ধানেও সফর করেছেন। বিশেষত চক্ষুবিজ্ঞানে মুসলিম ও আরব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

দেশে-বিদেশে সফরের মধ্য দিয়ে চক্ষুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতার কথা জনমুখে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি চক্ষুচিকিৎসক হিসাবে কাজ করেছেন মাওসিল, খোরাসান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মক্কা, মদিনা, মিশর-সহ বিভিন্ন শহরে।

মিশরে অবস্থানকালে তিনি প্রচুর পরিমাণে শল্যচিকিৎসা পরিচালনা করেছেন। মিশরের চিকিৎসকদের সঙ্গে ওঠাবসার কারণে অভিজ্ঞতাও হয়েছিল প্রচুর। বলা যায় এজন্যই তিনি *আল-মুনতাখাব ফি ইলমিল আইন* রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন হাকিম বি-আমরিল্লাহর অনুরোধে। পরবর্তী সময়ে তা পরিণত হয়েছে গবেষক এবং চক্ষুবিদ্যার শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্পহীন প্রামাণ্য গ্রন্থে।[৪৭৫]

চোখের অ্যানাটমি ও ফিজিয়োলজি নিয়ে ২১টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি রচিত। চোখের ৫১টি রোগ, রোগের উপসর্গ, কারণ, মেডিসিন ও সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসাপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় কিছু অভূতপূর্ব প্রস্তাবনা ও মতামত, যাকে আমরা ইলহাম বলতে পারি। কেননা ইতিপূর্বে কেউ এমন সূক্ষ্ম চিন্তা করেনি। এ ছাড়া *মুনতাখাব* গ্রন্থে চোখের রোগের উপসর্গ, লক্ষণ নিয়ে এমন অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, যা গ্রিক চিকিৎসকগণ বলে যাননি।

গ্রন্থটিতে তিনি চোখের ছানি পাকার আগে শল্যচিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। রোগী যখন বিভিন্ন রং নির্ণয় করার শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন বুঝতে হবে, তার ছানি পেকে গেছে। ছানি রোগ ও চিকিৎসার প্রক্রিয়া তিনি বর্ণনা করেছেন বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে। এটি তার শ্রেষ্ঠ অবদান। ছিদ্রহীন 'মিকদাহ' যন্ত্র ব্যবহার করে ছানি অপসারণ পদ্ধতি এবং ফাঁপা ছিদ্রযুক্ত 'মিকদাহ' যন্ত্র ব্যবহার করে ছানি অপসারণ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন মাওসিলি।

---

৪৭৫. প্রাগুক্ত

ফাঁপা ছিদ্রযুক্ত 'মিকদাহ' নামক যন্ত্র উদ্ভাবনের কৃতিত্ব আম্মার মাওসিলিকে দেওয়া হয়। তবে ইনসাফের কথা হলো, তিনি নন, বরং প্রথম এটি উদ্ভাবন করেছিলেন খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিক চিকিৎসক অ্যান্টিলিওস। তবে তিনি কাচের তৈরি 'মিকদাহ' ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে মাওসিলির 'মিকদাহ' ছিল ধাতুর তৈরি। এটাই ছিল দুজনের মিকদাহের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য। অস্ত্রোপচারের সময় ধাতুর যন্ত্র ভেঙে গিয়ে অঙ্গহানি হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই।

আম্মার মাওসিলি বিভিন্ন কৌশলে দক্ষতার সাথে অধিকহারে 'মিকদাহ' যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন। অস্ত্রোপচারকালে লব্ধ নতুন ও আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করতেন, যেমনটি সাধারণত করে থাকেন ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

চিকিৎসাক্ষেত্রে মাওসিলির রয়েছে বিভিন্ন অবদান। চোখের ছানি সার্জারির নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক তিনি, ইতিপূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না। ব্যাবিলনীয়রা চোখের ছানি অপসারণ করতে সুচালো যন্ত্রের মাধ্যমে তা চোখের মণির ওপর থেকে সরিয়ে দিত। চোখের মণির ওপর থেকে ছানি সরে যাওয়ার ফলে অন্ধ ব্যক্তির চোখে আলো প্রবেশ করতে পারত। ফলে সে দেখতে পেত। তবে ছানি চোখের ভিতরেই রয়ে যেত।[৪৭৬] ছানি চিকিৎসার এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়। কালক্রমে তারা এর বিকাশ ঘটিয়েছে এবং উৎকর্ষ সাধন করেছে। কিংবদন্তি চিকিৎসক আবু বকর রাযি উল্লেখ করেছেন, চোখের আইরিসের একটা অংশ কেটে ছানি অপসারণ করা সম্ভব। ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রে পিউপিল প্রসারিত করার জন্য আধুনিক সার্জারির প্রথম ধাপই হলো আইরিডেক্টোমি[৪৭৭]।

---

৪৭৬. জনশ্রুতি আছে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন বিখ্যাত চিকিৎসক সুশ্রুত প্রথম ছানি চিকিৎসা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, যাদের চোখ ভালো তাদের চোখের মণি কালো। আর যাদের চোখ অন্ধ তাদের মণি সাদা আবরণে ঢাকা। তাই তিনি এক অন্ধ লোকের চোখে একটা পিন কর্নিয়ার পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে সাদা জিনিসটা খোঁচা মারেন। খোঁচা খেয়ে সেটি চোখের ভিতরেই নিচের দিকে পড়ে যায়। এতে বেশ কিছু আলো মণি দিয়ে প্রবেশ করে রেটিনায় পড়ে। অন্ধ লোকটি সাথে সাথে দেখতে পায়!
মূলত লেন্সটি চোখের ভেতরে সুন্দরভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এটি নরম। পিনের খোঁচায় লেন্সটি নিচের দিকে পড়ে যায়। ফলে ওপর দিকের সামান্য ফাঁক দিয়ে আলো ঢোকে। তাই রোগী কিছুটা দেখতে পায়।-অনুবাদক

৪৭৭. **আইরিডেক্টোমি :** আইরিসের অংশের অস্ত্রোপচার।

আম্মার মাওসিলি এসে চোখের ছানি চিকিৎসার প্রাচীন পদ্ধতি বদলে দিলেন। চোখের ছানি বের করতে ব্যবহার করলেন সূক্ষ্ম কাচের টিউব। এটি চোখে ঢুকিয়ে ঘোলাটে লেন্স ছিন্নভিন্ন করে তা চুষে বের করে আনেন। যুগের বিচারে এটি ছিল সর্বাধুনিক ছানি অপারেশন, বর্তমান যুগের সাথেও এর সামঞ্জস্য রয়েছে। তবে বর্তমান যুগে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।

প্রাচ্যে তার এই চিকিৎসাপদ্ধতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যে তখনও পৌঁছেনি পদ্ধতিটি। পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের পার্সওয়াল বুথ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে।[৪৭৮]

আবুল কাসেম আম্মার মাওসিলি ছিলেন মধ্যযুগের আরব সভ্যতার এক অনন্য নক্ষত্র। চক্ষুবিদ্যায় তার অবদান ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। *আল-মুনতাখাব ফি ইলমিল আইন* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বরণীয় হয়ে থাকবেন। চক্ষুবিজ্ঞানের গবেষক ও শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থের কাছে চিরঋণী। গ্রন্থটি আরবি থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছেন ডেভিড হারমানাস।[৪৭৯] এটি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৮০]

(১২)

আলি ইবনে আব্বাস মাজুসি : চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকপাল

দীর্ঘস্থায়ী ও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন আলি ইবনে আব্বাস মাজুসি[৪৮১]। তিনি এমন চিকিৎসক ছিলেন না যারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় অথবা যাদের কেবল তাত্ত্বিক কিংবা ব্যবহারিক জ্ঞান রয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত সকল তত্ত্ব ছিল তার নখদর্পণে। চিকিৎসার তাত্ত্বিক জ্ঞান তার যতটুকু ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল প্রায়োগিক জ্ঞান। বিষয়টি তাকে সমকালে এবং পরবর্তীকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রেখেছে। তার সমপর্যায়ের ব্যতিক্রমধর্মী চিকিৎসকের এমন বিস্তৃত তাত্ত্বিক জানাশোনা থাকতে পারে। তবে পরীক্ষা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে চিকিৎসার

---

৪৭৮. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৭৪-২৭৫

৪৭৯. প্রাগুক্ত, ২৭৫

৪৮০. *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন : তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, পৃ. ৮১

৪৮১. মাজুসি : অর্থ অগ্নিপূজারি। অগ্নিপূজার কারণে আলি ইবনে আব্বাসকে মাজুসি বলা হয় না, বরং তার পূর্বপুরুষদের কেউ অগ্নিউপাসক ছিল বলে তাকে মাজুসি বলা হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific method) অনুসরণের ক্ষেত্রে আলি মাজুসির সমতুল্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তত্ত্বকে কতটা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করা যায়, সেটার কিমিয়া তার জানা ছিল।

ঐতিহাসিক কিফতি চিকিৎসাশাস্ত্রে আলি ইবনে আব্বাসের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, আলি ইবনে আব্বাস মাজুসি ইতিহাসের বরিত পারসীয় চিকিৎসক। পরিচিতি লাভ করেন ইবনে মাজুসি নামে। ইবনে মাহের নামে জনৈক পারসিক জ্ঞানবৃদ্ধের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর পড়াশোনা করে পূর্ববর্তীদের লেখালেখির সাথে পরিচিত হয়েছেন। শাসক আদুদুদ্দাওলা ফানাখসার ইবনে বুয়াইহ-এর অনুরোধে রচনা করেছেন চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ *মালাকি*। এটি মূল্যবান একটি গ্রন্থ। এতে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান।[৪৮২]

তার জন্মসন নিশ্চিত জানা যায় না। জন্মগ্রহণ করেছেন আহওয়াজ প্রদেশে, বর্তমান ইরানের পূর্বদিকে। কয়েকজন জীবনীকার উল্লেখ করেছেন, ৩৮৪ হিজরি/৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন।[৪৮৩] কেউ বলেন, এই সালেই তার মৃত্যু হয়েছে।[৪৮৪] আবার কেউ বলেছেন, তার মৃত্যু ৪০০ হিজরি/১০১০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে।[৪৮৫]

মালাকি গ্রন্থের পূর্ণ নাম *কামিলুস সিনাআতিত তিব্বিয়্যা* (পূর্ণ চিকিৎসাবিজ্ঞান)। নিঃসন্দেহে এটি তার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইবনে আবি উসাইবিয়া বলেন, শাসক আদুদুদ্দাওলা ফানাখসার ইবনে রুকনুদ্দৌলা আবু আলি হাসান ইবনে বুয়াইহ দাইলামির অনুরোধে রচনা করেছেন গ্রন্থটি। অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এখানে আছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখাগত জ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ।[৪৮৬]

কিফতি এই গ্রন্থের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, প্রকাশিত হওয়ার পরপরই গ্রন্থটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। ইবনে সিনার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-কানুন* প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ এই গ্রন্থের পঠনপাঠনে ডুবে ছিল। *আল-কানুন* প্রকাশিত হলে মানুষ *আল-কানুন*-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

---

৪৮২. *তারিখুল হুকামা লি কিফতি*, পৃ. ১৫৫-১৫৬
৪৮৩. *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ৭/১১৬
৪৮৪. *কাশফুয যুনুন*, ২/১৩৮০
৪৮৫. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৪/২৯৭
৪৮৬. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/২২৩

মালাকি থেকে কিছুটা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে প্রায়োগিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে *মালাকি* অনবদ্য। কিন্তু তাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে *আল-কানুন* অধিক প্রামাণ্য।[৪৮৭]

কিফতির শেষ মন্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর মাধ্যমে *মালাকি* গ্রন্থের বিষয়গত ও প্রায়োগিক গুরুত্ব ফুটে ওঠে। তা ছাড়া *মালাকি* গ্রন্থটি ইবনে সিনার *আল-কানুন* থেকে ভিন্ন। কেননা এই গ্রন্থের লেখক কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। সেগুলোকে প্রায়োগিক বাস্তবতার মধ্যে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম ও দ্বিতীয় নিবন্ধে চমৎকারভাবে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা আলোচনা করা হয়েছে। তাইতো ইতালির সালেরনো মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল তা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।[৪৮৮]

মালাকি গ্রন্থটি পূর্ণ দুটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতিটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে ১০টি করে নিবন্ধ। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়গুলো ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধরন ও স্বভাব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবন্ধে আছে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা। চতুর্থ নিবন্ধে আছে শক্তি, ক্রিয়া ও প্রাণের আলোচনা। পঞ্চম নিবন্ধে আছে এমনসব বিষয়, যেগুলো প্রাকৃতিক নয়। ষষ্ঠ নিবন্ধে বিভিন্ন রোগ ও রোগের উপসর্গ, সপ্তম নিবন্ধে রোগ ও রোগের কারণ এবং অষ্টম নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক রোগ, রোগের কারণ ও উপসর্গ নিয়ে। আর নবম নিবন্ধটি সাজানো হয়েছে রোগের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম নিবন্ধ : গণস্বাস্থ্য। দ্বিতীয় নিবন্ধ : ওষুধ ও প্রতিষেধক। তৃতীয় থেকে অষ্টম নিবন্ধ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধন প্রক্রিয়া। নবম নিবন্ধে আছে সার্জারির আলোচনা। দশম নিবন্ধে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তেল, খামির, পানীয়, সুরমা বানানোর নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে।[৪৮৯]

মালাকি গ্রন্থে আলি ইবনে আব্বাস পেশাদারির সাথে পূর্ববর্তীদের গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রিকদের রচনার ভুলগুলো

৪৮৭. *আখবারুল উলামা লিল কিফতি*, পৃ. ১৫৬
৪৮৮. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১১৭
৪৮৯. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪৬-২৪৭

ধরিয়ে দিয়েছেন। তার নিরীক্ষা এবং সমীক্ষা ছিল সপ্রমাণ, যা কেবল পূর্ববর্তীদের ভুল ধরেই ক্ষান্ত হয়নি বরং জ্ঞানগত বিশুদ্ধতা ও যৌক্তিক বিবেচনায় তা বোদ্ধামহলে সাড়া ফেলে। আলি ইবনে আব্বাসের অসামান্য দক্ষতা প্রমাণ করে তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু মেধার অধিকারী। তিনি যা-কিছু পড়েছেন যাচাই-বাছাই করেই পড়েছেন। একইসাথে প্রমাণিত হয় চিকিৎসাশাস্ত্রে তার জ্ঞানগভীরতা ও সুউচ্চ অবস্থান। এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে। *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*-এ আলি ইবনে আব্বাসের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। আলি ইবনে আব্বাস বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখার জন্য অপরিহার্য বিষয় সমন্বিত প্রাচীন কিংবা সমকালীন চিকিৎসকদের পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ আমি খুঁজে পাইনি। হিপোক্রেটিসের লেখা হয় সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ কথাই অস্পষ্ট, ব্যাখ্যা ছাড়া বোঝা দুষ্কর। গ্যালেন প্রচুর বই লিখেছেন। কিন্তু প্রতিটি বইয়ে চিকিৎসার মাত্র একটি শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ আলোচনা, প্রচুর পুনরাবৃত্তি। তার একটি গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পাঠযোগ্য না। কিন্তু আমার গ্রন্থে সামগ্রিকতা আনার চেষ্টা করেছি। সুস্থতা, রোগ-ব্যাধি ও প্রতিকার এবং চিকিৎসকের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আমি সাবলীল আলোচনা করেছি।[৪৯০]

সিগরিড হুংকে তার গ্রন্থে আলি ইবনে আব্বাসের জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানও তুলে ধরেছেন। পূর্বের গ্রিক ও আরব চিকিৎসকদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য কোথায়, সেটাও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, শিশু মায়ের পেটে নিজে নিজেই নড়াচড়া করে। নিজের শক্তিতেই সে ধীরে ধীরে জরায়ু দিয়ে বের হতে পারে। কিন্তু আলি ইবনে আব্বাস এসে প্রথম বলেন, মাতৃ-উদরের স্পন্দনশক্তি আছে। যা ভ্রূণের বিকাশ ও বের করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সন্তান ভূমিষ্ঠের সময় মাতৃ-উদরের পেশিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়।[৪৯১] সিগরিড হুংকে বোঝাতে চাইলেন যে, আলি ইবনে আব্বাস মাজুসি সন্তান ভূমিষ্ঠের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের ধারণা ভেঙে দেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, শিশু মাতৃগর্ভ থেকে আপনা-আপনি বের হতে পারে না বরং জরায়ুর পেশি সংকুচিত হয়ে শিশুকে জরায়ুমুখে ঠেলে দেয়।

---

৪৯০. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ২৮৪-২৮৫

৪৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

আলি ইবনে আব্বাস জরায়ু থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠকারী পেশি, জরায়ুর গঠন, উদরের ক্যান্সার নিয়েও লিখেছেন। লিখেছেন মানুষের পেট ও পাকস্থলীর বিভিন্ন রোগ নিয়ে। আলি ইবনে আব্বাস তার *মালাকি* গ্রন্থে বলেন, যারা সফল চিকিৎসক হতে চায়, তাদের হাসপাতালের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।[৪৯২]

সম্ভবত আলি ইবনে আব্বাসই প্রথম ধমনি ও শিরার সম্পর্ক বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন, যেমনটি উল্লেখ করেছেন ড. আমের নাজ্জার। এখানে কৈশিক নালির উপস্থিতির স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তা ছাড়া তার *মালাকি* গ্রন্থে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া আছে, যা আমাদের যুগে খুব সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু সে যুগের তুলনায় তা ছিল অসাধারণ।[৪৯৩]

ফিলিপ হিট্টি জোরালোভাবে আলি ইবনে আব্বাসের যুগে তার চিকিৎসাগত নেতৃত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন তার লিখিত গ্রন্থের মর্যাদা। তিনি বলেন, অসাধারণ একটি গ্রন্থ। এতে আছে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান ও প্রয়োগ। এর মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে আলোচিত অধ্যায়টি সর্বশ্রেষ্ঠ।[৪৯৪]

চিকিৎসাশাস্ত্রে আলি ইবনে আব্বাসের কিছু মূলনীতি ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ বিস্ময়ের সাথে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো :

- রোগীর সুস্থতার প্রতি লক্ষ রেখে চিকিৎসা করা। এমন যেন না হয় যে চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগী আগের চেয়ে অধিক অসুস্থ হয়ে যায়। কেননা প্রতিষেধনের চেয়ে প্রতিরক্ষা শ্রেয়।
- রোগীকে প্রথমে চিকিৎসা করতে হবে পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে। এতে সুস্থ না হলে ওষুধ প্রয়োগ করবে।
- প্রথমেই এন্টিবায়োটিক ও শক্তিশালী ওষুধ না দিয়ে স্বল্পমাত্রার ওষুধ দেওয়া।
- অজ্ঞাত ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

---

৪৯২. *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১১৯

৪৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪৯৪. ফিলিপ হিট্টি, *তারিখুল আরব*, ২/৬৮৫

- শিরার স্পন্দন কখনো ভুল তথ্য দেয় না। বাহ্যিক স্পন্দন দ্বারা সে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের জানান দেয়।
- হৃৎপিণ্ড ও রগ একসাথে একই সময়ে স্পন্দিত হয়।
- ফুসফুসের কারণে যে যক্ষ্মা হয়, সেটা নিরাময়ের জটিলতার কথা তিনিই প্রথম তুলে ধরেছেন।
- প্রস্রাবের রাস্তা আটকে গেলে বিশেষ একধরনের নরম টিউব ব্যবহার করে চিকিৎসার কথা বলেছেন তিনি।
- লিম্ফনোড[৪৯৫]-এর চিকিৎসা করেছেন তিনি সফলভাবে।
- তিনি অ্যানিউরিজম[৪৯৬]-এর শল্যচিকিৎসা করতে সক্ষম হয়েছেন।
- হাড়ের স্থানচ্যুতি ও ভাঙা হাড় যথাস্থানে স্থাপনের বিবরণ তিনি দিয়েছেন।
- টনসিলের চিকিৎসা বর্ণনা করেছেন।
- চিকিৎসাপেশায় রীতিনীতি ও নৈতিকতা অবলম্বন করা।
- বহু মানুষ তার একটি কথা বর্ণনা করেছে। তিনি বলতেন—চিকিৎসক, রোগী আর রোগ, এই তিনের মধ্যে আছে বোঝাপড়া। রোগী যখন চিকিৎসকের কথা মেনে চলে আর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকে তখন রোগী আর চিকিৎসক দুজনে মিলে এক রোগের বিরুদ্ধে একত্রে প্রতিরোধ করতে থাকে। দুইয়ের মোকাবিলায় এক পরাজিত হয়ে যায়। যদি রোগী চিকিৎসকের কথায় কান না দেয়, নিজের মনমতো চলতে থাকে, তখন রোগ আর রোগী একত্রে প্রতিরোধে লিপ্ত হয় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। আর দুইয়ের মোকাবিলায় এক (চিকিৎসক) পরাজিত হয়ে যায়।

---

৪৯৫. **লিম্ফনোড :** একটি ডিম্বাশয় বা কিডনি আকৃতির অঙ্গ। এটি লসিকাতন্ত্রের এবং অভিযোজিত রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গ। লিম্ফনোডগুলো সারা শরীরজুড়ে বিস্তৃতভাবে উপস্থিত থাকে এবং লসিকানালির মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে সংবহনতন্ত্রের অংশ হিসাবে কাজ করে। এতে বি এবং টি লিম্ফোসাইট বেশি থাকে এবং অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকায়ও থাকে। লিম্ফ নোডগুলো বাইরের কণা এবং ক্যান্সারের কোষগুলোর জন্য ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, রোগপ্রতিরোধক ব্যবস্থাটির সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাদের একটি ডিটক্সিফিকেশন কাজ করে না।

৪৯৬. **অ্যানিউরিজম (aneurysm) :** এটি হচ্ছে রক্তবাহিকার বাইরের দিকে ফুলে ওঠা একটি বিশেষ অবস্থা যা একটি বুদ্‌বুদ বা বেলুনের সাথে তুলনা করা যায় যা রক্তবাহিকার নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অস্বাভাবিকতা ও দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়।

- তিনি চিকিৎসকদের উপদেশ দিয়ে বলেন, চিকিৎসকদের উদ্দেশ্য যেন সম্পদ উপার্জন না হয়। তাদের উদ্দেশ্য হবে মানুষের সেবা করা এবং আল্লাহর প্রতিদান লাভ করা। তারা কাউকে আত্মহত্যার ওষুধ দেবেন না এবং সে ওষুধের কথা জানাবেনও না। চিকিৎসকগণ নারীদের গর্ভপাতের ওষুধ দেবেন না। চিকিৎসক হবেন মিষ্টভাষী, পবিত্র এবং পাপাচারমুক্ত। খারাপ কাজকর্ম কিংবা নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে দূরে থাকবেন। নারীদের দিকে তাকাতে হলে খারাপ উদ্দেশ্যে তাকাবেন না। কারও গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। দরিদ্রদের প্রতি তারা হবেন দয়াশীল ও সদাচারী।
- রোগীদের যেসব রোগ হয়, সেগুলো চিকিৎসকদের মনে রাখা উচিত।
- রোগীর অবস্থা নিয়ে সহকর্মী ও প্রাজ্ঞ শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে চিকিৎসককে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন তিনি।[৪৯৭]

আরবি থেকে যেসব গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সেগুলোর প্রথম সারিতে রয়েছে *মালাকি* গ্রন্থটি। ইতালির প্রাচীন সালেরনো মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-প্রধান কুসতানতিন ইফ্রিকি (১০২০-১০৮৭ খ্রি.) প্রথম এটি অনুবাদ করেন। তবে দুঃখজনক বিষয় হলো, অনুবাদ করে তিনি এটি নিজের নামে চালিয়ে দেন। গ্রন্থটি পাশ্চাত্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তখনকার প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়বার ৫২১ হিজরি/১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটির অনুবাদ করেন গবেষক ইতিয়ান আনতাকি। তিনি প্রকৃত লেখকের নাম উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। মূলত কুসতানতিন ইফ্রিকির ওপর ইতিয়ান আনতাকির সন্দেহ হয়। কেননা *মালাকি* গ্রন্থের মতো উচ্চতর গবেষণাকর্ম তৈরি করার সক্ষমতা কুসতানতিন ইফ্রিকির নেই। তাই ইতিয়ান আনতাকি মূলকর্ম তল্লাশি করে বের করেন এবং প্রকৃত লেখকের নাম উন্মোচন করে দেন।[৪৯৮]

এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরলাম ইসলাম ও মানবসভ্যতার এক অনন্য নক্ষত্রের জীবনী ও অবদান। মানবসভ্যতায় তার জুড়ি মেলা ভার। আলি ইবনে আব্বাস মাজুসি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন চিকিৎসার প্রায়োগিক ও আদর্শিক অঙ্গনে অন্যতম একজন ব্যক্তি। তার *মালাকি* গ্রন্থের মধ্যে উঠে

---

৪৯৭. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪৮-২৪৯

৪৯৮. প্রাগুক্ত, ২৪৯-২৫০

এসেছে সে যুগের অনেক চিকিৎসাগত সমস্যার সমাধান। মধ্যযুগে ইউরোপেও গ্রন্থটি সাড়া জাগিয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এটি ছিল তাদের চিকিৎসার মৌলিক দলিল।

(১৩)

ইবনে জাযযার কায়রোওয়ানি : চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষক

ইবনে জাযযার চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর অন্যতম দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী। যদি বলা হয় প্রাচীন যুগে পাশ্চাত্যের আরব সভ্যতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও জাতীয় ব্যক্তিত্ব, তাহলে মোটেও ভুল হবে না।

পূর্ণ নাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবু খালেদ কায়রাওয়ানি। জন্ম কায়রাওয়ানে। জন্মসন নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। মৃত্যু ৪০০ হিজরি/১০১০ খ্রিষ্টাব্দে।[৪৯৯] কথিত আছে তিনি স্পেনে কোনো ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন।[৫০০] হাফেজ যাহাবি রহ. তার সম্পর্কে *সিয়ারু আলামিন নুবালা* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, মহান দার্শনিক, চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ফাতেমি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রচুর সম্পদ আর বৈভবের অধিকারী ছিলেন।[৫০১]

ইবনে জাযযার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তার পিতা ও চাচার কাছে। দুজনই ছিলেন দক্ষ চিকিৎসক। তাদের কাছে শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি সমকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ইসহাক ইবনে সুলাইমান ইসরায়েলির[৫০২] নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তার সাহচর্যেই বেড়ে ওঠেন। তার হাতেই

---

৪৯৯. *কাশফুয যুনুন*, ১/৮১

৫০০. *হাদিয়াতুল আরিফিন লিল বাবানি*, ১/৩৭

৫০১. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৫৬১

৫০২. **আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে সুলাইমান ইসরায়েলি :** চিকিৎসক, যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। মিশরে বেড়ে ওঠেন। তারপর কায়রাওয়ানে চলে যান। আফ্রিকার শাসক উবাইদুল্লাহ মাহদির ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন। ১০০ বছরের অধিক হায়াত পেয়েছেন। তিনি ইবনে জাযযার কায়রাওয়ানির শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুবরণ করেন ৩২০ হিজরি/৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ২/২৩৪

গড়ে ওঠেন ইসলামি সভ্যতার পশ্চিম ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান চিকিৎসক হয়ে। তিনিই আমাদের আলোচিত ইবনে জাযযার কায়রাওয়ানি।

চিকিৎসাজীবনের প্রথমদিকে শিক্ষানবিশ অবস্থায় ইবনে জাযযারের হাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি যেমন শিক্ষণীয়, তেমনই দুঃখজনক। ইবনে জাযযারের জীবনের অবসান ঘটতে চলেছিল সেখানে। মাকরিযি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

কোনো এক সফরে বরফবৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঠান্ডার দরুন তিউনিসিয়ার বাদশাহ মানসুর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ফেরার পথে তিনি গোসল করতে চাইলেন। ইবনে জাযযারের গুরু ইসহাক ইবনে সুলাইমান ইসরায়েলি তাকে গোসল করতে বারণ করেন। কিন্তু বাদশাহ তার কথা তো শুনলেনই না, বরং আরও বিরক্ত হলেন। বাদশাহ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। গোসলের ফলে তার দেহের অবশিষ্ট সহজাত তাপটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল। এবার আরও প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন বাদশাহ। অনিদ্রা জেঁকে বসল। ব্যক্তিগত চিকিৎসক ঘুমের কোনো ওষুধ না দিয়ে চিকিৎসা করতে থাকে। কিন্তু অনিদ্রার যন্ত্রণা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঘনিষ্ঠ এক অনুচরকে বললেন, কায়রাওয়ান শহরে ইসহাক ছাড়া আর কোনো চিকিৎসক নেই?

বাদশাহর আদেশ অনুযায়ী তার সামনে উপস্থিত করা হলো এক যুবক চিকিৎসককে। নাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবু খালেদ ইবনে জাযযার। এই যুবক চিকিৎসক চেতনানাশক ওষুধ তৈরি করে বাদশাহকে ঘ্রাণ নিতে বললেন। বাদশাহ ঘুমিয়ে গেলেন। বাদশাহকে যথাযথ ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পেরেছেন ভেবে খুশিমনে ইবনে জাযযার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর বাদশাহর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইসহাক বাদশাহকে দেখতে এলেন। তাকে বলা হলো, বাদশাহ এখন ঘুমাচ্ছেন। ইসহাক বললেন, বাদশাহকে যদি ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তিনি আর বেঁচে নেই। সবাই বাদশাহর কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন বাদশাহ সত্যিই

ইন্তেকাল করেছেন। বাদশাহকে প্রাসাদেই দাফন করা হয়। এরপর বাদশাহর লোকজন ঘুমের ওষুধ প্রস্তুতকারী ইবনে জাযযারকে মেরে ফেলতে চাইল। তখন ইসহাক তার পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ইবনে জাযযারের তো কোনো দোষ নেই। চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ীই সে ওষুধ প্রস্তুত করে দিয়েছে। তবে সে মূল রোগ ধরতে পারেনি। আর তোমরা তাকে তা জানাওনি। এই রোগের চিকিৎসা করছিলাম আমি। বাদশাহর শরীরের সহজাত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল। শরীরের সহজাত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আপনা-আপনিই ঘুম চলে আসত। কিন্তু যখন এমন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে যদ্দ্বারা শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা আরও ঠান্ডা হয়ে যায় তখন বাদশাহকে আর বাঁচানো যায়নি।[৫০৩]

নিঃসন্দেহে এটি ইবনে জাযযারের জন্য অনেক বড় শিক্ষণীয় ঘটনা ছিল। ঘটনাটি তাকে চিকিৎসাশাস্ত্র ভালোভাবে রপ্ত করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এরপরই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিস্তৃত অধ্যয়ন ও পরীক্ষানিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।

ইবনে জাযযারের চিকিৎসাগত জ্ঞানগরিমা, সুউচ্চ নৈতিকতা, অবিরাম অধ্যবসায় সম্পর্কে ইবনে আবি উসাইবিয়া *উয়ুনুল আনবা* গ্রন্থে বলেন, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্র ইবনে জাযযার গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল তার কণ্ঠস্থ। সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও ছিল নখদর্পণে। সুলাইমান ইবনে হাসসান ওরফে ইবনে জুলজুল বলেন, আহমাদ ইবনে আবি খালেদ ইবনে জাযযার বহুমুখী প্রতিভা ও গুণাবলিতে বিস্ময়কর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কায়রাওয়ানে তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ এবং দুনিয়াবিমুখ। জানাজায় অংশগ্রহণ করতেন। বিয়ের মজলিসে যেতেন, তবে সেখানে খাওয়াদাওয়া করতেন না।

আফ্রিকার কোনো ব্যক্তির বাড়িতে বা রাজার দরবারে তিনি যেতেন না। তবে একজনের বাড়িতে তিনি মাঝেমধ্যে যেতেন। তিনি হলেন তার

৫০৩. *ইত্তিয়াজুল হানকা*, পৃ. ২৫

পুরোনো বন্ধু উবাইদি শাসক মাদের চাচা আবু তালেব। তার কাছে যেতে হলে শুধু জুমার দিন যেতেন, অন্যদিন নয়।

প্রত্যেক বছর একবার করে তিনি চলে যেতেন ভূমধ্যসাগরের তীরে। গ্রীষ্মকালটা সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। গ্রীষ্মকাল শেষে ফিরে আসতেন আফ্রিকায়।

ইবনে জাযযার বাড়ির সামনে একটি ঘর বানিয়েছিলেন। সেখানে তার গোলাম রশিককে বসিয়ে রাখতেন। তার সামনেই বিভিন্ন ওষুধপত্র তৈরি করতেন। সকালে নারীরা এসে রশিকের থেকে ওষুধ নিয়ে যেত। তিনি নিজে কোনো নারীর সাথে লেনদেন করতেন না।[৫০৪]

এই ঘটনা ইবনে জাযযারের আল্লাহভীরুতা, চিকিৎসা ও ফার্মাকোলজিতে তার অবদান ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রমাণ দেয়। চিকিৎসক আবু বকর রাযি প্রাচ্যে যেমন সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ইবনে জাযযার তেমনই সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন পশ্চিমের মুসলিম বিশ্বে। তবে রাযি থেকেও তিনি একটি বিষয়ে একধাপ এগিয়ে ছিলেন। তার রোগী দেখার স্থান এবং ওষুধ তৈরির স্থান ছিল ভিন্ন। রোগী দেখতেন বাড়িতে এক বিশেষ কক্ষে আর ওষুধ তৈরির জন্য বাড়ির সামনে ছিল আলাদা ঘর। মাকরিযির বর্ণনা অনুযায়ী এখানেই তার গোলামকে বসিয়ে রাখতেন।

ইবনে জাযযারের চিকিৎসা ও ফার্মাকোলজির বিভাজন কেবল পেশাগত বলয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। একইসাথে তার আদর্শিক অবস্থানও আলাদাভাবে তুলে ধরতে হয়। তিনি ছিলেন নির্লোভ। দরিদ্র ও বিধবা নারীদের থেকে ওষুধের বিনিময়ে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। এজন্য নারীদের তিনি সরাসরি ওষুধ দিতেন না। অথবা তিনি পর্দা রক্ষার জন্য নারীদের সরাসরি ওষুধ দিতেন না। তিনি ওষুধের ব্যবস্থাপত্র গোলামকে দিতেন। গোলাম রশিক ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ নারী রোগীর কাছে পৌঁছে দিত।

---

৫০৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৩২২

ইবনে জাযযার বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থই মূল্যবান, প্রভাবসঞ্চারী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাফেজ যাহাবি রহ. তার কয়েকটি গ্রন্থের কথা তুলে ধরেছেন :

- *যাদুল মুসাফির ফি ইলাজিল আমরাদ* (মুসাফিরের রোগ প্রতিষেধনের পাথেয়)
- *আল-বুগইয়া* (যৌগিক ও অযৌগিক ওষুধসমূহ)
- *আল-উদ্দা*; এটি চিকিৎসাশাস্ত্রে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ।
- *রিসালাতুন নাফস*; এখানে আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ববর্তীদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।
- *তিব্বুল ফুকারা* (দরিদ্রদের জন্য চিকিৎসা)
- অপ্রয়োজনে রক্ত বের করার ক্ষতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ।
- *মহামারির কারণ*; গ্রন্থটি লেখার প্রেক্ষাপট ছিল মিশরের মহামারি এবং এই মহামারি প্রতিরোধে কী করতে হবে, সেটাও তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন।
- *আল-অসুল ইলাল উসুল*; চিকিৎসাশাস্ত্রের ভূমিকা হিসাবে লিখিত।
- *আখবারুদ দাওলা ওয়া যুহুরুল মাহদি বিল মাগরেব*; ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশসংক্রান্ত গ্রন্থ।[৫০৫]

ইবনে জাযযারের প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ নিঃসন্দেহে *যাদুল মুসাফির*। দীর্ঘকাল পর্যন্ত গ্রন্থটি ছিল গবেষকদের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দুই খণ্ডে রচিত গ্রন্থটিতে রয়েছে সাতটি অধ্যায়। লিভার, কিডনি, প্রজনন অঙ্গ, চর্মরোগ, জ্বর, বিষধর পোকার কামড়, বিষ ইত্যাদি-সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার দেওয়া আছে এখানে। বিভিন্ন ওষুধ তৈরির নিয়মকানুনও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০৬]

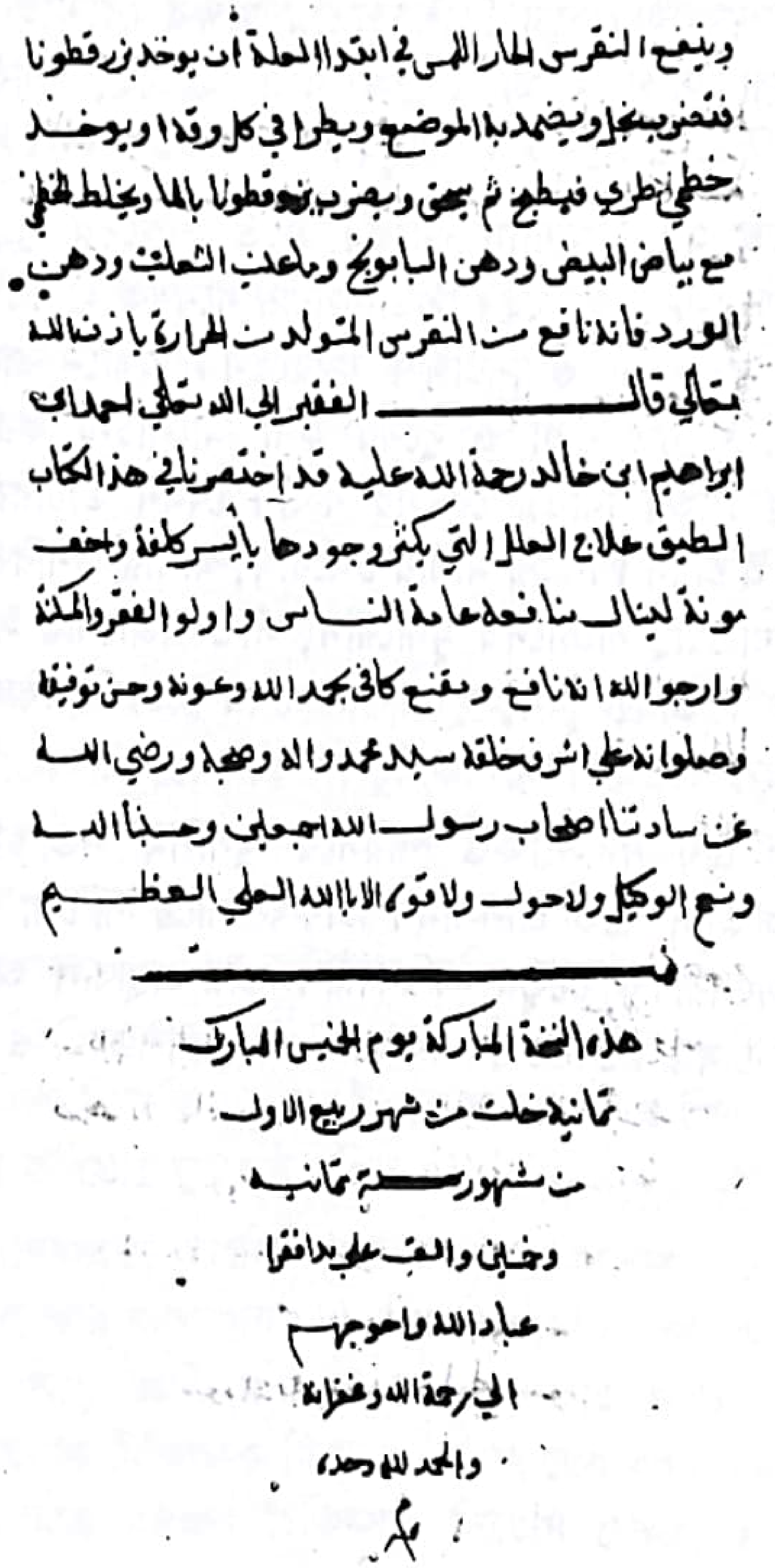
যাদুল মুসাফির গ্রন্থটি লেখা হয়েছে মূলত শহর থেকে দূরদূরান্তের মুসাফির ব্যক্তিদের জন্য, যেখানে কোনো চিকিৎসক পাওয়া দুষ্কর।

---

৫০৫. *তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি*, ২৬/২৪১

৫০৬. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫১-২৫২

তবে এখানে বর্ণিত ওষুধগুলো ছিল ব্যয়বহুল। তাই গ্রন্থটি দরিদ্রদের জন্য উপযোগী ছিল না। এ দিকে লক্ষ রেখেই তিনি রচনা করেছেন *তিব্বুল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন* (দরিদ্রদের জন্য চিকিৎসা) গ্রন্থটি। যেন তারা স্বল্প খরচে হাতের নাগালের ওষুধ জোগাড় করতে পারে।


وينفع النقرس الحار الذي في ابتداء العلة ان يوخذ بزر قطونا
فينقع بخل وينضمد به الموضع ويطرا في كل وقت وا ويوخذ
خطمي طري فيطبخ ثم يسحق ويضرب بزر قطونا بالما ويخلط الخطمي
مع بياض البيض ودهن البابونج ولعاب الثعلب ودهن
الورد فانه نافع من النقرس المتولد من الحرارة باذن الله
تعالى قال ـــــــــــ الفقير الى الله تعالى احمد ابن
ابراهيم ابن خالد رحمة الله عليه قد اختصرنا في هذا الكتاب
اللطيف علاج العلل التي يكثر وجودها بأيسر كلفة واخف
مونة ليناله منفعته عامة الناس واولو الفقر والمسكنة
وارجو الله انه نافع ومقنع كافي بحمد الله وعونه وحسن توفيقه
وصلواته على اشرف خلقه سيدنا محمد واله وصحبه ورضي الله
عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين وحسبنا الله
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

هذه النسخة المباركة يوم الخميس المبارك
ثمانية خلت من شهر ربيع الاول
من شهور سنة ثمانية
وخمسين والف على يد افقر
عباد الله واحوجهم
الى رحمة الله وغفرانه
والحمد لله وحده

চিত্র নং-১৩

ইবনুল জাযযারের রচিত *তিব্বুল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন* গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

বৃদ্ধদের জন্য তিনি লিখেছেন *তিব্বুশ শুয়ুখ ওয়া হিফজু সিহহাতিহিম* (বৃদ্ধদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা)। শিশুদের কথাও তিনি ভুলে যাননি। তাদের জন্য পৃথকভাবে রচনা করেছেন *সিয়াসাতুস সিবয়ান ওয়া তাদবিরুহুম* (শিশুদের চিকিৎসাপদ্ধতি)। শিশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বহুকাল মৌলিক দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইবনে জাযযার এই গ্রন্থে শিশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থে শিশুদের চিকিৎসা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সিংহভাগ আধুনিক শিশুচিকিৎসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৫০৭]

গ্রন্থটিতে ২২টি অধ্যায় আছে। এতে শিশুদের সুস্থতা ও অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিউনিসিয়ার গবেষক হাবিব হাইলা ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ করেছেন। এখানে প্রসূতি মায়ের শারীরিক অবস্থা, খাদ্যতালিকা ও দুধের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে শিশুর বিভিন্ন রোগের কথা। যেমন ডায়রিয়া, কানপাকা, নাভির প্রদাহ ইত্যাদি। শিশুর মাথায় চর্মরোগ, মাথার উপরিভাগ ফুলে যাওয়া, পেট ফুলে যাওয়া, বাচ্চাদের মৃগীরোগ, দাঁত গজানোর সময় ব্যথা, মুখের ঘা, বমি বমি ভাব, কৃমি, মূত্রথলির পাথর ইত্যাদি বিষয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন এতে।[৫০৮]

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মুসলিম সভ্যতার একজন কিংবদন্তি চিকিৎসক সম্পর্কে জানলাম। চিকিৎসাশাস্ত্রে পশ্চিমা সভ্যতায় তিনি আজও প্রভাবসঞ্চারী কৃতিত্বের অধিকারী। তার গ্রন্থাবলি অনূদিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। সেগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের পথিকৃৎ।

---

৫০৭. প্রাগুক্ত, ২৫২

৫০৮. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা* থেকে গৃহীত *মুখতাসারু তারিখিত তিব্বিল আরাবিয়্যি*, পৃ. ২৫২

(১৪)

ইবনে মান্দাওয়াই ইস্পাহানি : বিস্ময়কর প্রতিভা

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে যারা ইসলাম ও মানবজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন ইবনে মান্দাওয়াই। তিনি ছিলেন একজন মহান প্রাজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসক। তবে কীর্তি অনুযায়ী প্রসিদ্ধি জোটেনি তার। এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। অন্যতম একটি কারণ হলো, তিনি ইবনে সিনার (৩৭০-৪২৮ হি./৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) সামসময়িক ছিলেন। বলাবাহুল্য যে, ইবনে সিনার প্রসিদ্ধি তার যুগের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ইবনে মান্দাওয়াইর নাম আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান ইস্পাহানি। তার জন্মসন ও স্থান নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ঐতিহাসিক সাফাদি *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত* গ্রন্থে তার পরিচয় বর্ণনা করে লেখেন, তিনি পারস্যের একজন অন্যতম চিকিৎসক।[৫০৯] এখান থেকে তার প্রসিদ্ধি অনুধাবন করা যায়। তিনি অনারবদের মাঝেও বেশ পরিচিত ছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে মান্দাওয়াইর পারদর্শিতা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তার ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবারের বিশাল ভূমিকা ছিল। তার পিতা ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ আলেম। ইবনে মান্দাওয়াইকে শৈশব থেকেই জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসায় উদ্‌বুদ্ধ করেছেন তিনি। তবে ইবনে মান্দাওয়াই ছিলেন এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্সের প্রতি আগ্রহী, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যে তার আগ্রহ ছিল শূন্যের কোঠায়। তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিফতি বলেন, ইবনে মান্দাওয়াইর পিতা ছিলেন ব্যাকরণ, সাহিত্য আর কবিতায় যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।[৫১০]

ইবনে মান্দাওয়াই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায়। চিকিৎসাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। কিছুদিনের মধ্যে চিকিৎসক হিসাবে তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে জ্ঞানী-গুণী ও জনসাধারণের মাঝে। শাসক আদুদুদ্দাওলা বুয়াইহি তাকে চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ দেন বাগদাদের নতুন হাসপাতালে। এখানে মাত্র ২৪জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

---

৫০৯. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত লি সাফাদি*, ৭/৩৫
৫১০. *তারিখুল হুকামা লি কিফতি*, পৃ. ১৮৭

তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এখান থেকেই আমরা তার সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উচ্চ মর্যাদা অনুধাবন করতে পারি।[৫১১]

বাগদাদের হাসপাতালে যোগদানের পূর্বে তিনি আদুদি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। অভিজ্ঞতার ঝুলি বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল তার। গবেষণাও করেছিলেন প্রচুর। ইবনে মান্দাওয়াইর কিছু চমৎকার গবেষণাকর্ম তুলে ধরেছেন ইবনে আবি উসাইবিয়া। তিনি বলেন, ইবনে মান্দাওয়াই বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে তৈরি করেছেন অনেক গবেষণাপত্র। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ৪০টি গবেষণাপত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।[৫১২]

ইবনে আবি উসাইবিয়ার মন্তব্য ইবনে মান্দাওয়াইর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও গবেষণার মূল্যমান প্রমাণ করে। চিকিৎসা নিয়ে ইবনে মান্দাওয়াইর গবেষণা দুইভাগে ভাগ করতে পারি :

প্রথম ভাগ : চিকিৎসার বিভিন্ন শাখাগত বিষয় ও রোগের সমাধান। যেমন তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট বিভিন্ন সময় জটিল জটিল রোগের আলোচনা, চিকিৎসাপদ্ধতি, পরামর্শ ও ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা চিঠি আকারে লিখে পাঠাতেন। এমন কয়েকটি চিঠির কথা তুলে ধরেছেন চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহাসিক ইবনে আবি উসাইবিয়া। যেমন—

- দেহের কার্যাবলি পরিচালনা বিষয়ে আহমাদ ইবনে সাদের কাছে প্রেরিত চিঠি।
- দেহের কার্যাবলি পরিচালনা বিষয়ে আব্বাদ ইবনে আব্বাসের নিকট প্রেরিত চিঠি।
- উপর্যুক্ত বিষয়ে আবুল ফাযল আরিদের নিকট প্রেরিত চিঠি।
- আবুল কাসেম আহমাদ ইবনে আলি ইবনে বাহরের প্রতি প্রেরিত মুসাফিরের চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য নিয়ে লেখা চিঠি।
- চোখের স্তরের বিবরণ দিয়ে হামজা ইবনে হাসানের কাছে প্রেরিত চিঠি।

৫১১. প্রাগুক্ত

৫১২. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ১/৩০৭

- কনজাংটিভাইটিস বা চোখ ওঠা রোগের চিকিৎসাবিষয়ে আবুল হাসান ওয়ারেদের নিকট প্রেরিত চিঠি।
- আব্বাদ ইবনে আব্বাসের প্রতি প্রেরিত খাবার হজমসংক্রান্ত চিঠি।
- পেটসংক্রান্ত রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে আহমাদ ইবনে সাদের নিকট প্রেরিত চিঠি ইত্যাদি।[৫১৩]

ইবনে আবি উসাইবিয়ার উদ্ধৃতি থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে ইবনে মান্দাওয়াইর আগ্রহ ও অনুসন্ধানের মাত্রা বোঝা যায়। পাকস্থলী, পাচনতন্ত্রের রোগ-বালাই, চোখের রোগ ইত্যাদি ছিল তার প্রধান গবেষণাক্ষেত্র। চোখের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় হয়তো তিনিই ছিলেন সে কালের প্রথম সারির চিকিৎসক।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না ইবনে মান্দাওয়াইর চিকিৎসাকেন্দ্রিক গবেষণা। বরং অন্য আরও অনেক বিষয়ে গবেষণা করে তিনি চিঠিপত্র লিখেছিলেন। যেমন মূত্রনালি, কিডনি, ডায়াবেটিস, কঙ্কালতন্ত্র, চর্মরোগ, কানের রোগ, শোথ রোগ, শিশুদের রোগ ইত্যাদি।

বিভিন্ন পানীয়, ভেষজ ওষুধ দেহের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে, সেগুলোর ব্যবহারবিধি নিয়েও কলম ধরেছেন ইবনে মান্দাওয়াই। তেঁতুল, কর্পূর, মাদকদ্রব্যের উপকার-অপকার নিয়েও তার অনেক চিঠি আছে।[৫১৪]

ইবনে আবি উসাইবিয়ার বর্ণনা থেকে জানতে পারি, ইবনে মান্দাওয়াই সামসময়িক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইবনে সিনার কাছেও চিঠি লিখেছেন। একটা চিঠি ছিল অর্শ্বরোগ নিয়ে। চিঠির সূচনায় ছিল, অর্শ্বরোগের বিস্তারিত বর্ণনা ও সমাধান নিয়ে মান্যবর সমীপেষু। এ চিঠি থেকে বুঝতে পারি, ইবনে সিনা ও ইবনে মান্দাওয়াইর মাঝে ছিল গভীর সম্পর্ক। একে অপরের সঙ্গে চিকিৎসাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন ও পরামর্শ নিতেন। নিঃসন্দেহে তারা একে অপরের থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাদের বাড়ি কাছাকাছি ছিল। ইবনে মান্দাওয়াই ইবনে সিনার জগদ্‌বিখ্যাত বইপত্র থেকে উপকৃত হতেন, একইসাথে ইবনে সিনাও ইবনে মান্দাওয়াইর লেখালেখি ও চিঠিপত্র থেকে উপকৃত হতেন। উপর্যুক্ত চিঠি আমাদেরকে সে কথাই বলে।

---

৫১৩. প্রাগুক্ত, ১/৩০৭

৫১৪. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত লি সাফাদি*, ৭/৩৫

দ্বিতীয় ভাগ : ইবনে মান্দাওয়াই কেবল চিঠিপত্রই লেখেননি, লিখেছেন কিছু স্বতন্ত্র গ্রন্থও। তার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো :

- *আল-মাদখাল ইলাত তিব*
- *কুন্নাশুত তিব*
- *ফিশ শারাব* (পানীয়সংক্রান্ত)
- *আত-তাবিখ* (রন্ধনসংক্রান্ত)
- *আল-জামিউল মুখতাসার মিন ইলমিত তিব* (সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞান)
- *আল-কাফি ফিত তিব* (পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্র)। এই গ্রন্থটি চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় *আল-কানুন* নামে পরিচিত।[৫১৫]

ইবনে মান্দাওয়াই-এর বিশেষজ্ঞতা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রে। পারিবারিক প্রভাবে সাহিত্য, কবিতা ও ভাষাতত্ত্বেও অর্জন করেছিলেন গভীর পারদর্শিতা। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তার বিশেষ অনুরাগ। একটি পত্রে তিনি চিকিৎসকদের আরবি শিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। পত্রের নাম 'রিসালাতুন ফির রাদ্দি আলা মান আনকারা হাজাতাত তাবিব ইলা ইলমিল লুগাহ' (যারা মনে করে চিকিৎসকের জন্য আরবি শেখার প্রয়োজন নেই, তাদের ধারণার খণ্ডন)।[৫১৬]এর দ্বারা বোঝা যায়, চতুর্থ শতাব্দীতে আরবিই ছিল ঐশী জ্ঞানের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা। এই আরবি ভাষাতেই তিনি লিখেছিলেন ৪০টির অধিক গবেষণাপত্র।

ইবনে মান্দাওয়াই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। ইসলামি রাষ্ট্রে তাকে মর্যাদার চোখে দেখা হতো। চিকিৎসাশাস্ত্রে বরিত হওয়ার দরুনই তিনি নিয়োগ পেয়েছিলেন সর্ববৃহৎ হাসপাতালে। তিনি চল্লিশের অধিক গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রচনা করেছেন।

---

৫১৫. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৭১-২৭২

৫১৬. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত লি সাফাদি*, ৭/৩৫

(১৫)
স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহইয়া মাগরিবি : বিচক্ষণ চিকিৎসক

স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহুয়া ইবনে আবুন। ধর্মে ছিলেন ইহুদি। পিতা ছিলেন মহান ধর্মসাধক ও পণ্ডিত। মাতা ছিলেন একজন মহীয়সী নারী। আরবিতে নামকরণের ক্ষেত্রে আরবদের প্রথা অনুযায়ী তার পিতা নাম রাখেন স্যামুয়েল।

ইসলামি সভ্যতার ক্রোড়ে জন্ম নেওয়া একজন মহান চিকিৎসক তিনি। বীজগণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রকৌশল-সহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জীবনীলেখকগণের মতে তার জন্ম মরক্কোয়। মৃত্যু মুসলিম প্রাচ্যে, আজারবাইজানের মারাগা শহরে। যুবক বয়সে ৫৭০ হিজরি/১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। সে হিসাবে মনে হয়, তার জন্ম হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পর।

আত্মজীবনীতে স্যামুয়েল লিখেছেন, তার পিতা ইয়াহুয়া ইবনে আবুন ছিলেন ধার্মিক, তাওরাত পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক।[৫১৭] তার মাতাও তাওরাত ও হিব্রু সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান রাখতেন। স্যামুয়েলের মাতার বংশ গিয়ে মিলিত হয়েছে মুসা আ.-এর বংশলতিকায়।[৫১৮]

এ হিসাবে স্যামুয়েল ছিলেন সম্ভ্রান্ত ইহুদি বংশের সন্তান। বাবা-মায়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষার সন্তান। মা-বাবা তাদের জ্ঞানের সারনির্যাস ঢেলে তাকে বড় করে তুলেছেন। ১৩ বছর বয়সেই তিনি হিব্রু ভাষা এবং তাওরাত আয়ত্ত করেন।[৫১৯]

ধর্মীয় জ্ঞানে পিতাকে তুষ্ট করে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় মনোযোগ দেন। তার বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র এক বছরের কম সময়ে তিনি পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান রপ্ত করেন। এরপর শিখেছেন জরিপ, ভূমিজরিপ, বীজগণিত, জ্যামিতি ও প্রকৌশল।

চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে তার যে পড়ালেখা, তা একেবারেই অভিনব। প্রতিটি শাস্ত্রই তিনি শিখেছেন বিভিন্ন শিক্ষক ও পণ্ডিতের কাছে গিয়ে। একটা সময়

---

৫১৭. *ইফহামুল ইয়াহুদ ওয়া কিসসাতু ইসলামিস স্যামুয়েল ওয়া রুয়াহুন নাবিয়্যা লি স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহইয়া*, পৃ. ৪৬

৫১৮. প্রাগুক্ত

৫১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

পর্যন্ত অন্যান্য শাস্ত্র শেখার পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করেছেন। একাডেমিক চিকিৎসাশাস্ত্র শেখা শুরু করেছেন আবুল হাসান দাসকারির নিকট। তখন চিকিৎসাশাস্ত্রই ছিল তার সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনা ও পড়াশোনা। তার মামা আবুল ফুতুহ ইবনে বসরি ছিলেন চিকিৎসক। তার চিকিৎসা দেখেও প্রায়োগিক শিক্ষা নিতেন স্যামুয়েল। এক শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করে অন্য শাস্ত্র শুরু করা ছিল তার রীতি। তবে তার কথা থেকে বোঝা যায়, চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও রোগীদের চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ কখনো তিনি বাদ দেননি। অন্যান্য জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সবসময়ই তিনি চিকিৎসা অধ্যয়ন করে গেছেন। তিনি লেখেন, বীজগণিত ও প্রকৌশল পাঠের সময়ও চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আলাদা সময় রাখতাম।

চিকিৎসা, জ্যামিতি আর গণিত ছিল তার প্রিয় বিষয়। এ সকল বিষয়ে জ্ঞানচর্চায় আপন আগ্রহ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, এসব অধ্যয়নে আমার এতটা ভালোবাসা ও আনন্দ ছিল যে, কখনো কখনো খাওয়াদাওয়া করতেই ভুলে যেতাম।

একাগ্রচিত্তে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দিনরাত অতিবাহিত হয়ে যেত। তিনি অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে তিনি অসামান্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, পূর্বের দার্শনিকদের কাছে যেসব বিষয় অস্পষ্ট ছিল, তার অনেক কিছুই আমার কাছে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা থাকলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে ছিল তার বিশেষ আগ্রহ। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, একটা সময় ছিল, যখন চিকিৎসা ছাড়া আমার আর কোনো ব্যস্ততা ছিল না। চিকিৎসা থেকেই আমার বেশ উপার্জন হতো। কেননা অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় আমার দক্ষতা ছিল আশ্চর্যরকম। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি কোনো রোগীর চিকিৎসা করলেই সে ভালো হয়ে যেত। যার চিকিৎসা করতে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করি, অন্য চিকিৎসকেরা তার চিকিৎসার চেষ্টাও করত না। আল্লাহর অশেষ দয়া ও নেয়ামতের লাখো-কোটি শুকরিয়া।

তিনি আরও বলেন, ইরাক, শাম, আজারবাইজান[৫২০], কোহেস্তানের[৫২১] বই পড়া শেষ করেছি। এর মধ্য দিয়ে আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে নতুন নতুন জ্ঞান ও ওষুধ তৈরির পদ্ধতি। সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমি কিছু নতুন ওষুধ তৈরি করেছি। এমন ওষুধ আগে কেউ তৈরি করেছে বলে আমার জানা নেই। যেমন দারদিয়াক ওষুধ। এর নাম দিয়েছি মহৌষধ। এই ওষুধ সেবনের কয়েকদিনের মধ্যে কঠিন কঠিন রোগ সেরে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় এমন আরও কিছু ওষুধ আমি তৈরি করেছি।[৫২২]

এমনইভাবে স্যামুয়েল বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তবে চিকিৎসাই ছিল তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। এখানেই তিনি ছিলেন পারঙ্গম ও বিশেষজ্ঞ। শাস্ত্রীয় দক্ষতার কারণে তিনি আজারবাইজানের শাসক-পরিবার বুহলুনের পারিবারিক চিকিৎসক পদে নিয়োগ লাভ করেন।[৫২৩]

স্যামুয়েলের পছন্দ ও পাণ্ডিত্যের আরেকটি বিষয় ছিল ইতিহাস। ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে তিনি সাহিত্য ও অলংকারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ইতিহাস পাঠের পথেই তিনি অনুরাগী হয়ে ওঠেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে। ইসলাম ও ইহুদিধর্ম তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখেন। এভাবেই কেটে যায় কয়েক বছর। ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ ও ভালোবাসা বাড়তে থাকে। কিন্তু বাবার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিলেন না। সময় গড়িয়ে যায়। চিকিৎসার কাজে তিনি চলে যান অনেক দূরে, যেখানে বাবার ধরাছোঁয়ার কোনো ভয় নেই। সেখানে এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। সকালে উঠে কালবিলম্ব না করে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

স্যামুয়েলের মতো একজন মহান পণ্ডিতের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয় ইসলামি সভ্যতা আসলে সমগ্র মানবতার সভ্যতা। এর বিস্তৃত ছায়া সকলকেই বেষ্টন করে রাখতে পারে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই এখানে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমান সুযোগ লাভ করতে পারে। ইসলামে

---

৫২০. **আজারবাইজান :** আজারবাইজান বলতে বর্তমান ইরানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল উদ্দেশ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদের পরিচিত আজারবাইজান নয়।

৫২১. **কোহেস্তান :** বর্তমান ইরানের কারামান প্রদেশের অন্তর্গত একটি শহর।

৫২২. *ইফহামুল ইয়াহুদ ওয়া কিসসাতু ইসলামিস স্যামুয়েল ওয়া রুয়াহুন নাবিয়্যা লি স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহইয়া*, পৃ. ৫১

৫২৩. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/১৫৫

কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। ইসলামের একজন সৈনিক হিসাবে স্যামুয়েলের আত্মপ্রকাশ প্রমাণ করে ইসলামই হলো সেই প্রকৃষ্ট স্বভাবজাত ধর্ম, বুদ্ধিমানেরা যার দিশা লাভ করে থাকে।

স্যামুয়েল ইসলাম গ্রহণ করেন ৫৫৮ হিজরি/১১৬২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জিলহজ। দিনটি ছিল শুক্রবার। তার ইসলাম গ্রহণের কথা বাতাসের আগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার ইসলাম গ্রহণে মারাগা শহর আনন্দে মেতে ওঠে। খুশিতে মসজিদে দরুদ পাঠের গুঞ্জনধ্বনি ওঠে। জুমার খুতবায় তার স্তুতি ও প্রশংসা করা হয়। এতে বোঝা যায়, ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভের পরই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন স্যামুয়েল। ইসলাম গ্রহণের ১২ বছর পর ৫৭০ হিজরি/১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইহুদিদের ধর্মবিশ্বাস খণ্ডন করে তিনি রচনা করেছেন *ইফহামুল ইয়াহুদ* নামক গ্রন্থ। ইহুদিদের যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে এটি একটি অসাধারণ দলিল। ইহুদিদের যুক্তি দিয়েই তিনি ইহুদিদের খণ্ডন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তার পারদর্শিতা থাকাই স্বাভাবিক। বাবা-মা ইহুদিদের ধর্মগুরু। তারা উভয়ে মিলে তাকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। সবকিছু ভালোভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি নিজেও দীর্ঘ সময় ইহুদিধর্ম পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। গ্রন্থটি তখন অনেক প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। ইহুদিদের সাথে তিনি অনেক কঠিন কঠিন বিতর্কেও অংশগ্রহণ করেছেন।[৫২৪]

ঐতিহাসিক সাফাদি বলেছেন, তার ছিল প্রখর মেধা।[৫২৫] হাফেজ যাহাবি রহ. এ কথা সমর্থন করেছেন।[৫২৬] তার জীবনীলেখকগণ বীজগণিত, জ্যামিতি ও জরিপে তার মেধার স্বীকৃতি দিয়েছেন একবাক্যে। এসব শাস্ত্রেই ছিল স্যামুয়েলের অধিক পরিচিতি। চিকিৎসাশাস্ত্রে যে তার যোগ্যতা রয়েছে, সেটা আমরা কখনো জানতে পারতাম না, যদি তিনি আত্মজীবনী না লিখে যেতেন। আত্মজীবনী থেকেই তার চিকিৎসাপ্রতিভার কথা বিশেষভাবে আমরা জানতে পারি। তিনি জ্ঞান-গবেষণার বিশাল এক সম্পদ বিশ্বকে উপহার দিয়ে গেছেন। তার মতো জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা মোটেও আশ্চর্যজনক না। গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ সব মিলিয়ে তার ৮৫টি

---

৫২৪. বিস্তারিত দেখুন *ইফহামুল ইয়াহুদ ওয়া কিসসাতু ইসলামিস স্যামুয়েল ওয়া রুয়াহুন নাবিয়্যা লি-স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহইয়া*।

৫২৫. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত লি সাফাদি*, ১৫/২৭৬

৫২৬. *তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি*, ৪০/৩২৯

রচনা রয়েছে।[৫২৭] চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর লেখা তার অন্যতম গ্রন্থ *আল-মুফিদুল আওসাত ফিত তিব*। বাগদাদে বসে উজির মুআইয়িদুদ্দিন আবু ইসমাইল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে আলির অনুরোধে ৫৬৪ হিজরি/১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও অন্য আরও অনেক বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন। বীজগণিত নিয়ে লিখেছেন *আল-বাহির ফিল জাবর*। এটি রচনা করেছেন মাত্র ১৯ বছর বয়সে। প্রকৌশল নিয়ে লিখেছেন *ইজাযুল মুহান্দিসিন*। ভারতীয় পাটিগণিত নিয়ে লিখেছেন *আল-কাওয়ামা ফিল হিসাবিল হিন্দি*। জ্যামিতি নিয়ে লিখেছেন *আল-মুসাল্লাসুল কাইমুয যাবিয়া*। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন *আল-মিনবার ফি মাসাহাতি আজসামিল জাওয়াহিরিল মুখতালিতা লি-ইসতিখরাজি মিকদারি মাজহুলিহা*। এ ছাড়া তার আরও অনেক গ্রন্থ আছে।[৫২৮]

(১৬)

বখতেশু-পরিবার : চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রগামী পরিবার

উন্মেষপর্ব থেকেই ধীরে ধীরে ইসলাম পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমগণ বহু জাতি, দেশ ও সভ্যতা জয় করে নেন। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো ইসলামি সভ্যতার শোধনাগারে শোধিত হতে শুরু করে। তখন অন্যান্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা ইসলামি সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। অনুবাদকর্ম শুরু হয় উমাইয়া খেলাফতের সূচনালগ্নে। বিশেষভাবে উমাইয়া শাসক খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার দায়িত্বগ্রহণের পর।

অনুবাদ শুরু হলেও প্রারম্ভে ততটা গতি পায়নি। ধীর গতিতে অনুবাদের কাজ চলছিল। অনুবাদের বিষয়টা আন্দোলনের রূপ লাভ করে আব্বাসি খেলাফতকালে, যা আব্বাসি শাসনামলের স্বর্ণযুগ নামে খ্যাত। তখন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বার খুলে যায়।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে অমুসলিমরাও বড় অবদান রাখেন। কারণ তাদের বিশেষত হেলেনিক ঐতিহ্য-সহ অন্যান্য

---

৫২৭. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৯

৫২৮. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৯

সভ্যতায় গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সুরিয়ানি ভাষার লোকজনও তাদের ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদে বেশ অবদান রেখেছে। অঞ্চলভেদে অনুবাদের কাজে গতির পার্থক্য ছিল। কিছু অঞ্চল ছিল অনুবাদে বেশ অগ্রসর। এর মধ্যে আছে হাররান, জুনদিশাপুর, ইস্কান্দারিয়া। এসব অঞ্চলে অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন একটি পরিবার—বখতেশু-পরিবার।

বখতেশু একটি পরিবার, একটি বংশ। তিন শতাব্দীরও অধিক সময় তারা চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। আব্বাসি খলিফাদের নিকট তাদের সম্মানজনক অবস্থান ছিল। তাদের অনেকেই ছিলেন উজির ও সুদক্ষ প্রতিভাবান চিকিৎসক। প্রায় হিজরি পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসার নেতৃত্ব ছিল তাদের হাতে। এই বংশের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, পরিবারের কোনো চিকিৎসকের ইন্তেকালের পর তার চেয়েও যোগ্যতর চিকিৎসকের আগমন ঘটত। এভাবেই যুগ যুগ ধরে তারা স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে চিকিৎসার ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এজন্যই তারা আব্বাসি খলিফাদের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন।

এই মহান পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যার নাম সবার প্রথমে আসবে, তিনি হলেন জর্জিস ইবনে জিবরাইল আলে বখতেশু। তিনি ছিলেন জুনদিশাপুরের চিকিৎসাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। গ্রিক ও সুরিয়ানি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। জর্জিসের পর থেকেই বখতেশু-পরিবারের নাম উজ্জ্বল হতে থাকে। খলিফা মানসুরের পাকস্থলীতে একবার এক দুরারোগ্য ব্যাধি হয়। চিকিৎসকগণ অপারগতা প্রকাশ করেন। তখন জুনদিশাপুর থেকে জর্জিসকে নিমন্ত্রণ জানান খলিফা মানসুর। তিনি এসে খলিফার রোগ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। তার চিকিৎসায় খলিফা সুস্থ হয়ে ওঠেন। জর্জিসের প্রসিদ্ধি জনমুখে ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বলেন, আমি পূর্বপুরুষদের ধর্মের ওপর থেকেই মৃত্যুবরণ করতে চাই। জর্জিস দেশের পথে পা বাড়ান। খলিফা তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন।

জর্জিস ইবনে জিবরাইল আলে বখতেশু হাতে গোনা কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার *কুন্নাশ* গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করেন হুনাইন ইবনে ইসহাক। তার *আখলাত* নামে আরেকটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থদুটি দীর্ঘকাল যাবৎ চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য দলিল ছিল। *কুন্নাশ* গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ও

তথ্যবহুল হওয়ায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ এতে পাকস্থলীর রোগ, অন্ত্রের ঘা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল।

জর্জিস যখন খলিফার অনুরোধে বাগদাদ যাত্রা করেছিলেন, তখন জুনদিশাপুর মেডিক্যাল বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন পুত্র বখতেশুকে। জুনদিশাপুর ফেরার পথে খলিফা মাহদি জর্জিসের পুত্রকে বাগদাদে পাঠিয়ে দিতে বলেন। মাহদির পর হারুনুর রশিদ এসে জর্জিসের পুত্র বখতেশুকে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসকের পদমর্যাদা দেন।[৫২৯]

পুত্র বখতেশু

পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্থানে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন পুত্র বখতেশু। তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে সারা বাগদাদে। পুত্র ছিলেন পিতার প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানী, পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ চিকিৎসা-গবেষক। পিতা বখতেশু তাকে জুনদিশাপুর হাসপাতালের দায়িত্ব প্রদান করেন। বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পিতার নির্বাচন এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তার পুত্র চিকিৎসাশাস্ত্রে তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

তিনি পিতার মতোই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তবে পিতার সুবাদে নয়। নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি রচনা করেন *আত-তাযকিরা* নামে একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন মূলত নিজের পুত্র জিবরিলের জন্য। সমকালে ছড়িয়ে পড়া রোগ-বালাই ছিল গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়। যেমন যক্ষ্মা, শোথ রোগ, পেটের আলসার ইত্যাদি।

জিবরিল ইবনে বখতেশু

জিবরিল ইবনে বখতেশু ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। পিতা ও দাদার চিকিৎসাবিজ্ঞান তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন। এজন্য তিনিও তাদের মতো যুগের সেরা চিকিৎসকে পরিণত হন। জানা যায়, তিনি ছিলেন সুনিপুণ চিকিৎসক, অত্যন্ত সাহসী, খলিফাদের প্রিয়পাত্র এবং সম্মানজনক পদের অধিকারী। খলিফাদের পক্ষ থেকে তিনি যে পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেন তা অন্য কোনো চিকিৎসক অর্জন করতে পারেননি।[৫৩০]

জিবরিল ইবনে বখতেশু বাগদাদে দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। একসময় তিনি জাফর ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকির ব্যক্তিগত চিকিৎসক

---

৫২৯. *কওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬৫

৫৩০. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/১৪

হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। খলিফা মামুনের কাছেও তার কদর ছিল। মামুনকে উৎসর্গ করে তিনি খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখে পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থটি ছিল খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানে সমকালীন চিকিৎসকদের দলিল।

জিবরিলের রচিত কিছু গ্রন্থ

জিবরিল বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে আছে খলিফা মামুনের জন্য উৎসর্গিত খাদ্য ও পানীয় নিয়ে লেখা একটি পুস্তিকা, যুক্তিবিদ্যা নিয়ে রচিত *আল-মাদখাল ইলা সিনাআতিল মানতিক*, যৌনবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত গ্রন্থ। এ ছাড়া চিকিৎসা সম্পর্কে তার একটি প্রবন্ধসমগ্র ছিল।

তিনি বলেন, চারটি বিষয় ক্ষতিকর। **এক.** খাবার হজম হওয়ার আগেই পুনরায় খাদ্যগ্রহণ। **দুই.** সকালে বাসি মুখে ঠান্ডা পানি পান। **তিন.** বৃদ্ধা নারীর সাথে সহবাস করা। **চার.** গোসলখানায় সহবাস।[৫৩১]

এখন আমরা আলোচনা করব এই চিকিৎসক-পরিবারের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে নিয়ে। তার নাম আজও ইসলামি রাষ্ট্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আকাশে অঙ্কিত। পূর্বপুরুষদের অনুরূপ তিনিও আব্বাসি খলিফাদের সুদৃষ্টি অর্জনে সক্ষম হন। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে তার নাম—

বখতেশু ইবনে জিবরিল ইবনে বখতেশু

বখতেশু-পরিবারের চিকিৎসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন চতুর্থ চিকিৎসক বখতেশু ইবনে জিবরিল ইবনে বখতেশু। তিনি ছিলেন সিরীয় খ্রিষ্টান। মান-মর্যাদায় অত্যন্ত সম্মানিত। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ঘনিষ্ঠজন। খলিফা তাকে সম্মান করতেন। খলিফার থেকে তিনি অনেক সম্পদ পেয়েছেন। তার চালচলন ছিল রাজকীয়। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মতো দামি পোশাক-আশাক পরতেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, সাধক; তবে রসিক ছিলেন। হাস্যরস পছন্দ করতেন। রসিকতা করে একবার চিকিৎসক ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহকে বললেন, তুমি আমার বাবার ঔরসজাত ভাই। ইউহান্না উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা সাক্ষী, আমি অবশ্যই ওর

মিরাস ভাগ করে নেব। এ কথা শুনে বখতেশুর তাৎক্ষণিক জবাব ছিল, বিবাহহীন সন্তানরা মিরাসের অধিকার পায় না।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে বখতেশুর বিশেষ একটা অবস্থান ছিল। তার চিকিৎসা ছিল দলিল-প্রমাণনির্ভর। তেমনইভাবে তিনি রোগ প্রতিরোধে খুবই সচেতন ছিলেন।

বখতেশুর রচনাবলি

বখতেশু বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *নুবযাতুন ফিত তিব*, *সানাইউর রুহবান ফিল আদভিয়াতিল মুরাক্কাবা*, *কিতাবুল হিজামা*। শেষোক্ত গ্রন্থটি লেখা হয়েছে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে।

তিনি বলতেন, ক্ষুধার সময় পানি পান ক্ষতিকর। ভরা পেটে আহার করা আরও বেশি ক্ষতিকর।

বখতেশু ২৫৬ হিজরি মোতাবেক ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বখতেশুর মৃত্যুর পর পরিবারের চিকিৎসাগত ধারার ছন্দপতন হয়। উবাইদুল্লাহ ইবনে বখতেশু ইবনে জিবরিল চিকিৎসাবিদ্যায় পূর্বপুরুষের ন্যায় দক্ষ ছিলেন না। তিনি চাকুরি করতেন খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর রেজিস্টার অফিসের লিপিকার হিসাবে।

তবে তার ঔরসে জন্ম নেয় এক পুত্র। নাম রাখেন জিবরিল। বড় হয়ে তিনি খুব দ্রুত এই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসক-পরিবারের চিকিৎসাগত গৌরব ফিরিয়ে আনেন।

জিবরিল ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে বখতেশু

জিবরিল ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে বখতেশু ছিলেন জ্ঞানী ও দক্ষ চিকিৎসক। চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষতার দরুন সমকালে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তার উপনাম ছিল আবু ঈসা। জিবরিল ইবনে উবাইদুল্লাহ ৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আদুদুদ্দাওলা বুয়াইহির দরবারে তিনি কাজ করতেন। সামসময়িক চিকিৎসকদের মাঝে তার ভালো কদর ছিল। শেষজীবনে তিনি রচনা ও লেখালেখির কাজে নিমগ্ন হন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো :

- *আল-কুন্নাশুল কাবির*। এটি আল-কাফি নামে পরিচিত। পাঁচ খণ্ডে রচিত। উৎসর্গ করেছেন সাহেব ইবনে আব্বাদকে। গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে রচিত।
- *আল-কুন্নাশুস সগির*। এটিও রচনা করেছেন সাহেব ইবনে আব্বাদের উদ্দেশে।
- চোখের সমস্যা নিয়ে লিখেছেন *রিসালাতুন ফি আসবিল আইন*।
- মাথা ও পাকস্থলীর সমস্যা নিয়ে লিখেছেন *মাকালাতুন ফি আলামিদ দিমাগ বি মুশারাকাতি ফামিল মিদা ওয়াল হিজাবিল ফাসিল*।
- নবী-রাসুল ও দার্শনিকদের বাণীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে লিখেছেন *আল-মুতাবাকা বাইনা কাউলিল আম্বিয়া ওয়াল ফালাসিফা*।
- ইহুদিদের ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা করে লিখেছেন *আর-রাদ্দু আলাল ইয়াহুদ*।
- তিনি ছিলেন সিরীয় খ্রিষ্টান। তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী লিখেছেন *লিমা জুইলা মিনাল খামরি কুরবানুম মুহাররাম*।

মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র উবাইদুল্লাহ। তিনিও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

উবাইদুল্লাহ ইবনে জিবরিল

পূর্ণ নাম আবু সাইদ উবাইদুল্লাহ ইবনে জিবরিল ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে বখতেশু ইবনে জিবরিল ইবনে বখতেশু ইবনে জর্জিস ইবনে জিবরিল। তিনি ৪৫০ হিজরি মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন কর্মকুশলতায় খ্যাতিমান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের শাখাগত এবং মৌলিক জ্ঞানে বিদগ্ধ চিকিৎসক।

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় জ্ঞান ও উপদল সম্পর্কে তার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে শাস্ত্রীয় দক্ষতা তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে। ফার্মাকোলজি ছাড়া চিকিৎসার অন্যান্য ধারায়ও তিনি স্বতন্ত্র অবদান রেখেছেন।

যারা চিকিৎসাশাস্ত্রকে দর্শনের সাথে এক করে দেখতেন, তাদের মতের বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন, চিকিৎসা নিরেট প্রায়োগিক জ্ঞান।

দর্শনের সাথে এর কোনো যোগসাজশ নেই। তবে যুক্তি, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের সাথে এর সম্পর্ক আছে।[৫৩২]

উবাইদুল্লাহর রচনাবলি

তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন :

- চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের মতভেদ নিয়ে রচনা করেছেন *আর-রওজাতুত তিব্বিয়া*। রচনাকাল ৪৪০ হিজরি/১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- বংশলতিকাশাস্ত্র নিয়ে লিখেছেন *আত-তাওয়াসসুল ইলা ইলমিত তানাসুল*। রচনাকাল ৪৪০ হিজরি/১০৪৮ খ্রি.।
- *তাযকিরাতুল হাযির ওয়া যাদুল মুসাফির*।
- *আল-খাস ফি ইলমিল খাওয়াস*।
- প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে রচনা করেছেন *তাবাইউল হায়াওয়ান ওয়া খাওয়াসসুহা ওয়া মানাফিউ আদাইহা*। গ্রন্থটি তিনি আমির নাসিরুদ্দাউলাহকে উৎসর্গ করেছেন।

বখতেশু-পরিবারের আলোচনার ইতি টানছি এখানেই। দীর্ঘ তিন শতাব্দীব্যাপী তারা ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিংবদন্তি। তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে কেউ ভাগ বসাতে পারেনি। এমনটা হলে হয়তো খলিফাগণই ব্যবস্থা নিতেন। কারণ তাদের সঙ্গে খলিফাদের বেশ সুসম্পর্ক ছিল।

বখতেশু-পরিবার সম্পর্কে কিছু কথা

জুনদিশাপুর মুসলিমদের হাতে বিজিত হওয়ার সুবাদেই এই পরিবার ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পেরেছে। জুনদিশাপুরের মানুষ ছাড়া তাদের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে কারও ধারণা ছিল না। কিন্তু মুসলিম খলিফাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তারা ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। ইসলামি সভ্যতায় তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে বখতেশু-পরিবারের অবদান ছিল লক্ষণীয়। বিশেষত গ্রিক থেকে আরবিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে জর্জিস বখতেশুর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আব্বাসি খলিফা মানসুরের কাছে

৫৩২. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬৭

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গ্রন্থ অনুবাদ করে পৌঁছে দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তার সন্তানরা অনুবাদকর্মে এগিয়ে এসেছে।

বখতেশু-পরিবারের মূল কোথায় প্রোথিত, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে। কেউ বলেন তারা নেস্টোরিয়ান সিরীয় খ্রিষ্টান। আব্বাসি শাসনামলের প্রথম যুগে তারা ইরানের জুনদিশাপুর শহরে বেড়ে উঠেছেন। কেউ আবার বলেন, তারা মূলত সিরিয়ার বা উত্তর মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার সুনাম শুনে তারা জুনদিশাপুর চলে আসেন।[৫৩৩]

আব্বাসি খলিফাগণ বখতেশু-পরিবারকে সম্মানের চোখে দেখতেন বরং সকল মুসলিমের অন্তরেই তাদের অনেক কদর ছিল। এই ভালোবাসা ছিল হৃদয়ছোঁয়া। খলিফাগণ নামাজ পড়ে তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন। তাদের গভীর জ্ঞান ও উন্নত নৈতিকতা ছিল হৃদয়কাড়া। এ প্রসঙ্গে খলিফা হারুনুর রশিদের একটা ঘটনা আছে। একবার হজ শেষে তিনি ফিরে এলেন বাগদাদে। জিবরিল ইবনে বখতেশুকে লক্ষ করে বললেন, তুমি তো জানোই, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। জিবরিল বললেন তা তো বটেই। এরপর খলিফা বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার জন্য এবার হজে গিয়ে আমি অনেক দোয়া করেছি।

এ কথা বলে খলিফা তার আশেপাশে উপস্থিত হাশেমি বংশের লোকদের বললেন, আমি তার সম্পর্কে কী বলেছিলাম, তা কি তোমাদের মনে আছে? তারা বলল, হ্যাঁ, মনে আছে। আপনি বলেছিলেন, সে জিম্মি। খলিফা বললেন, ঠিক, কিন্তু জিবরিল ইবনে বখতেশুর চিকিৎসায় তার পরিবার ও আমার দেহ সুস্থ থাকে। আর আমি সুস্থ থাকলে মুসলিমদের জীবন স্বাভাবিক থাকে। সুতরাং বলতে পারো জিবরিল ইবনে বখতেশুর মাধ্যমেই মুসলিমজাতির জীবন স্বাভাবিক ধারায় চলছে। তারা বলল, আমিরুল মুমিনিন, আপনি সত্যই বলেছেন।[৫৩৪]

ইসলামি সভ্যতায় এমন জ্ঞানী পরিবার শুধু এটিই নয়; বরং ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে এমন আরও অনেক পরিবারের দেখা আমরা পাই, বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রে। যেমন সাবেত ইবনে কুররার পরিবার, হুনাইন ইবনে ইসহাকের পরিবার, আবু ইউহান্না মাসাওয়াইর পরিবার, ইবনুল আসরাদির

---

৫৩৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬৮
৫৩৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/২১

পরিবার ইত্যাদি। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রতিটি পরিবারের রয়েছে অসামান্য অবদান, অনন্য কৃতিত্ব ও দিগন্তজোড়া খ্যাতি।[৫৩৫]

(১৭)
দাউদ আনতাকি : দৃষ্টিহীন এক উজ্জ্বল প্রতিভা

দাউদ ইবনে উমর আনতাকি। তিনি ছিলেন অন্ধ; কিন্তু মানুষ তাকে সম্বোধন করত বাসির বা চক্ষুষ্মান নামে। ৯৪২ হিজরিতে সিরিয়ার ইদলিব শহরের ফারআ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই আক্রান্ত হন রিকেটস রোগে। তখন পিতার সঙ্গে চলে যান আনতাকিয়ায় । আনতাকিয়াতেই বেড়ে ওঠেন। সেখানে তিনি রিকেটস রোগ থেকে মুক্তি পান।[৫৩৬] তার চিকিৎসাগত দক্ষতার দরুন মানুষ তাকে 'যুগের হিপোক্রেটিস' বলে ডাকত।[৫৩৭]

দাউদ ইবনে উমর আনতাকি ছিলেন জ্ঞানজগতের বিশ্বকোষ। চিকিৎসা, সাহিত্য, কুরআন, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, গ্রিক ভাষা, এ সকল জ্ঞানে বিশেষ যোগ্যতা ছিল তার।

শাযারাতুয যাহাব গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক ইবনে ইমাদ দাউদ আনতাকির রিকেটস রোগ থেকে মুক্তির গল্প তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, এই রোগের সাথেই ছিল তার বসবাস। দাউদ আনতাকি নিজের সম্পর্কে বলেন, রিকেটস রোগের কারণে আমি দাঁড়াতে পারতাম না। বাড়ির বাইরে যাওয়া ছিল অসম্ভব বিষয়। আমার পিতা ছিলেন হাবিব নাজ্জার গ্রামের সর্দার। তিনি গ্রামে মুসাফিরদের জন্য একটি সরাইখানা বানালেন। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কয়েকটি কামরা তৈরি করেন। আগত মেহমানদের খাবার ব্যবস্থাপনা করতে নিযুক্ত করেন কয়েকজন সেবক। সেবক এসে প্রতিদিনই আমাকে সরাইখানায় নিয়ে যেত। মুসাফিরদের সাথে গল্প করেই কাটত আমার সারা দিন। একদিন সরাইখানায় এলেন এক অভিজ্ঞ অনারব চিকিৎসক। নাম ছিল শরিফ। তিনি আমার অবস্থা দেখে চিকিৎসা করতে চাইলেন। বিভিন্ন ওষুধের সমন্বয়ে তিনি তৈরি করলেন একধরনের তৈলাক্ত ওষুধ। আমাকে রোদে

---

৫৩৫. ইবনে আবি উসাইবিয়া *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* গ্রন্থে তাদের বিস্তারিত জীবনী উল্লেখ করেছেন।

৫৩৬. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৬৬

৫৩৭. *আল-মুজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতি ইনদাল আরব*, পৃ. ৪১৯

শুইয়ে দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। এত শক্ত করে ব্যান্ডেজ করলেন যে, মনে হচ্ছিল, আমি মরেই যাব। এভাবে একটানা কয়েকদিন চিকিৎসা চলল। তারপর আলহামদুলিল্লাহ আমি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারলাম। এমনকি হাঁটতেও সক্ষম হয়ে উঠলাম। সুস্থ হয়ে তার কাছেই আমি শিখেছি যুক্তিশাস্ত্র, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান। তিনি আমাকে গ্রিক ভাষাও শিখিয়েছেন।[৫৩৮]

সে যুগের জ্ঞানপিপাসুদের মতোই দাউদ বেশি দিন আনতাকিয়ায় থাকতে পারেননি। জ্ঞানার্জনের পিপাসা নিয়ে তিনি ছুটে যান দামেশকের জ্ঞানীদের কাছে । জ্ঞানার্জন শেষে সেখান থেকে চলে যান মিশরে। কিছুদিনের মধ্যেই তার জ্ঞান ও দক্ষতার সুখ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের নিরীক্ষণ ও গঠনমূলক সমালোচনার কারণে। একসময় তিনি হয়ে ওঠেন মিশরের প্রধান চিকিৎসক। হজের উদ্দেশ্যে কিছুদিন পর মিশর থেকে মক্কায় যান। সেখানেই অবস্থান করে চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত থাকেন। ১০০৮ হিজরি মোতাবেক ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই জীবনযাপন করেন।[৫৩৯]

দাউদ আনতাকির জ্ঞানগত অবদান

জ্ঞানসাধনায় দাউদ আনতাকি ছিলেন পরিশ্রমী এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। যদিও তিনি অন্ধ ছিলেন, কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতা তাকে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বরং একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সামসময়িকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার অনেক অবদান রয়েছে। তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো, পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ও নিরপেক্ষ সমীক্ষা। তিনি নিজের জন্য গবেষণার স্বতন্ত্র এক মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েছিলেন। এই মানদণ্ডে ১০টি মূলনীতি ছিল।

রচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে ওষুধের নাম উল্লেখ করতেন বিভিন্ন ভাষায়। তারপর ওষুধের প্রকৃতি ও পরিচয় দিতেন। উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা

৫৩৮. *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব লি ইবনি ইমাদ হাম্বলি*, ৮/৪১৬

৫৩৯. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৪৬

করতেন। উল্লেখ করতেন ব্যবহারবিধি। যদি সেই ওষুধ না পাওয়া যায়, তাহলে কোন ওষুধ সেবন করতে হবে, তাও উল্লেখ করে দিতেন।

বিভিন্ন উপাদানের ওষুধের মেয়াদ তথা ওষুধটির কার্যকারিতা কতদিন থাকবে, কখন নষ্ট হয়ে যাবে, কোথায় রাখতে হবে, ওষুধ সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদিও তিনি উল্লেখ করতেন। বিভিন্ন ভেষজ গাছ, প্রাণী ও পদার্থের নামও উল্লেখ করেছেন তিনি, যেগুলোর মাধ্যমে তৈরি করা যায় অনেক ধরনের ওষুধ।[৫৪০]

দাউদ আনতাকি ওষুধ তৈরির কিছু মূলনীতি ও চিকিৎসাপদ্ধতি বলে দিয়েছেন। সুরমা, তেল-সহ অন্যান্য মিশ্রিত পদার্থের ওষুধিগুণের বর্ণনা দিয়েছেন। যদিও তার কিছু সিদ্ধান্ত আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র সমর্থন করে না, তবুও তার অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তার গ্রন্থাবলির পাঠ অপরিহার্য।

তার সম্পর্কে আহমাদ ইবনে ঈসা বলেন, দাউদ ইবনে উমর আনতাকি কায়রোয় থাকতেন। বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তার মাঝে। তিনি ছিলেন পূর্ববর্তীদের জ্ঞানবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। দর্শন, শারীরবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। সমকালে এসব জ্ঞানে তার পারদর্শিতার কথা ছিল মানুষের মুখে মুখে। তার জ্ঞানরাজ্যে তিনি ছিলেন রাজা। তার যুগে তার মতো এমন জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ মানুষ পাওয়া ছিল খুবই দুষ্কর। তার সাহিত্যপ্রতিভা ও জ্ঞানের পরিধি দেখে মানুষ অবাক হতো। তার গুণাবলি বর্ণনায় হতবুদ্ধি হয়ে যেত। কায়রোর হাসপাতালের পথে অবস্থিত জাহেরি মাদরাসায় তিনি দিনে সময় দিতেন।

দাউদ আনতাকির ছাত্র খফাজি তার প্রশংসায় বলেন, বাহ্যিক দিক থেকে তিনি ছিলেন অন্ধ, কিন্তু জ্ঞানের বিচারে ছিলেন চক্ষুষ্মান। অদৃশ্যের পর্দার পেছনেও তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতেন। তার মতো মানুষ কেউ দেখেনি এমনকি শোনেওনি। তিনি এক অবাক বিস্ময়। তিনি কারও হাতের শিরা ধরেই তার রোগ-ব্যাধি বলে দিতে পারতেন। অবাক চোখে মানুষ তাকে দেখত। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনত। চিকিৎসা ছিল তার নেশা। বাদ্যযন্ত্রের সুর-ছন্দেও তিনি এতটা আনন্দ পেতেন না, যতটা আনন্দ পেতেন রোগীর নাড়ির স্পন্দন শুনে। কল্পনায় তিনি রোগীর রক্ত-মাংসে বিচরণ করতেন। রোগীর মন আর দেহের মাঝে বিপত্তি দেখা দিলে, তিনি মীমাংসা

৫৪০. *আল-মুজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতি ইনদাল আরব*, পৃ. ৪২১

করে দিতেন। প্রশংসা তাঁর, যিনি এই মহান ব্যক্তির চোখের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু হৃদয়কে বানিয়ে দিয়েছেন আলোর শামাদান। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ হয় না; অন্ধ হয় সেই হৃদয়, যা বক্ষদেশে বিরাজ করে।[৫৪১]

হাতের শিরা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল দাউদ ইবনে উমর আনতাকির। তিনি হাতে ধরেই চিকিৎসা বাতলে দিতেন। এ সম্পর্কে আহমাদ ইবনে ঈসা বলেন, তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই হাত দিয়ে স্পর্শ করেই তাকে রোগের অবস্থা বুঝতে হতো। তার হাতেই ছিল রোগ নির্ণয়ের অসম্ভব ক্ষমতা। বিস্ময়কর অনুমানশক্তির কারণে তিনি না দেখেই নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করতেন এবং রোগের বাহ্যিক লক্ষণগুলোও বলে দিতেন। এ বিষয়ে একটি চমৎকার ঘটনা আছে।

একবার শাসক শরিফ হাসানের কাছে তাকে আনা হলো রোগ নির্ণয়ের জন্য। কিন্তু তাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শাসক প্রথমে নিজের হাত না দিয়ে আরেকজনের হাত এগিয়ে দিতে বললেন। দাউদ আনতাকি সেই হাত ধরে মুহূর্তের মধ্যে বলে দিলেন, এটা শাসকের হাত নয়। তারপর আরেকজন হাত এগিয়ে দিলো। তিনি একই রকম উত্তর দিলেন। এরপর শাসক শরিফ হাসান নিজের হাত এগিয়ে দিলেন। সেই হাত ধরে দাউদ চুমু খেলেন। তারপর তিনজনেরই রোগ-ব্যাধির কথা জানিয়ে দিলেন। মানুষ তার দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে গেল।

কথিত আছে, শরিফ হাসান একবার তার পরিবারের কারও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে পাঠালেন। দরবারে ঢুকলেন তিনি। তাকে রোগীর কামরায় নিয়ে গেল একজন দাসী। তারপর দাসী সেখান থেকে চলে যায়। রোগীর চিকিৎসা যখন শেষ হলো, তখন সেই দাসী আবার তাকে পথ দেখিয়ে কামরার বাইরে নিয়ে আসে। দাউদ আনতাকি শরিফ হাসানকে বললেন, এই দাসী যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে কুমারী ছিল, কিন্তু বের হওয়ার সময় আমি বুঝতে পারলাম, সে তার কৌমার্য হারিয়ে ফেলেছে। শাসক শরিফ হাসান দাসীকে অভয় দিয়ে আসল ঘটনা খুলে বলতে বললেন। তখন সে অকপটে স্বীকার করল যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই সময়ের মধ্যে জোর করে ধর্ষণ

---

৫৪১. *মুজামুল আতিব্বা লি আহমাদ ঈসা বেগ*, পৃ. ১৮৬

করেছে। তারপর সেই ধর্ষককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে ঘটনা স্বীকার করে।[৫৪২]

দাউদ আনতাকির নৈতিকতা, জ্ঞান ও তাকওয়া সম্পর্কে ইবনে ইমাদ বলেন, দাউদ ছিলেন উদারমনা, মহানুভব, আল্লাহওয়ালা ও পরহেজগার ব্যক্তি। রাতে খুব কম ঘুমাতেন। রাতজেগে ইবাদত করতেন। অত্যন্ত অনুনয়বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ডাকতেন। দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত সম্পর্কে তাকে কোনো প্রশ্ন করা হলে এমনভাবে উত্তর দিতেন যে, মানুষ অবাক হয়ে যেত। অন্যের মাধ্যমে উত্তর লিপিবদ্ধ করে নিতেন। একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কখনো কখনো সম্পূর্ণ একটি খাতা শেষ করে ফেলতেন। তার উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হলো *আত-তাযকিরাহ* । এই গ্রন্থে তিনি চিকিৎসা ও দর্শনের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এক খণ্ডে এর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছিলেন। ইবনে সিনার 'রুহ' নিয়ে লেখা কবিতার বিস্তৃত ব্যাখ্যাও লিখেছিলেন তিনি।[৫৪৩]

দাউদ আনতাকির গ্রন্থাবলি

দীর্ঘ জীবনে দাউদ আনতাকি বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য নির্ভরযোগ্য দলিল ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *কিফায়াতুল মুহতাজ ফি ইলমিল ইলাজ*। সময়ের অন্যতম গ্রন্থ ছিল এটি। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তার পর্যালোচনাশক্তি প্রতিভাত হয়েছে। এই গ্রন্থে আছে পূর্ববর্তীদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর পর্যালোচনা। তা ছাড়া এখানে তিনি পূর্ববর্তীদের চিকিৎসাকেন্দ্রিক ভাবনার যথাসম্ভব ব্যবচ্ছেদ করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। তার গঠনমূলক সমালোচনা ও নিরীক্ষণ ছিল প্রবাদতুল্য।

এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে তিনি একত্র করেছেন পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের নির্বাচিত কিছু চিন্তাধারা। বলা যায় এটি ছিল চয়নিকা। তাই এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পাশাপাশি দাউদ আনতাকি এই গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব দার্শনিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। এই গ্রন্থের অধ্যায়-পরিচ্ছেদের সুবিন্যাস ও

---

[৫৪২]. *মুজামুল আতিব্বা লি আহমাদ ঈসা বেগ*, পৃ. ১৯০-১৯১

[৫৪৩]. *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব লি ইবনি ইমাদ হাম্বলি*, ৮/৪১৬

লেখকের সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার অনুপম উপস্থাপনা থেকে গ্রন্থের মূল্যমান স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।[৫৪৪]

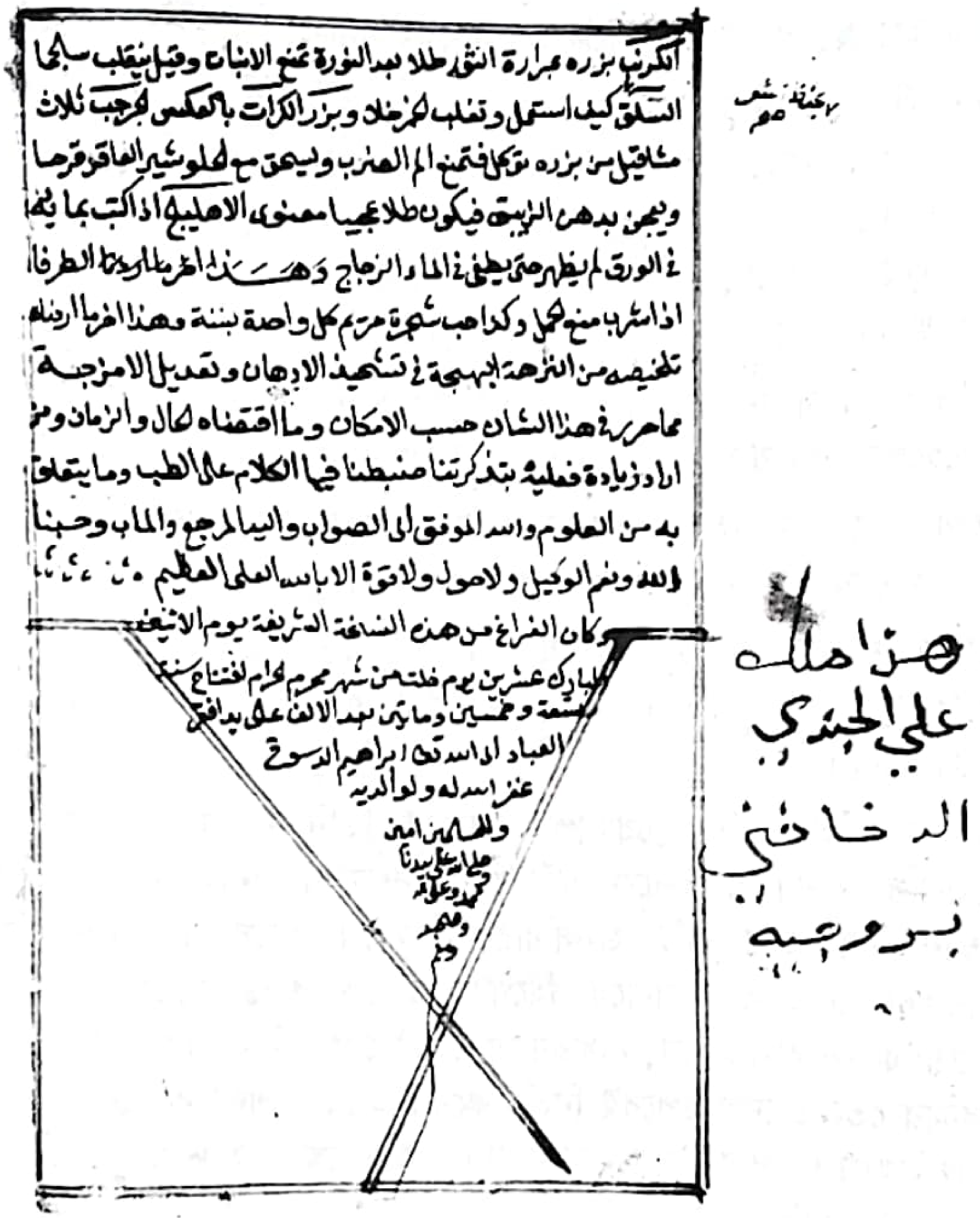
তিনি কেবল এই গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। রচনা করেছেন আরও অনেক গ্রন্থ। যেমন :

- *আল-কামিল ফিত তিব*।
- মস্তিষ্ক নিয়ে লিখেছেন *তাযকিরাতুন নুযহাতিল মুবাহাজা ফি তাশহিযিল আযহান ওয়া তাদিলিল আমযিজা*।
- দর্শন নিয়ে লিখেছেন *হাজারুল ফালাসিফা*।
- জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন *ইসতিমালুত তানজিম ফিত তিব*।
- *আল-বাহজাতু ওয়াদ দুররাতুল মুনতাখবা ফিমা সহহা মিনাল আদভিয়াতিল মুজাররবা*।
- *নুযহাতুল আযহান ফি ইসলাহিল আবদান*।
- *আলফিয়্যাতুন ফিত তিব*।
- *শারহু আইনিয়াতি ইবনিল মালাকি ফি তিব্বিল মুলুক*।
- *মাজমাউল মানাফিয়িল বাদানিয়া*।
- *যিনাতুত তুরুস ফি আহকামিল উকুল ওয়ান নুফুস* ইত্যাদি।[৫৪৫]

---

৫৪৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৬৮

৫৪৫. প্রাগুক্ত


أكثر بزره بمرارة الثور طلا بعد النورة تمنع الانبات وقيل ينقلب سالجا
السلق كيف استعمل وتغلب لحم غلاف وبزر الكراث بالعكس لوجب ثلاث
مثاقيل من بزره [illegible] فتمنع الم العقرب ويسحق مع [illegible] العاقر قرحا
ويعجن بدهن الزنبق فيكون طلا عجيبا معنويه الاهليلج اذا كتب بما يخ[illegible]
في الورق لم يظهر حتى يطفى في الماء والزجاج وهذا آخر ما اردنا الطرفا[illegible]
اذا شرب منع الحمل وكذا حب شجرة مريم كل واحدة بسنة وهذا اخر ما اردناه
تلخيصه من النزهة البهيجة في تشحيذ الاذهان وتعديل الامزجة
مما حرر في هذا الشأن حسب الامكان وما اقتضاه الحال والزمان ومن
اراد زيادة فعليه بتذكرتنا ضبطنا فيها الكلام على الطب وما يتعلق
به من العلوم والله الموفق الى الصواب واليه المرجع والماب وحسبنا
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الاثنين
المبارك عشرين يوم خلت من شهر محرم الحرام افتتاح سنة
تسعة وخمسين ومائتين بعد الالف على يد افقر
العباد الى الله تعالى ابراهيم الدسوقي
غفر الله له ولوالديه
والمسلمين آمين
وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله
وصحبه
وسلم

চিত্র নং-১৪
নুযহাতুল আযহান গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

দাউদ আনতাকির বাণী ও বক্তব্য

চিকিৎসা-সহ জ্ঞানগত বিভিন্ন বিষয়ে দাউদ আনতাকির শিক্ষণীয় অনেক উক্তি রয়েছে, যা তার জ্ঞানগভীরতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন—

জ্ঞানার্জন সম্পর্কে তিনি বলেন, যার বোধ ও বিবেচনাশক্তি রয়েছে, সে উচ্চাভিলাষী হবে, এটা খুবই লজ্জার বিষয়। জ্ঞানের মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সবাই নিজেকে জ্ঞানী মনে করে। আর মূর্খতার লাঞ্ছনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কেউ নিজেকে মূর্খ পরিচয় দেয় না। অজ্ঞ মানুষ কেবল নামেই মানুষ আর বিজ্ঞ মানুষ প্রকৃত মানুষ।

তিনি প্রায়ই মুতানাব্বির কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন, মানুষের সবচেয়ে বড় দোষ হলো, সক্ষমতা থাকার পরও কাজ অসম্পূর্ণ রাখা।

তিনি গুরুত্বের সাথে বলেছেন যে, জ্ঞান ও বিবেকের যথাযথ চর্চা ও পরিচর্যা ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে না।

তার মতো জ্ঞানের এক বিশ্বকোষ ও দার্শনিকের কাছ থেকে আমরা ইতিহাস ও বর্তমানের বহু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আরেকটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি।

চিকিৎসার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেন, চিকিৎসা ছিল রাজকীয় জ্ঞান। প্রথমদিকে এটি রাজাবাদশাদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। সম্মানহানির ভয়ে এটি জনসাধারণের মাঝে আসেনি। জনসাধারণকে চিকিৎসা দেওয়ার অপরাধে হিপোক্রেটিসকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, সাধারণ মানুষেরই তো চিকিৎসার প্রয়োজন বেশি। সরকার তো তাদের ওপরেই নির্ভর করে। আমি আশঙ্কা করছিলাম হয়তো অ্যাসফিমাস পরিবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই এ ক্ষেত্রে আমার যা করা উচিত ছিল তাই করেছি।

দাউদ আনতাকি আরও বলেন, আমিও এরকম বিষয় লক্ষ করেছি। যখন মিশরে গেলাম, তখন দেখলাম ধর্মীয় বিষয়ে সর্বজনমান্য আলেম চিকিৎসার জন্য ছুটে যাচ্ছেন ইহুদির কাছে। ফলে চিকিৎসাকে আমি অন্যান্য শাস্ত্রের অনুরূপ উপস্থাপনের প্রতিজ্ঞা করলাম, যেন এর অধ্যয়নের মাধ্যমে মুসলিমজাতি উপকৃত হতে পারে। এখানে অবশ্য একটা সমস্যাও দেখা দিলো, যা পরবর্তী সময়ে আমার অস্বস্তি ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু নির্বোধ ছাত্র আমার কাছে পড়তে এসে অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে।

পরিপূর্ণরূপে না শিখেই তারা চিকিৎসা দিতে বসে গেল। তারা একদিকে যেমন মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করে, অপরদিকে আমার থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করে বসে।[৫৪৬]

চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন। এ এক চিরন্তন উপদেশ। তার উপদেশ ছিল, চিকিৎসাবিদ্যাকে রোগী সম্মানের চোখে দেখবেন। ডাক্তারের সামনে বিনয়ী থাকবেন। এতে রোগীর প্রতি ডাক্তারের আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। ডাক্তারের কর্তব্য হলো সকল ধরনের কদর্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। দুর্বলচিত্ত রোগীদের সাহস জোগানো। এমনইভাবে ডাক্তারের এমন কোনো আচরণ করা উচিত নয়, যার ফলে রোগীরা চিকিৎসাগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। গরিব রোগীদের সুলভমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একজন ডাক্তারের নৈতিক দায়িত্ব।

চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য জ্ঞানকে দাউদ আনতাকি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। সেসব জ্ঞানের নামকরণ, পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র নির্ণয় করে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে আছে রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ফিকহ ও যুক্তিবিদ্যা।

দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি অন্তরের চিকিৎসাও করতেন। তার কিছু অমূল্য বাণী রয়েছে। যেমন :

১. উত্তম চরিত্র অর্জন করো। রোগীকে কখনো হতাশ করো না। কোনো রোগকে রোগীর কাছে বড় করে দেখিয়ে তাকে ভড়কে দেবে না।

২. রোগীর গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না। ক্রোধ নিয়ে কোনো রোগী দেখবে না। শিরা পরীক্ষার পর ফলাফল খারাপ হলে এমনভাবে বলো না যে, রোগীর মনোবল ভেঙে যায়।

৩. রোগীর থেকে অর্থ চাইবে না। ব্যক্তিস্বার্থের আগে মানবসেবার চিন্তা করবে। যে তার সর্বস্ব দিয়ে তোমার কাছে আশা করে এসেছে, তাকে সময় দেবে। তাকে যদি অবহেলা করো তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।[৫৪৭]

এভাবেই দাউদ আনতাকি মুসলিম চিকিৎসার ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। তার গ্রন্থাবলি হয়ে উঠেছে প্রাচীন চিকিৎসা-গবেষকদের প্রামাণ্য গ্রন্থে।

---

[৫৪৬]. *আল-মুজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালাতি ইনদাল আরব*, পৃ. ৪১৯-৪২০

[৫৪৭]. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৬৮

(১৮)

নাজিব সমরকন্দি : প্রাজ্ঞ চিকিৎসক

পূর্ণ নাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে উমর নাজিবুদ্দিন সমরকন্দি। তিনি হেরাতে ৬১৯ হিজরি মোতাবেক ১২২২ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাতবরণ করেন। চেঙ্গিস খান যখন বর্বর হামলা চালিয়ে হাজার হাজার আলেম হত্যা করে, তখন নাজিব সমরকন্দিও এই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। মানবসভ্যতার অপরিমেয় ক্ষতিসাধনকারী তাতারদের সর্বনাশী প্রলয় তাকেও গ্রাস করে নেয়।

নাজিব সমরকন্দি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যুগের যশস্বী চিকিৎসক হিসাবে চারদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তার। চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন অনন্য। জ্ঞানগভীরতা আর আমানতদারিতায় তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য। এ কারণেই নাজিব সমরকন্দির গ্রন্থাবলি ছিল চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল।[৫৪৮]

আবু হামিদ সমরকন্দি জ্ঞানার্জন ও অধ্যাপনার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি গ্রন্থনা ও অধ্যাপনার জন্য সমস্ত নৈমিত্তিক সম্পৃক্ততা বিসর্জন দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করতে আসত। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের মধ্য দিয়ে তিনি সামসময়িকদের মাঝে সম্মানের স্থান দখল করেছিলেন। তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর জ্ঞানতাত্ত্বিক সৃজনশীলতা অবিস্মরণীয়।[৫৪৯]

নাজিব সমরকন্দির অবদান

চিকিৎসাশাস্ত্রে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো *আল-আসবাব ওয়াল আলামাত ফিত তিব* গ্রন্থ রচনা। এটি তার অমর কীর্তি।

এ গ্রন্থটি তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার সারনির্যাস। এ ছাড়া এখানে তিনি গ্রন্থিত করেছেন ইবনে সিনার *আল-কানুন*, আলি ইবনে আহওয়াযির *কামিলুস সিনাআতিত তিব্বিয়্যা*, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ তাবারির *আল মুআলাজাতুল বুকরাতিয়্যা* গ্রন্থসমূহের সারসংক্ষেপ। এ কারণেই চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই গ্রন্থটি অতি গুরুত্বপূর্ণ।[৫৫০]

---

৫৪৮. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪১১-৪১২

৫৪৯. প্রাগুক্ত, ৪১২

৫৫০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪১২

হাজি খলিফা *আল-আসবাব ওয়াল আলামাত ফিত তিব* গ্রন্থটির ভূয়সীপ্রশংসা করে বলেন, তিনি এই গ্রন্থে প্রচলিত সকল রোগের বিবরণ একত্র করেছেন। কোনো রোগের বিবরণ, রোগের কারণ ও লক্ষণ বাদ দেননি। প্রতিটি রোগের নাম উল্লেখ করে চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ থেকে ওষুধ বলে দিয়েছেন।[৫৫১]

গ্রন্থের মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। বুরহান উদ্দিন নাফিস ইবনে ইয়াজ ইবনে হাকিম কিরমানি ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি অতি সূক্ষ্ম। এখানে তিনি গবেষণার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং আশাতীত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের রচনা শেষ করেন সমরকন্দে, ৮২৭ হিজরির সফর মাসের শেষদিকে। গ্রন্থটি তিনি সুলতান উলুগ বেগকে হাদিয়া দেন।[৫৫২]

এ ছাড়াও নাজিব সমরকন্দির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো :

১. *কিতাবুল আকরিবাজিন আল-কাবির*

২. *তারকিবুল আদভিয়াতিল কলবিয়্যা*

৩. *কিতাবু তাশরিহিল আইন*

৪. *কিতাবু আগজিয়াতিল মারদা*

৫. *আবদালুল আদভিয়া*

৬. *রিসালাতুন ফি মুদাওয়াতি ওয়াজয়িল মাফাসিল*

৭. *আল-আকরিবাজিন আস-সগির*

৮. *কিতাবুন নাজিবিয়্যাত*; এটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এখানে তিনি রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিভিন্নরকম ওষুধের কথা বলেছেন। এর মধ্যে আছে, বিযুক্ত ও যৌগিক ওষুধ, পানীয়, রেচক ওষুধ, ওষুধ তৈরির নীতিমালা ইত্যাদি। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং মূল আরবির সাথে প্রকাশিত হয়েছে পেনসিলভানিয়া প্রদেশের ফিলাডেলফিয়া শহর থেকে।[৫৫৩]

---

[৫৫১]. *কাশফুয যুনুন লি হাজি খলিফা*, ১/৭১
[৫৫২]. *কাশফুয যুনুন লি হাজি খলিফা*, ১/৭১
[৫৫৩]. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪১৩



চিত্র নং-১৫

নজিব সমরকন্দির রচিত আল-আসবাব ওয়াল আলামাত গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

তার রচনাবলি বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক যুগের আরব মুসলিম চিকিৎসকদের বহু তথ্য তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি কেবল তথ্যই সরবরাহ করেননি বরং তিনি সেগুলো শুদ্ধভাবে যাচাই-বাছাই ও সংশোধন করে উপস্থাপন করেছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নাজিব সমরকন্দির অভিনব এবং অভূতপূর্ব কিছু চিন্তাধারা রয়েছে, যা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুসলিম বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলো তার গ্রন্থমালায় ভরপুর। সপ্তম হিজরি শতাব্দী থেকে ইসলামি বিশ্বের উৎকর্ষে তার গ্রন্থসমগ্র এক শক্তিশালী ভিত হিসাবে বিবেচিত। এটা নাজিব সমরকন্দির গ্রহণযোগ্যতার দলিল। চিকিৎসাসেবায় সমরকন্দি সবসময়ই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর নির্ভর করতেন। তার প্রতিটি গবেষণাকর্মই ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। তাইতো তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে বরিত।[৫৫৪]

নাজিব সমরকন্দি ছিলেন ইসলামি সভ্যতার অমূল্য সম্পদ। ইলমে-আমলে ও তাকওয়া-পরহেজগারিতে এক অনন্য উপমা। তিনি সবসময় তার অর্জন ও জ্ঞানকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করতেন। পক্ষান্তরে প্রাচীন সভ্যতায় মানুষ জ্ঞানকে স্রষ্টার বিচ্ছিন্ন অংশ মনে করত। তারা মনে করত প্রতিটি নতুন জ্ঞান একদিকে যেমন মানবজাতির উৎকর্ষ সাধন করে তেমনই অপরদিকে স্রষ্টার অধঃপতন ঘটায়। নাজিব সমরকন্দি প্রতিটি গ্রন্থের শুরুতে মূল্যবান এই বাক্যটি লিখে রাখতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ নেয়ামতরাজি দান করেছেন।[৫৫৫]

(১৯)

ইবনে তুফাইল : দার্শনিক চিকিৎসক

একজন মহামানব এবং জ্ঞানের বিশ্বকোষ। সারা পৃথিবী তাকে একজন মহান দার্শনিক হিসাবে চেনে। তবে মুসলিম আন্দালুসের খলিফাদের নিকট তার অবদান বিচক্ষণ চিকিৎসকের প্রমাণ বহন করে। তার রচিত দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার রচনাবলিও আমাদের সে বিষয়ে অবগত করে।

---

৫৫৪. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪১৩-৪১৪

৫৫৫. *কাশফুয যুনুন লি হাজি খলিফা*, ১/৭৭

তার পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তুফাইল। উপনাম আবু বকর। তিনি ইবনে তুফাইল নামে পরিচিত। তাকে প্রসিদ্ধ আরব গোত্র কায়েসি বংশোদ্ভূত বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন আরবরা দুভাগে বিভক্ত ছিল, কায়েসি গোত্র আর ইয়ামেনি গোত্র।

ইবনে তুফাইল গুয়াডিক্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এটি গ্রানাডার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি শহর। তার জন্মতারিখ নিয়ে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যিরিকলি সাব্যস্ত করেছেন যে, তার জন্মসন ৪৯৪ হিজরি/১১০০ খ্রিষ্টাব্দে।[৫৫৬] অন্যদিকে ঐতিহাসিক উমর কাহহালা বলেন, তিনি ৫০৬ হিজরি/১১১০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৫৭]

ইবনে তুফাইলের শৈশব ও তার বেড়ে ওঠা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে জীবনের প্রথমদিকেই তিনি গ্রানাডায় জ্ঞান অর্জনের জন্য গমন করেন। সেখানেই তার জ্ঞানের উন্মেষ এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটে। সেখানেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র শেখেন এবং লিপিকারের কাজ শুরু করেন। তিনি গ্রানাডার আমিরদের লিপিকার হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন শাসক আবু জাফর ও শাসক আবুল হাসান ইবনে মিলহানের ঘনিষ্ঠজন।[৫৫৮] বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রানাডার শাসকের লিপিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫৫৯] একসময় তিনি গ্রানাডার প্রাসাদের উজিরও হয়েছিলেন।[৫৬০]

ইবনে তুফাইলের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে আবদুল মুমিন তাকে উজির ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কারণ খলিফা আবু ইয়াকুব নিজেও ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ব্যক্তি। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনের গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করার আদেশ দিয়েছিলেন। ফলে তার সংগৃহীত গ্রন্থমালা আন্দালুসিয়ার উমাইয়া খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর যুগের উমাইয়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থভান্ডারের সমপর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

৫৫৬. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৬/২৪৯
৫৫৭. *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ১০/২৫৯
৫৫৮. *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা লি লিসানুদ্দিন ইবনি খতিব*, ২/৪৭৯
৫৫৯. *আত-তুহফা লি ইবনিল আবার* (আল-ইহাতা থেকে সংগৃহীত)
৫৬০. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৬৪

ইবনে তুফাইল মাগরিব[৫৬১] অঞ্চলে খলিফার নিকট বহু উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হন। মারাকেশি বলেন, খলিফা আবু ইয়াকুব তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। আমার কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইবনে তুফাইল দীর্ঘকাল রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেছেন।[৫৬২]

প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে রুশদের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির পেছনেও ইবনে তুফাইলের অবদান ছিল। কারণ তিনি ইবনে রুশদকে গ্রানাডার বিস্তৃত অঙ্গনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আবু ইউসুফ মুওয়াহহিদির সঙ্গে। খলিফার নিকট তিনি সমাদৃত হন। এভাবেই তিনি পরিণত হন মানব-ইতিহাসের এক কিংবদন্তিতে।

ইবনে তুফাইল ছিলেন এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। একাধারে তিনি ছিলেন আলেম, শাসক, হাকিম, দার্শনিক, গবেষক, সুফি-সাধক, চিকিৎসক, ফকিহ, কবি ও শক্তিমান গদ্যশিল্পী।[৫৬৩]

ইবনে তুফাইলের রচনাবলি

ইবনে তুফাইলের বহুমুখী প্রতিভার ছাপ আছে তার সমগ্র রচনাকর্মে। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তিনি একটি কবিতা রচনা করেছেন, যা ৭ হাজার ৭০০ পঙ্‌ক্তিরও অধিক। সেই কবিতাটি এখনো ফেজ শহরের কারাউইন গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিরূপে বিদ্যমান। গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিটির ক্রমিক নং ৩১৫৮।[৫৬৪]

একদিকে তিনি কবিতার মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে তার প্রসিদ্ধ দর্শনের বই *রিসালাতু হাই ইবনে ইয়াকযান*-এ লিখেছেন তার চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা। তিনি সেখানে গল্পের মূল চরিত্র হাই ইবনে ইয়াকযানের মুখে হরিণব্যবচ্ছেদপ্রক্রিয়া তুলে

---

৫৬১. **মাগরিব :** বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মরক্কোকে আরবিতে মাগরিব বলা হলেও অতীতে মাগরিব বলে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হতো। বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত, সেগুলোকে বলা হতো মাগরিব। ব্যাপকতর অর্থে কেউ কেউ লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত ধরতেন। অ্যাটলাস পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকার বাকি অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন।-সম্পাদক

৫৬২. *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, পৃ. ৩১২

৫৬৩. *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা লি-লিসানুদ্দিন ইবনি খতিব*, ২/৪৭৯

৫৬৪. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৬/২৪৯

ধরেছেন এবং ত্বক থেকে হৃৎপিণ্ড—সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।[৫৬৫]

এ ছাড়াও তার আরও দুটি গবেষণাপত্র আছে চিকিৎসাশাস্ত্রে।[৫৬৬] ওষুধের প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিক চিকিৎসক ইবনে রুশদের সঙ্গে তার বিভিন্ন আলোচনাও সংকলিত হয়েছে ইবনে রুশদের একটি গ্রন্থে।[৫৬৭]

ইবনে তুফাইলের জীবনীকারগণ বিভিন্ন শাস্ত্রে তার রচনাবলির কথা বলেছেন, যেমন প্রকৃতিবিদ্যা, দর্শন, অধিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি।

জ্যোতির্বিদ্যায় তার স্বতন্ত্র মতবাদ ছিল। তিনি টলেমির মতবাদের বিরোধিতা করতেন। এ ব্যাপারে তার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ শিষ্য আবু ইসহাক বাতরোজি মন্তব্য করেন, এই স্বতন্ত্র মতবাদের ক্ষেত্রে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ জ্যোতির্বিদ্যায় তার দখল ছিল অসামান্য।[৫৬৮] তার আরও দুটি গ্রন্থ আছে, *আসরারুল হিকমাতিল মাশরিকিয়া* এবং *নফস*।[৫৬৯]

তবে পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের হাতে তার সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার থেকে পৌঁছেছে শুধু *হাই ইবনে ইয়াকযান* ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি, যা সংরক্ষিত আছে কারাউইন গ্রন্থাগারে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা, জ্ঞানের গভীরতা ও যোগ্যতার কথা জানা যায় *নাফহুত তিব* গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক মুকরি থেকে। তিনি তার সংকলিত ইতিহাসগ্রন্থে আন্দালুসের ক্ষণজন্মা পুরুষদের ইতিহাস সংকলন করেন। সেখানে ইবনে তুফাইলের জীবনের উল্লেখ করে দর্শনে তার অগাধ দখলের কথা বলেন। তারপর তিনি লেখেন, আন্দালুসের আছে চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে তুফাইলের মতো একজন ব্যক্তি, দর্শনশাস্ত্রের ওপর যিনি রচনা করেছেন *হাই ইবনে ইয়াকযানের* মতো বিখ্যাত গ্রন্থ। অন্যদের কি এমন কেউ আছে?[৫৭০]

---

৫৬৫. *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামিয়্যি*, পৃ. ৩৪৪
৫৬৬. *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ১০/২৫৯
৫৬৭. *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৬/২৪৯
৫৬৮. *তারিখু ফালাসিফাতিল ইসলাম ফিল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি*, পৃ. ৯৮
৫৬৯. *মুজামুল মুআল্লিফিন*, ১০/২৫৯; *আল-আলাম লিয যিরিকলি*, ৬/২৪৯
৫৭০. *নাফহুত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব*, ৩/১৯৩

ইসলামি সভ্যতা তার সন্তানদের অন্তরে যে নৈতিক ও আদর্শিক গুণাবলি গেঁথে দিয়েছে ইবনে তুফাইল তারই বহিঃপ্রকাশ করবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে?! যে জীবনে রয়েছে ধর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়। তারা বিশ্বাস করে, জ্ঞান হলো ইবাদত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত। জ্ঞানের অন্বেষণ আবশ্যক। আর প্রজ্ঞা হলো মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই পাবে কুড়িয়ে নেবে। কেননা সে-ই এর অধিক হকদার।

মারাকেশি তার সম্পর্কে আরও বলেন, শেষজীবনে ইবনে তুফাইল অধিবিদ্যার প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েন। অন্যান্য সমস্ত বিদ্যা থেকে বিরতি নেন। তিনি জ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলতেন। বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার চিন্তাকে সম্মান করতেন। ধর্মীয় জ্ঞানেও তার পারদর্শিতা এবং জানাশোনা ছিল ব্যাপক। তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু কাজের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করতেন। যেমন চিকিৎসা, প্রকৌশল, লেখালেখি, কাব্যরচনা, তিরনিক্ষেপ, সেনাদল পরিচালনা ইত্যাদি। তিনি বলতেন, সংগীতবিদ্যার জন্য কাউকে বেতন দেওয়া হলে আমি সেটাও পেতাম।[৫৭১]

আল্লাহ তাআলা ইবনে তুফাইলের প্রতি রহম করুন। তার হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানভান্ডার প্রচুর। মুসলিমশাসিত ইসলামের বিস্তৃত ভূখণ্ডে লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছে তার জ্ঞানগত ঐতিহ্য। কিংবা মাটির নিচে প্রোথিত হয়ে আছে সেগুলো। যারা তার হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানভান্ডার মানবজাতিকে উপহার দেওয়ার দুঃসাধ্য কাজে এগিয়ে আসবে তাদের অগ্রিম মোবারকবাদ।

(২০)

ইবনে রিদওয়ান মিশরি : চিকিৎসাশাস্ত্রের বরপুত্র

ইসলামি ইতিহাসের এক মনীষী। সমকালে সমগ্র মিশরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তার মেধা ও প্রতিভার বহু গল্প রয়েছে।

পূর্ণ নাম আবুল হাসান ইবনে রিদওয়ান ইবনে আলি ইবনে জাফর। তিনি মিশরের গিজা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই বেড়ে ওঠেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে

---

৫৭১. *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, পৃ. ৩১২

প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ৪৫৩ হিজরি মেতাবেক ১০৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৫৭২]

ইবনে রিদওয়ান মিশরি ছিলেন নিজ গুণে মহীয়ান একজন ব্যক্তি। ১৪ বছর বয়সে বাবাকে হারান।[৫৭৩] এরপর তিনি পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য চিকিৎসা, অধ্যাপনা-সহ বিভিন্ন কাজে রত হন। এভাবেই একদিন তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন। তারই বর্ণনামতে তখন তার বয়স ছিল ৩২ বছর।[৫৭৪] চিকিৎসাশাস্ত্রের পারদর্শিতাই তার সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের ভিত বিনির্মাণ করে দেয়।

ইবনে রিদওয়ান ফাতেমি সাম্রাজ্যে বসবাস করতেন। চিকিৎসা-দক্ষতায় তিনি তৎকালীন মিশরের শাসকের[৫৭৫] ব্যক্তিগত চিকিৎসক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৫৭৬]

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে রিদওয়ানের ব্যুৎপত্তি অর্জনের একটি ঘটনা আছে। শৈশবে তিনি একবার চিকিৎসাশাস্ত্র শেখার জন্য এক শিক্ষকের কাছে গিয়েছিলেন। শিক্ষক তাকে একটি গ্রন্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু পাঠ করে শোনাতেন। তিনি ওই শিক্ষক থেকে চলে আসেন। তিনি শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থমালা গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। চিকিৎসাবিদ্যার তাত্ত্বিক সঞ্চয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন মহান চিকিৎসক আবুল হাসান আলি ইবনে রিদওয়ান।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এক গ্রন্থে বলেন, শিক্ষকদের থেকে অর্জিত জ্ঞান থেকে বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি। সমকালীন ও পরবর্তীদের অনেকে তার এ কথাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। বিশেষ করে ইবনে বুতলান, তিনি এই মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করেছেন।

---

৫৭২. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৪১১

৫৭৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৬

৫৭৪. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৪০২ ও তার পরবর্তী আলোচনা।

৫৭৫. খুব সম্ভব তিনি হবেন খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ। সাফাদি মিশরের শাসক বলে তাকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন, খলিফা হাকেম বি-আমরিল্লাহকে না। কেননা হাকেম বি-আমরিল্লাহ ৪১১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইবনে রিদওয়ান তখনও দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেননি। সুতরাং তখন তার প্রধান চিকিৎসক হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

৫৭৬. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত লি সাফাদি*, ২১/৭৪

জ্ঞানীদের মন্তব্য

যারা ইবনে রিদওয়ানের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন, তারা যদিও তার স্বতন্ত্র মতবাদের ক্ষেত্রে একমত নয় তবু চিকিৎসাশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্বের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। স্বীকার করেছেন দর্শনশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা। তারা বলেছেন, তিনি ছিলেন সেই মহান মনীষীদের অন্তর্ভুক্ত যারা বহু শাস্ত্রে সমানভাবে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

ইমাম যাহাবি লেখেন, ইবনে রিদওয়ান অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। প্রভাবশালী ইসলামি দার্শনিক।[৫৭৭] ইমাম যাহাবি আরও বলেন, ইবনে রিদওয়ান উঁচুমানের দার্শনিক। পরবর্তীকালে চিকিৎসাশাস্ত্রে মনোযোগ দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি সকলকে ছাড়িয়ে যান। তিনি দর্শনশাস্ত্রকে সংহত করেন। গভীরভাবে দর্শনকে আয়ত্ত করেছিলেন এবং পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতাদর্শ ও ভুলগুলো চিহ্নিত করেন। কোনো শাস্ত্র বা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কেবল পুথিনির্ভরতার ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং সাব্যস্ত করেছিলেন, এটি শিক্ষকের থেকে অধিক ফলপ্রসূ। এটি একটি ভ্রান্ত চিন্তা। তিনি একত্ববাদী মুসলিম ছিলেন।[৫৭৮]

ইবনে তাগরি বারদি লেখেন, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন মহান দার্শনিক। চিকিৎসা ও কৌশলে তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। তিনি আপন শাস্ত্রের পুরোধা ব্যক্তিদের ভুল মতবাদ অধিকহারে খণ্ডন করতেন।[৫৭৯]

ইবনে ইমাদ হাম্বলি তার ব্যাপারে লেখেন, ...দার্শনিক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা। চিকিৎসাশাস্ত্রের মহান পথিকৃৎ।[৫৮০]

ঐতিহাসিক মাকরিযি দর্শন ও চিকিৎসা ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ে ইবনে রিদওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন পিরামিডের স্থাপত্যকৌশল, মিশরের জনগণের মন-মানস এবং মিশরের ভূগোল ও ইতিহাস ইত্যাদি।[৫৮১]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষক বা গ্রন্থের ওপর নির্ভরতার মতবাদে ইবনে রিদওয়ান এবং ইবনে বুতলানের মাঝে আবর্তিত তাত্ত্বিক বিবাদের আলোচনা করতে

---

৫৭৭. *তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি*, ৩০/৩৪৫
৫৭৮. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৮/১০৫
৫৭৯. *আন-নুজুমুয যাহিরা ফি তারিখি মিশর ওয়াল কাহিরা লি ইবনি তাগরি বারদি*, ৫/৭০
৫৮০. *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব লি ইবনি ইমাদ হাম্বলি*, ৩/২৯১
৫৮১. *আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার লি মাকরিযি*, ১৩২, ৬৭১, ৭৪৪

গিয়ে ইবনে আবি উসাইবিয়া ইবনে রিদওয়ানের ব্যাপারে জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়ে লেখেন, ইবনে বুতলান ছিলেন প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী। প্রফুল্লচিত্ত ও শক্তিমান লেখক। অন্যদিকে ইবনে রিদওয়ান ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রে মহান দিকপাল। দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানে অধিক জ্ঞাত।[৫৮২]

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে রিদওয়ানের অবদান

আবুল হাসান আলি ইবনে রিদওয়ান রোগীর অসুস্থতার মূল কারণ নির্ণয়ে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। রোগীকে পরীক্ষা করার চমৎকার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। এ সবকিছু চিকিৎসাশাস্ত্রে তার বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। আধুনিক যুগের ডাক্তাররা তার রোগী পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তার অনুসৃত পথ ও পন্থা বর্তমানকালের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থার সাথে অধিকাংশ বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৫৮৩]

চিকিৎসাশাস্ত্রে রচিত ইবনে রিদওয়ানের গ্রন্থগুলো শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নৈতিকতা ও আদর্শিক বিষয়েও সেখানে যথেষ্ট পাথেয় বিদ্যমান। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *আন-নাফি ফি কাইফিয়াতি তালিমি সিনাআতিত তিব*। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীর জন্য চিকিৎসাশিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। তারপর চিকিৎসার শিক্ষার্থীদের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অর্জনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার পরিচায়ক নিদর্শনসমূহ আলোচনা করেছেন।[৫৮৪]

ইবনে রিদওয়ানের রচনাবলি

যারা ইবনে রিদওয়ানের জীবনী লিখেছেন তাদের প্রত্যেকেই তার গ্রন্থাধিক্য সম্পর্কে বলেছেন। তার গ্রন্থগুলোর কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রের পুরোধা ব্যক্তিদের সমালোচনায় লেখা, আর কিছু জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র দর্শনের ওপর লেখা। এসব গ্রন্থ সমীক্ষা, পর্যালোচনা ও ধারালো যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ। তার দ্বীনদারি ও সুকুমারবৃত্তির প্রশংসা ও সাক্ষ্য রয়েছে।

সাফাদি লেখেন, তার স্বতন্ত্র গবেষণায় মন্দের দিক থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ধার্মিক, মানবতার কল্যাণকামী এবং একত্ববাদী।[৫৮৫] যাহাবি

৫৮২. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ২/২৪৮
৫৮৩. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৮-৩২৯
৫৮৪. প্রাগুক্ত
৫৮৫. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত লি সাফাদি*, ২১/৭৫

রহ. এটাকে সমর্থন করে লেখেন, তিনি ছিলেন একত্ববাদী মুসলিম।[৫৮৬] হয়তো এ কথাই বুঝিয়েছেন ইবনে তাগরি বারদি, তার মাঝে আখলাক ও চরিত্রের মাধুর্য ছিল।[৫৮৭]

একজন মানুষ, যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের সবকিছু গ্রন্থের পাতা থেকে শিখেছেন, যুক্তি-প্রতিযুক্তির ময়দানে জীবন কাটিয়েছেন, তার গ্রন্থের পরিমাণ হবে বিপুল পরিমাণ, এটাই স্বাভাবিক। ইবনে রিদওয়ানের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় শখানেক। ইবনে আবি উসাইবিয়া *তাবাকাতুল আতিব্বা* গ্রন্থে সাত পৃষ্ঠাজুড়ে সেগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন।[৫৮৮] তবে দুঃখজনক হলো সেগুলোর অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য।[৫৮৯] ইবনে রিদওয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ চিকিৎসাশাস্ত্রে রচিত *আন-নাফি ফি কাইফিয়াতি তাআল্লুমি সিনাআতিত তিব*। এ ছাড়া তার উল্লেখযোগ্য আরও কিছু গ্রন্থ হলো :

১. গ্যালেনের *কিতাবুল আরাক*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

২. গ্যালেনের *কিতাবুস সিনাআতে সাগিরা*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

৩. গ্যালেনের *কিতাবুন নাবদিস সাগির*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

৪. আগলুকানের প্রতি গ্যালেনের লেখা কিতাব *আত-তাআননি লি শিফাইল আমরায*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

৫. গ্যালেনের *কিতাবুল ইসতিকসাত*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

৬. গ্যালেনের *কিতাবুল মেজায*-এর আংশিক ব্যাখ্যা

৭. *কিতাবুল উসুল ফিত তিব*

৮. *রিসালা ফি ইলাজিল জুযাম*

৯. *কিতাবু তাতাব্বুই মাসাইলি হুনাইন*

১০. হিপোক্রেটিসের *নামুসুত তিব*-এর ভাষ্যগ্রন্থ

১১. হিপোক্রেটিসের উপদেশমালার ভাষ্যগ্রন্থ

১২. *কালামুন ফিল আদভিয়াতিল মুসহিলা*

১৩. *কিতাবুন ফি আমালিল আশরিবাতি ওয়াল মাআজিন*

---

৫৮৬. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৮/১০৫

৫৮৭. *আন-নুজুমুয যাহিরা ফি তারিখি মিশর ওয়াল কাহিরা লি ইবনি তাগরি বারদি*, ৫/৭০

৫৮৮. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৪১৩-৪২০

৫৮৯. *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৯

এ ছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনে রিদওয়ানের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রেও রয়েছে অনেক গ্রন্থ।

ইবনে রিদওয়ান ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। তার রচিত আত্মজীবনী ও বিভিন্ন গ্রন্থে লিখিত অসিয়ত থেকে আমরা তার মাঝে একজন সুশৃঙ্খল পরিশ্রমী এবং অল্পেতুষ্ট মানুষের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। যিনি সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। নিজের কর্মের হিসাব নেন এবং আত্মসমালোচনা করেন। খাদ্য ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শরীরের যত্ন নেন। ভালো কাজে সময় দেন। নিজেকে এবং পরিবারকে সময় দেন। সময়কে তিনি প্রতিটি কাজের জন্য ভাগ করে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, প্রতিদিন আমার ব্যক্তিগত কাজে নির্দিষ্ট একটি সময় ব্যয় করি। স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় শরীরচর্চা করি। শরীরচর্চার পর পরিমিত আহার করি। মানুষের সাথে বিনয়, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার আচরণ করি। বিপদ্‌গ্রস্তকে সাহায্য করি। সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর আহারে ও ঘরবাড়ি নির্মাণ ও সংস্কারে এ পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করি, যা অপচয়ের পর্যায়ে পড়ে না আবার কার্পণ্যও হয় না। ঘরের আসবাবপত্রের খোঁজখবর নিই। মেরামতের প্রয়োজন হলে মেরামত করি। বাড়িতে প্রয়োজন পরিমাণ আহার, পানীয় ও পোশাক-আশাকের ব্যবস্থা করি। উদ্‌বৃত্ত সম্পদ ভালো কাজে ব্যয় করি। কাপড়চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখি। কথা কম বলি। কখনো মানুষের দুর্নাম করি না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলি না। মানুষের মতামতের নিন্দা ও অহেতুক কসম থেকে দূরে থাকি। আত্মপ্রবঞ্চনা ও সর্বদা বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছায় লিপ্ত থাকি না। গুরুতর বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করি। যতটুকু সম্ভব হিম্মত রেখে প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। সমস্ত কাজ শেষে দিনের অবসর সময়ে আমি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যয় করি। আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টার তাসবিহ পড়ি ও তাঁর কুদরত নিয়ে চিন্তাভাবনা করি।[৫৯০]

আরব সভ্যতায় এমনই ছিল জ্ঞানের সাথে ঈমানের অপূর্ব মিলন। তাই আমরা একজন চিকিৎসক থেকে যেভাবে শিখতে পারি চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্ঞানগর্ভ উক্তি ঠিক একইভাবে শিখতে পারি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, অল্পেতুষ্টি সর্বোপরি ঈমান ও বিশ্বাসের মাধুর্য। কারণ আমাদের ঐতিহ্য ও সভ্যতা মানুষকে সূচনা থেকেই হৃদ্যতা ও মানবতার মহাবাণী শিক্ষা দেয়।

---

৫৯০. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, ৩/৪০৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

উপসংহার

চলতে চলতে এসে পড়েছি সমাপ্তিতে। বিশ্ববাসীকে বলব, এতগুলো পৃষ্ঠাজুড়ে যে চিত্র তুলে ধরা হলো তা মানবতার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমজাতির গৌরবময় ইতিহাসের বাস্তব গল্প। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ এক অনন্য আলোকিত অধ্যায়, মানবতার গর্ব ও আলোর মিনার। যেদিন থেকে মুসলিমজাতি যাত্রা শুরু করেছে বিজ্ঞানের পথে, ডুব দিয়েছে জ্ঞানসাগরে সেদিন থেকে কেউ তাদের রুখতে পারেনি। মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারেনি। ইসলামের উন্মেষকাল থেকেই তারা এগিয়ে গিয়েছেন অপ্রতিরোধ্য গতিতে। শাসক ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা স্থিতি লাভ করেছেন। তারা মুসলিমজাতিকে এমন এক সভ্যতা উপহার দিয়েছেন যার ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছে সকল ধর্ম, জাতি ও বর্ণের মানুষ। এই সভ্যতা শত্রুর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মানবতাকে দেখিয়েছে সত্য, সুন্দর ও সফলতার রাজপথ। আধুনিক জাতি ও সভ্যতা বিনির্মাণে তারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা দাবি করছি না যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের সকল অবদান আমরা উল্লেখ করতে পেরেছি। তবে আমরা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের সামনে একটি বদ্ধ কপাট খুলে দিয়েছি। মানুষ যেন ইসলামি সভ্যতাকে ভালোভাবে পাঠ করে দেখে। তাহলে তারা নিজেরাই ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য, প্রগতি, উৎকর্ষ, মানবতাবোধ ও বৃহৎ জ্ঞানভান্ডার আবিষ্কার করতে পারবে।

বিশেষভাবে আমি মুসলিমদের অনুরোধ করব, আপনারা গভীরভাবে আপনাদের ইতিহাস পাঠ করুন। আপনাদের সন্তান ও সমাজের সামনে তা যথাযথভাবে তুলে ধরুন। তারা যেন বুঝতে পারে আমরা এমন কোনো জাতি নই যাদের কোনো ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই। বরং আমরাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ সভ্যতার কারিগর। গৌরবময় অতীত আমাদের। সকল জাতি ও গোষ্ঠী এর সাক্ষী। সিগরিড হুংকে পাশ্চাত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে বলেছেন, আরবরাই গ্রিক থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা, চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোকে নতুন

রূপ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আরবরাই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানির্ভর বৈজ্ঞানিক গবেষণাধারার সূচনা করেছে। আরবরা গ্রিক সভ্যতাকে বিলুপ্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। এরপর তা সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করে পশ্চিমাদের উপহার দিয়েছে। তারা কেবল এতটুকুই করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং নিঃসংকোচে বলা যায় আরবরাই রসায়ন, পদার্থ, পাটিগণিত, বীজগণিত, ভূতত্ত্ব, ত্রিকোণমিতি এবং সমাজবিজ্ঞানের জনক। এ ছাড়াও তারা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য-অগণন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জনক। দুঃখজনক হলেও সত্য, এগুলোর অধিকাংশই চুরি হয়ে গেছে এবং আরেকজনের নামে বাজারে চলছে। সঠিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি আবিষ্কার আরবজাতির অমূল্য উপহার। এই কৌশল পশ্চিমাদের সামনে পদার্থের গূঢ় রহস্য জানার এবং বস্তুনিচয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পথ মসৃণ করে দিয়েছে।[(৫৯১)]

অমুসলিমদের আমি বলতে চাই, আপনারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও একনিষ্ঠতার সাথে আমাদের ইতিহাস পাঠ করুন। সত্যনিষ্ঠ মুসলিমদের লিখিত বইপত্র পাঠ না করে, যারা মিথ্যা ও উদ্ভট কথা লেখে তাদের বইপত্রের প্রতি আস্থাশীল হওয়া ইনসাফের নয়। একইভাবে যারা ইসলামবিদ্বেষী তাদের লেখাজোখা থেকেও ইসলামের ইতিহাস জানা উচিত নয়। নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাস সচেতনভাবেই বিকৃত করা হয়েছে। ইচ্ছা করেই ইসলামের ইতিহাসকে মিথ্যা সাজানো হয়েছে। ইসলামি সভ্যতার নিদর্শনসমূহ মিটিয়ে দেওয়া এবং মুসলিমজাতির স্মৃতিপট থেকে ইসলামের যশোগাথা মুছে ফেলার নেপথ্যে কাজ করেছে অনেক প্রাচ্যবিদ ও তথাকথিত সংস্কারক। একদল ইতিহাসকে বিকৃত করে তো আরেকদল ইতিহাস নিয়ে মিথ্যা নাটক মঞ্চস্থ করে। কেউ সঠিক ইতিহাস রেখে ভুল ইতিহাস গ্রহণ করে আবার কেউ মুসলিম মনীষীদের অবদান, গুণাবলি আর প্রকৃত ইতিহাস চেপে গিয়ে কেবল ভুলটাই বড় করে তুলে ধরে—এরা সবাই পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছে। ফলে তাদের হাতে ইসলামের ইতিহাস এতটাই বিকৃত হয়েছে যার সাথে বাস্তবতার আদৌ কোনো সামঞ্জস্য নেই।

হায়, যদি বিশ্বের সত্যানুসন্ধানী প্রত্যেক গবেষক এবং পৃথিবীর কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তি ইসলামকে তার মৌলিক উৎস ও স্বচ্ছ নির্ঝরিণী থেকে অধ্যয়ন করত!

---

৫৯১. *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪০১-৪০২

মানুষ যদি ইসলামের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠ ছেড়ে দেয় তাহলে তো পৃথিবী বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং বিনষ্ট হবে জ্ঞানগত বিপুল ঐতিহ্য। ইসলামি জ্ঞানের এই আসর মানবসভ্যতার দীর্ঘ পথচলায় চলে আসা নিছক কোনো আসর না। বরং ইতিহাসজুড়ে রয়েছে এর গভীর প্রভাব। মুসলিম সভ্যতা পূর্ববর্তীদের যা-কিছু মঙ্গল ও কল্যাণকর তা সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি অতীত ঐতিহ্যকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত, নান্দনিক ও অনবদ্য করে তুলেছে।

মুসলিম সভ্যতার অন্য কোনো দিক নিয়ে পরবর্তী সময়ে পাঠকদের সাথে আবার বসার ইচ্ছা আছে। মুসলিম সভ্যতার পরিসর কতই-না বিস্তৃত! আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন মুসলিমজাতি ফিরে যাবে তাদের গৌরবের অতীতে। তারা গৌরবময় ইসলামি সভ্যতার উপকরণকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করবে। প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার সমন্বয়ে এমন এক সভ্যতা তারা বিনির্মাণ করবে যার দৃষ্টান্ত পূর্বাপর কোনো সভ্যতায় নেই। এভাবেই সকল সভ্যতার মধ্যে তাদের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে আসবে। মুসলিমজাতি যেন মানবতার মহাযাত্রাকে পূর্ণতার স্বাদ দিতে পারে। হায় এই পথ আজ তমসাচ্ছন্ন! তবুও একদিন মুসলিমজাতির কান্ডারিরা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করবে বলে আমি আশাবাদী।

দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাঁর নুরকে পরিপূর্ণ করেন, তা কাফেরদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক। আল্লাহ তাআলাই সরল পথ দেখান, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক।

❁❁❁

তথ্যপঞ্জি

এক. আল-কুরআনুল কারিম

দুই. হাদিস ও আসারের গ্রন্থ

- ইবনে আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুফি : *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদিসি ওয়াল আসার*, নিরীক্ষক : কামাল ইউসুফ আল-হুত, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি।
- ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ তামিমি বুসতি : *সহিহ ইবনে হিব্বান বি তারতিবি ইবনে বালবান*, নিরীক্ষক : শুআইব আরনাউত, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরি।
- ইবনে হাজার, আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলি আসকালানি : *ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি।
- ইবনে হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আহমাদ আশ-শাইবানি : *আল-মুসনাদ*, মুআসসাসাতু কুরতুবা, কায়রো।
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশআস সিজিস্তানি আযদি : *সুনানু আবি দাউদ*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, দারুল ফিকর।
- বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আবু আবদুল্লাহ জুফি : *আল-আদাবুল মুফরাদ*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকি, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।
- বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আবু আবদুল্লাহ জুফি : *আল-জামিউল সহিহুল মুখতাসার*, নিরীক্ষক : মুসতফা দিব আল-বুগা, দারু ইবনে কাসির, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন : *শুআবুল ঈমান*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ সাইদ বাসয়ুনি যগলুল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি।

- তিরমিজি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আবু ঈসা সুলামি : *আল-জামিউস সহিহ*, নিরীক্ষক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের ও অন্যান্য, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- হাকিম, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি : *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, নিরীক্ষক : মুস্তফা আবদুল কাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ।
- তবারানি, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ুব : *আল-মুজামুল কাবির*, নিরীক্ষক : হামদি ইবনে আবদুল মাজিদ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মাওসিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
- তবারানি, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ুব : *আল-মুজামুল আওসাত*, নিরীক্ষক : তারেক ইবনে আওদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ও আবদুল মুহসিন ইবনে ইবরাহিম হুসাইনি, দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হিজরি।
- মালেক ইবনে আনাস ইবনে আমের আসবাহি : *আল-মুয়াত্তা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
- মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আবুল হুসাইন কুশাইরি নিশাপুরি : *সহিহ মুসলিম*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- নাসায়ি, আহমাদ ইবনে শুআইব আবু আবদুর রহমান : *আল-মুজতাবা মিনাস সুনান*, নিরীক্ষক : আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

তিন. তাখরিজ ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ

- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলি : *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদিসিল ওয়াহিয়া*, নিরীক্ষক : খলিল মেস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।
- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলি : *গরিবুল হাদিস*, নিরীক্ষক : আবদুল মুতি আমিন কালআজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।

- ইবনে কুতাইবা, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম দিনাওয়ারি : *গরিবুল হাদিস*, নিরীক্ষক : আবদুল্লাহ জাবুরি, মাতবাআতুল আনি, বাগদাদ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৭ হিজরি।
- আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন : *আস-সিলসিলাতুস সহিহা*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ।
- আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন : *সহিহ ওয়া জয়িফুল জামিয়িস সগির ওয়া যিয়াদাতুহু*, আল-মাকতাবুল ইসলামি।
- সুয়ুতি ও অন্যান্য : *শারহু সুনানি ইবনে মাজাহ*, কাদিমি কুতুবখানা, করাচি।
- মুবারকপুরি, মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহিম আবুল আলা : *তুহফাতুল আহওয়াযি বি শারহি জামিয়িত তিরমিজি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
- মুনাবি, মুহাম্মাদ আবদুর রউফ ইবনে আলি : *ফাইজুল কাদির শারহুল জামিয়িস সগির*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, মিশর, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬ হিজরি।
- নববি, আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ : আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ হিজরি।

চার. ফিকহ ও মুআমালাতের গ্রন্থ

- ইবনে কুদামা, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ মাকদিসি : *আল-মুগনি*, তাবউ ইদারাতিল মানার, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭ হিজরি।
- ইবনু কাইয়িমিল জাওযিয়া, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর আইয়ুব যিরায়ি : *তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ*, নিরীক্ষক : আবদুল কাদের আরনাউত, মাকতাবাতু দারিল বয়ান দিমাশক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ।
- মাওয়ারদি, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাবিব : *আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।

- নিজামুদ্দিন বলখি ও অন্যান্য : *আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।
- ওয়াহবা যুহাইলি : *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, দারুল ফিকর, দিমাশক, চতুর্থ সংস্করণ।

পাঁচ. সিরাত, জীবনী ও ইতিহাসের গ্রন্থ

- ইবনে আবি উসাইবিয়া, মুওয়াফফাকুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে কাসিম : *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, নিরীক্ষক : আমের নাজ্জার, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়াতুল আম্মাহ লিল কিতাব, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনুল আসির, আবুল হাসান ইযযুদ্দিন আলি ইবনে মুহাম্মাদ জাযারি : *উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- ইবনুল খতিব, লিসানুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ : *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনুল ইমাদ, আবদুল হাই ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ হাম্বলি : *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, নিরীক্ষক : আবদুল কাদের আরনাউত ও মাহমুদ আরনাউত, দারু ইবনে কাসির দিমাশক, ১৪০৬ হিজরি।
- ইবনুল কিন্দি : *ফাজায়িলু মিসরিল মাহরুসা*, নিরীক্ষক : আলি মুহাম্মাদ উমর, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনে নাদিম, আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক : *আল-ফিহরিসত*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯৮ হিজরি।
- ইবনে তাগরি বারদি : *আন-নুজুমুয যাহিরা ফি তারিখি মিশর ওয়াল কাহিরা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ হুসাইন শামসুদ্দিন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনে জুবাইর : *রিহলাতু ইবনে জুবাইর*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনে হাজার, আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলি আসকালানি : *আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*, দারুল কুতুবিল আরাবি, বৈরুত।

- ইবনে খালদুন, আবদুর রহমান মাগরেবি : *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল খবর ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বার্বার ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, চতুর্থ সংস্করণ।
- ইবনে খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর : *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, নিরীক্ষক : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনু সাইয়িদিন নাস, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া : *উয়ুনুল আসার ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামাইল ওয়াস সিয়ার*, মুআসসাসাতু ইযযিদ্দিন, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৬ হিজরি।
- ইবনে কাজি শাহবা, আবু বকর ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমর : *তাবাকাতুশ শাফেয়ি*, নিরীক্ষক : হাফিজ আবদুল আলিম খান, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনে কাসির, হাফেজ আবুল ফিদা ইসমাইল : *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, নিরীক্ষক : আলি শিরি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক মাআফিরি : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ ফাহমি সারজানি, আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়া, কায়রো।
- আবু নুআইম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানি : *হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কুতুবিল আরাবি, বৈরুত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।
- আহমাদ ঈসা বেগ : *মুজামুল আতিব্বা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারু রায়িদিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২ হিজরি।
- এডওয়ার্ড ভেনডেইক : *ইকতিফাউল কুনু বিমা হুয়া মাতবু*, সম্পাদনা : মুহাম্মাদ বাবালাবি, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইলিয়াস সারকিস : *মুজামুল মাতবুআতিল আরাবিয়া*, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

- বাবানি, ইসমাইল পাশা বাগদাদি : *হাদিয়াতুল আরেফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, ইস্তাম্বুল, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন।
- জাওয়াদ আলি : *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, দারুস সাকি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।
- হাজি খলিফা : *কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।
- যাহাবি, আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ : *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম*, নিরীক্ষক : মুস্তফা আবদুল কাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
- যাহাবি, আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ : *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, নিরীক্ষক : হুসাইন আসাদ, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।
- যিরিকলি, খাইরুদ্দিন : *আল-আলাম কামুসু তারাজিমা লি আশহারির রিজাল ওয়ান নিসা মিনাল আরব ওয়াল মুসতারিবিন ওয়াল মুসতাশরিকিন*, দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
- স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহইয়া : *ইফহামুল ইয়াহুদ ওয়া কিসসাতু ইসলামিস স্যামুয়েল ওয়া রুইয়াহুন নাবিয়্যা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ শারকাবি, দারুল জিল, বৈরুত।
- শাহরাজুরি : *তারিখুল হুকামা আও নুযহাতুল আরওয়াহ ওয়া রওজাতুল আফরাহ*, নিরীক্ষক : আবদুল কারিম আবু শুআইরিব, জামইয়াতুদ দাওলাতিল ইসলামিয়া আল-আলামিয়া, লিবিয়া, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- সাফাদি, সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে আইবেক : *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, নিরীক্ষক : উটগ্রেড ফাইটার্ট, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- তাশকোপরি যাদা : *মিফতাহুস সাআদা*, মাকতাবাতু লেবানন, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

- তবারি, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির : *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।
- আবদুল ওয়াহিদ মারাকেশি : *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, টীকাভাষ্য : খলিল মানসুরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- কিফতি, আবুল হাসান জামালুদ্দিন আলি ইবনে ইউসুফ শাইবানি : *তারিখুল হুকামা* (ইখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা), সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আমিন খানজি, দারুস সাআদা, কায়রো, ১৩২৬ হিজরি।
- কিন্নাওজি, সিদ্দিক ইবনে হাসান : *আবজাদুল উলুমিল ওয়াশিল মারকুম ফি বায়ানি আহওয়ালিল উলুম*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- কাহহালা, উমর রিজা : *মুজামুল মুআল্লিফিন*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ লুতফি জুমা : *তারিখু ফালাসিফাতিল ইসলাম ফিল মাশরিক ওয়াল মাগরিব*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।
- মুকরি তিলমিসানি, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ : *নাফহুত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব*, নিরীক্ষক : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- মাকরিযি, তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি : *ইত্তিয়াজুল হুনাফা বি আখবারিল আয়িম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ হালমি মুহাম্মাদ আহমাদ ওয়া জামালুদ্দিন শাইয়াল, লাজনাতু ইহইয়ায়িত তুরাস, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।
- মাকরিযি, তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি : *আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার ফি জিকরিল খুতাত ওয়াল আসার*, কায়রো, ১২৭১ হিজরি।

ছয়. অভিধান ও বিশ্বকোষ

- ইবরাহিম মুস্তফা ও অন্যান্য : *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, নিরীক্ষক : মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়া, দারুদ দাওয়া, মিশর।

- ইবনে মানযুর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররাম ইফ্রিকি মিশরি : *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- হামাবি, আবু আবদুল্লাহ, ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ : *মুজামুল বুলদান*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- খলিল ইবনে আহমাদ, আবু আবদুর রহমান ইবনে আমর ফারাহেদি : *মুজামুল আইন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।
- যাবিদি, আবুল ফয়েজ মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক হুসাইনি মুরতাজা : *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত।

সাত. জ্ঞানতাত্ত্বিক গ্রন্থ

- ইবনে বাইতার, আবু মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ মালাকি : *আল-জামি লি মুফরাদাতিল আদভিয়া ওয়াল আগযিয়া*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইবনে বাইতার, আবু মুহাম্মাদ জিয়াউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ মালাকি : *আল-ইবানা ওয়াল ইলাম বিমা ফিল মিনহাজ মিনাল খলাল ওয়াল আওহাম*।
- ইবনে সিনা : *আল-কানুন ফিত তিব*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ দানাবি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।
- আবু বকর দিনাওয়ারি : *আল-মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, দারু ইবনে হাযম, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ।
- আহমাদ ইবনে উমর সমরকন্দি : *জিহার মাকালা*, অনুবাদ : আবদুল ওয়াহাব আযযাম ও ইয়াহইয়া খাশশাব, লাজনাতুত তালিফ ওয়ান নাশর, কায়রো, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ।
- আহমাদ আলি মুল্লা : *আসারুল উলামায়িল মুসলিমিন ফিল হাযারাতিল উরুব্বিয়া*, দারুল ফিকরিল মুআসির, দিমাশক, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।
- আহমাদ ফুআদ পাশা : *আত-তুরাসুল ইলমি লিল হাযারাতিল ইসলামিয়া ওয়া মাকানাতুহু ফি তারিখিল ইলমি ওয়াল হাযারা*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

- আকরাম আবদুল ওয়াহাব : *মিআতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াজহাল আলাম*, দারুত তালায়ে লিন নাশর ওয়াত তাওযি, কায়রো, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- বাজিয়ার আল-আযিয বিল্লাহ : *আল-বাইজারা*, নিরীক্ষক : মুহাম্মাদ কুরদ আলি, দারু সাদির লিত তিবায়া ওয়ান নাশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।
- জাহিয, আবু উসমান আমর ইবনে বাহর : *আল-হায়াওয়ান*, নিরীক্ষক : আবদুস সালাম হারুন, দারুল জিল, বৈরুত, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।
- জালাল মাযহার : *হাযারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত তারাক্কিল আলামি*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- গিউম : *আল-ফালসাফাতু ওয়া ইলমুল কালাম*, আর্নল্ডের *তুরাসুল ইসলাম* গ্রন্থে প্রকাশিত।
- রাযি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া : *মানাফিউল আগযিয়া ওয়া দাফউ মাদাররিহা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ।
- রাযি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া : *আখলাকুত তাবিব*, নিরীক্ষক : আবদুল লতিফ মুহাম্মাদ আবদ, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- রাযি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া : আল-হাবি ফিত তিব, নিরীক্ষক : হাইসাম খলিফা তুয়াইমি, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ।
- যগলুল নাজ্জার : *আল-ইজাযুল ইলমি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, দারু নাহদাতি মিশর, কায়রো, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ।
- সাইয়িদ রিজওয়ান : *আল-উলুম ওয়াল ফুনুন ইনদাল আরব ওয়া দাওরুহুম ফিল হাযারাতিল আলামিয়া*, দারুল মুরিখ লি তিবায়া ওয়ান নাশর, রিয়াদ, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- শাওকি আবু খলিল : *দাওরুল হাযারাতিল আরাবিয়াতিল ইসলামিয়া ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।

- শাওকি আবু খলিল : *আল-হাযারাতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া মুজাযুন আনিল হাযারাতিস সাবিকা*, দারুল ফিকর- দিমাশক, সিরিয়া।
- শাওকি আবু খলিল : *উলামাউল আন্দালুস ইবদাআতুহুমুল মুতামাইয়িযাতু ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া।
- আমের নাজ্জার : *ফি তারিখিত তিব ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া*, দারুল মাআরিফ, মিশর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- আবদুস সালাম মুহাম্মাদ নুওয়াইহি : *ইলমুন নাবাত ইনদাল আরব*।
- আবদুল মুনয়িম : *তালিমুত তিব ইনদাল আরব*, দারুল জামিয়া, হালব, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
- আলি ইবনে আবদুল্লাহ আদ-দাফফা : *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- আলি ইবনে আবদুল্লাহ আদ-দাফফা : *ইসহামু উলামায়িল আরব ওয়াল মুসলিমিন ফি ইলমিল হায়াওয়ান*, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।
- উমর ফররুখ ও অন্যান্য : *তারিখুল উলুম ইনদাল আরব*, দারুন নাহদাতিল আরাবিয়া, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ।
- গিতরিফ ইবনে কুদামা গাসসানি : *দাওয়ারিত তাইর*, মাহাদু তারিখিল উলুমিল আরাবিয়া ওয়াল ইসলামিয়া থেকে মুদ্রিত, ফ্রাংকফুর্ট, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- ফুরাত ফায়েক খিতাব : *আল-কাহালা ইনদাল আরব*, মানশুরাতু ওয়াযারাতিল ইলাম, ইরাক, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।
- কাদেরি হাফেজ তাওকান : *উলামাউল আরব ওয়া মা আতাওহু লিল হাযারা*, দারুল কিতাবিল আরাবি।
- কাযবিনি, যাকারিয়া মাহমুদ : *আজাইবুল মাখলুকাত*, নিরীক্ষক : আলি সিরাতুল হক, মুআসসাসাতুল আলামি লিল মাতবুআত, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।

- কুসাই হুসাইন : *মিন মাআলিমিল হাযারাতিল আরাবিয়াতিল ইসলামিয়া*, আল-মুআসসাতুল আরাবিয়া লিদ দিরাসাত ওয়ান নাশর ওয়াত তাওযি, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।
- কামাল সামুরাই : আল-আমরাদুন নিসাইয়াহ ফিত তিব্বিল আরাবিয়্যিল কাদিম, *আল-মিহনুত তিব্বিয়া* ম্যাগাজিন, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি : *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুহাম্মাদ আমিন ফারশুখ : *মাওসুআতু আবাকিরাতিল ইসলাম*, দারুল ফিকরিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুহাম্মাদ আলি উসমান : *মুসলিমুন আল্লামুল আলাম*, মাকতাবাতু মারুফ, কায়রো।
- মুহাম্মাদ ইমারা : *আল-ইসলাম ফি উয়ুনিন গারবিয়্যা বাইনা ইফতিরাইল জুহালা ওয়া ইনসাফিল উলামা*, দারুশ শুরুক, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুহাম্মাদ কামিল হুসাইন : *আল-মুজায ফি তারিখিত তিব ওয়াস সাইদালা ইনদাল আরব*, আল-মুনাজ্জামাতুল আরাবিয়া, লিবিয়া।
- মাহমুদ আল-হাজ কাসিম : *আত-তিব ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন তারিখ ওয়া মুসাহামাত*, আদ-দারুস সাউদিয়া লিন নাশর, জিদ্দাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুস্তফা সিবায়ি : *মিন রাওয়াইয়ি হাযারাতিনা*, দারুস সালাম, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুস্তফা লাবিব আবদুল গনি : *দিরাসাতুন ফি তারিখিল উলুম ইনদাল আরব*, আল-মাজলিসুল আলা লিস সাকাফা, কায়রো, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- মুস্তফা ওয়াহবা : *নাওয়াবিগুল মুসলিমিন*, মাকতাবাতু জাযিরাতিল ওয়ারদ।
- *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়া*, সৌদি আরব, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।

আট. অমুসলিমদের গ্রন্থ :

- অ্যালডো মেলি : *আল-ইলম ইনদাল আরব ওয়া আসারুহু ফি তাতাওউরিল ইলমিল আলামি*, অনুবাদ : আবদুল হালিম নাজ্জার ও মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা, দারুল কলম, কায়রো, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।
- গুস্তাভ লি বোঁ : *হাযারাতুল আরব*, অনুবাদ : আদেল যুয়াইতার, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতিল আম্মাহ লিল কিতাব, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- ডোমিনিক সোর্ডেল : *আল-ইসলাম কিরাআতুন গারবিয়্যাতুন মুআসিরাহ*, অনুবাদ : সেলিম কান্দালিফত, দারু হাওরান, দিমাশক, সিরিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।
- ডোনাল্ড আর হিল : *আল-উলুম ওয়াল হান্দাসা ফিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, লাবিনাতুন আসাসিয়্যাহ ফি সারহিল হাযারাতিল ইনসানিয়া, অনুবাদ : আহমাদ ফুআদ পাশা, সিলসিলাতু আলামিল মারিফা, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- সিগরিড হুংকে : *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, অনুবাদ : ফারুক বেইদুন ও কামাল দসুকি, দারু সাদির, বৈরুত, দশম সংস্করণ, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ।
- সিডিলোট : *তারিখুল আরাবিল আম*, অনুবাদ : আদেল যাইতার, দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ।
- ফিলিপ হিট্টি ও অন্যান্য : *তারিখুল আরব*, দারু গান্দুর, বৈরুত, নবম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- লেনসার : *আল-উলুমুত তাবিয়িয়্যা ওয়াত তিব*। *তুরাসুল ইসলাম* গ্রন্থের সাথে মুদ্রিত গবেষণাপত্র। বসওয়ার্থের তত্ত্বাবধানে রচিত এই গবেষণাপত্রটি গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে।
- ম্যাক্স মেয়েরহোফ : *তুরাসুল ইসলাম*, অনুবাদ : জর্জিস ফাতহুল্লাহ।
- মন্টগোমারি ওয়াট : *ফাদলুল ইসলাম আলাল হাযারাতিল গারবিয়্যা*, মাকতাবাতু মাদবুলি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

- হাওয়ার্ড আর টার্নার : *আল-উলুম ইনদাল মুসলিমিন*, অনুবাদ : ফাতহুল্লাহ আশ-শায়েখ, আল-মাজলিসুল আলা লিস সাকাফা, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।
- উইলিয়াম ডুরান্ট : *কিসসাতুল হাযারা*, অনুবাদ : যাকি নাজিব মাহমুদ ও অন্যান্য, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতিল আম্মাহ লিল কিতাব, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।

নয়. পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী

- মাজাল্লাতুত তুরাসিল আরাবি, সংখ্যা ৮৯, মার্চ ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ
- মাজাল্লাতুত তুরাসিল আরাবি, সংখ্যা ৩০, জানুয়ারি ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
- মাজাল্লাতুত তুরাসিল আরাবি, সংখ্যা ২৭, ফেব্রুয়ারি ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ
- মাজাল্লাতুত তিব্বিল আমিরিকিয়্যা, ১ম সংখ্যা, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ
- মাজাল্লাতু বারিদিল ইউনেস্কো, অক্টোবর ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ
- মাজাল্লাতু জামিয়াতিল মাওসিল, সংখ্যা ১৫, দ্বিতীয় বর্ষ
- মাজাল্লাতু হিরা, সংখ্যা ৯ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

।। সমাপ্ত।।

যদিও কিছু পাঠকের ধারণা হতে পারে যে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ফার্মাসিস্টদের জন্য রচিত কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ, এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান। অমূল্য এই গ্রন্থ পাঠে একজন পাঠক মুসলিমদের জ্ঞান-গবেষণা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। মুসলিমজাতির একজন সদস্য হতে পেরে গর্ববোধ করবেন। একই সঙ্গে মুসলিমজাতির হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে উজ্জীবিত হবেন।

বাস্তবিকপক্ষে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ, যার অন্যতম উদ্দেশ্য মুসলিমজাতিকে পুনরায় তাদের সফলতার রাজপথে তুলে আনা।

ISBN 978-984-96318-4-2
B0107
মাকতাবাতুল হাসান